বিজ্ঞান দর্পণ

সচিত্র মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ।

(১৯০৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর   ১৩১৫ মাঘ হইতে ১৩১৬ পৌষ)

সম্পাদক

শ্রীহারাধন রায় এম, এ, এফ, সি, এস্।

কার্য্যাধ্যক্ষ "বিজ্ঞান দর্পণ"

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা।

২১০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

(বর্ণমালানুসারে)।

বিজ্ঞান দর্পণ।

১ম বর্ষ।]　　মাঘ ১৩১৫, জানুযারি ১৯০৯।　　[১ম সংখ্যা।

সূচনা।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকলের মনে এক নবভাবের উদয় হইয়াছে, যে ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কিন্তু কিসে যে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারিতেছি না। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে আধুনিক জ্ঞান সঞ্চয় অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শিক্ষার বলেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ এত উন্নত হইয়াছে; এবং জাপান শীঘ্র শীঘ্র উন্নত হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রকে যে ভাবে কৃষিকার্য্যে ও কারুকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া অন্যান্য দেশের লোক প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছেন, আমাদিগকে এক্ষণে সেই জ্ঞান অধিকার করিতে হইবে। নানা কারণে এদেশে যেরূপ পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইতেছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে ভারতের জনসংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার ৺মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় স্থির বুঝিয়াছিলেন যে

দেশবাসী সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ বপনই ভারতের উন্নতির প্রধান উপায়। তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা" সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশবাসীর মনে যাহাতে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পায় সে জন্য সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ৺সরকার মহাশয়ের প্রদর্শিত পথই যে ভারতের উন্নতি বিধানের প্রধান পথ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে দুই চারিজন বিজ্ঞানবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দুই চারিটি বৈজ্ঞানিক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞানের আদর দেখা যাইতেছে, ইহা ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্বাভাষ, কিন্তু যতদিন না সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি হইবে, ততদিন প্রকৃত উন্নতির পথ প্রসস্ত হইবে না। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার করিতে হইলে, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ প্রধান উপায়। সর্ব্বজ্ঞানময় পরমপিতা পরমেশ্বরের অভয়পদ স্মরণ করিয়া সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার আদর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত "বিজ্ঞান দর্পণ" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইল। দেশবাসী ইহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না, ইহা যদি পাঠকের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ বপন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানবজীবনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান উপার্জ্জন। জীবনের প্রথম উন্মেষ হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভের আশায়, মানব, তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত যত্ন, সমস্ত আয়াশ নিয়োজিত

করে। অনেক মহাপুরুষ সময়ে সময়ে, জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, বিপদের কুটীল ভ্রুকুটী তুচ্ছ করিয়া, স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া তুলেন; এমন কি কোন একটি সত্য তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য অকাতরে জীবনে আহুতি প্রদান করেন। কিন্তু সে জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি?—বিজ্ঞান চর্চ্চা; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

মানবের মন সসীম। তথাপি সেই সসীম মানসিক ক্ষমতার দ্বারাই বিজ্ঞান বলে প্রমাণ কবিয়াছে, যে এই অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সমস্তই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের, বা পদার্থগত কয়েকটি ধর্ম্মের বশীভূত। বিজ্ঞানই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল পদার্থের বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিনাশের প্রকৃত নিয়ম নির্দ্ধারণে সক্ষম।

কিছুকাল পূর্ব্বে, মানব ভাবিত, মানুষের জীবন প্রণালী বুঝি সৃষ্ট অন্যান্য জীব মণ্ডলীর জীবন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নাই, সে কথায় বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে অনির্ব্বচনীয় কৌশলে পরমাণু সদৃশ জীব ও উদ্ভিদ শরীরে জীবনী শক্তি পরিচালিত করিয়াছেন, সেই একই কৌশলে এবং একই উপায়ে মানবশরীরেও জীবনীশক্তি সঞ্চালিত হইতেছে। একদিন মানব স্বীয় জীবন প্রণালীর গর্ব্ব করিত, সৃষ্ট অন্যান্য পদার্থের জীবনের প্রতি করুণা প্রকাশ করিত, বৃক্ষের স্থাবরত্বের সহিত নিজ জঙ্গমত্বের তুলনা করিয়া, উদ্ভিদের জীবন প্রণালীকে উপেক্ষা করিত, উপহাস করিত; কিন্তু বিজ্ঞানই সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছে; চক্ষের উপরে সত্যের অত্যুজ্জ্বল প্রভা প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছে। মানব বিস্ময়ে বিশ্বনিয়ন্তার পদে প্রণতি করিতেছে;—বিজ্ঞান ধীরে ধীরে, উপযুক্ত অবসরে, মানবের মন হইতে অজ্ঞান অন্ধকার বিলুপ্ত করিতেছে।

ভারতে একদিন বিজ্ঞান চর্চ্চা হইত। ভারতেই লীলাবতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত বক্ষেই বরাহমিহিরের ভস্মস্তূপ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। ভারতই সমস্ত জগৎকে সংখ্যা গণনার প্রকৃষ্ট নিয়ম প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সে দিন গিয়াছে, সে দিন লইয়া আমাদের গর্ব্ব করিবার দিনও গিয়াছে। ভারতে যত দিন বিজ্ঞান চর্চ্চা ছিল, ততদিন ভারত

বাসীর অন্নদশা ছিল, তখন পেটের দায়ে লোকে কুকুরের ন্যায় ছুটাছুটি করিত না, একটি মিষ্ট সান্ত্বনা পাইবার জন্য পরপদলেহন করিত না, সামান্য পরিধেয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। এখন চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ রাশি ভারতবাসীকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

মানব আশাহীন হইতে বড়ই ভয় করে। অথণ্ডনীয় বিপদকেও স্বীয় অধ্যবসায় বলে দূর করিতে আশা করে; সম্পূর্ণ দূর না করিতে পারিলেও বিপদের ভীষণ মূর্ত্তিকে অন্ততঃ একটা ভয়মিশ্রিত মধুরতার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বিপদের তীব্রতা কমাইয়া তুলে। আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। জীবন সংগ্রামে আমরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিতে না পারিলেও, যাহাতে একবারে বিনষ্ট না হই তাহার উপায় করিতে হইবে। সে উপায় কি?—জ্ঞান লাভ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে ভগবানের সৃষ্টমনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জন করিয়া যাহাতে আমরা প্রকৃত মানব পদবীবাচ্য হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান আলোচনা ব্যতীত কোন অধঃপতিত জাতিই উন্নতি করিতে পারে না।

এরূপ শুনিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয়, বিজ্ঞান আমাদিগকে কিরূপে সাহায্য করিবে? বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে আরও নিকৃষ্টতর করিয়া তুলিবে না ত? ধীর ভাবে এ প্রশ্নের সমালোচনা করা উচিত। প্রথমতঃ দেখা যাউক, মানব-সমাজকে বিজ্ঞান কিরূপ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় দেশ আলোড়িত, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ প্রয়াসী। ইহার কারণ কি? বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ইউরোপ বিজ্ঞান বলে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। তদ্দেশবাসী সুধীগণ অতুল্য ক্ষমতা সম্পন্ন সৌদামিনীকে গৃহপরিচারিকা, সমাজ পরিচারিকা হইতে বাধ্য করিয়াছে, অনায়াসলভ্য অগ্নি ও জলের সাহায্যে অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ করিয়া অতি দীনেরও অনায়াসলভ্য করিতেছে, চিরবিশ্বসিত দেবের অসাধ্য রোগ সকল নির্ম্মূল করিয়া বিদূরিত করিতেছে। ইউরোপে শিল্পের উন্নতি,

কলাবিদ্যার উন্নতি, মানসিক উন্নতি, আধিভৌতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তথাকার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি,—সমস্তই বিজ্ঞানের সাহায্যে। যিনি ইউরোপের কথা জানেন, তিনি বেশ জানেন যে বিজ্ঞানই ইউরোপের অস্থি মজ্জা ; তাই ইউরোপ আজ সমগ্র পৃথিবীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বিজ্ঞান সৃষ্টির গুঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে, অসীম অতীত ও অসীম ভবিষ্যতের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। কোন্ চিন্তাশীল অস্বীকার করিবে, যে বিজ্ঞান জ্ঞান এবং চিন্তা শক্তিতে প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে ? কিন্তু অনেক ভারতবাসীর নিকট একথা অশ্রদ্ধেয়। কারণ তাহারা দেখে, বিজ্ঞানের কথা গুলি নূতন, বিজ্ঞান পরিচালিত চিন্তা শক্তি নূতন, সর্ব্বোপরি বিজ্ঞান পরিমার্জ্জিত মনের ভাবই পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিজ্ঞানের অলৌকিক শক্তি, কুসংস্কার পরিপূরিত মানব মনে বহুকাল পরিপোষিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, অজ্ঞানের অশিক্ষিত চক্ষে মহীয়সী প্রকৃতির সত্য তথ্যের অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রদীপ্ত করে, অজ্ঞান অমনই সভয়ে, সবিস্ময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলে। সে কিছুতেই চাহিতে চায় না, বিজ্ঞানের কথা শুনিতে চায় না। ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এখনও হিন্দুর পূজ্য অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সূর্য্যের উদয় অস্তের প্রকৃত তথ্য জানেন না। তাঁহারা এখনও সূর্য্যকে ভগবানের আসনে বসাইয়া বিশ্বস্রষ্টার অপমান করিতেছেন।

ভারত বাসীর কর্ত্তব্য কি ? অবশ্য ইহার উত্তর বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া এবং ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের মূল সূত্র গুলি প্রকাশ করিয়া জন সাধারণকে বিজ্ঞানের প্রতি আহ্বান করিতে পারিলেও যে আমাদের কর্ত্তব্যের অনেকটা অংশ পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। এইরূপ করিতে করিতে এমন দিন আসিবে যে দিন ভারতের গৃহে গৃহে বিজ্ঞান চর্চ্চা হইবে ভারতের নরনারী বিজ্ঞানবলে বিশ্বস্রষ্টার, অনন্ত কৌশল, প্রকৃতির অসীম স্নেহ বুঝিতে পারিবে ; বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত আলোচনা হইবে ততই আমাদের মঙ্গল।

এই উদ্দেশ্য লইয়া "বিজ্ঞান দর্পণ" উদ্ভূত। উদ্দেশ্য মহান কিন্তু শক্তি অল্প। তথাপি সুধীবৃন্দের সহায়তা পাইব আশা করিয়া, সেই মহান উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিলাম। যে মহাপুরুষ ভারতে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য সমস্ত জীবন নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, স্বদেশবাসীকে বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে তুলিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই স্বনামধন্য মহাপুরুষ মহেন্দ্র লাল সরকারের নাম স্মরণ করিয়া তদ্বৎ পরিচালিত পথে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।

অনুসন্ধিৎসু ভারতবাসী আমাদের এই পত্রিকা পাঠে হয়ত আরও শত শত গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন এবং প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ জীবনের আরও অচিন্তনীয় মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। ক্রমে ক্রমে একদিন ভারতবাসী তাঁহার মাতৃভূমির মুখ গৌরব-প্রদীপ্ত করিবে; তখন সমস্ত জগৎ শস্য শ্যামলা ভারত ভূমির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিবে; সে দিনে ভারতের কুসংস্কার ধূলিসাৎ হইবে, ভারত বাসীর যৌবনের বিক্ষুব্ধ বুদ্ধি সংযত হইয়া কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত হইবে, সে দিনে শীল্প প্রণালী, নীতি প্রণালী, শিক্ষা প্রণালী, এমন কি ধর্ম্ম প্রণালী বিজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

শিলাবৃষ্টি নিবারক ব্যোমযান।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য-জাতিগণ বিজ্ঞানবলে নানা উপায়ে স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি কি কার্য্য সাধন করিতেছেন, সে সকলের আলোচনা করিলে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হইতে হয়। পাশ্চাত্য
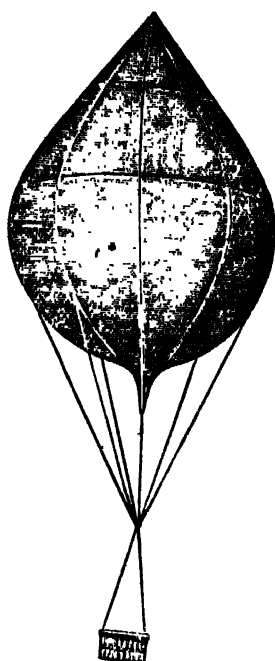
শিলাবৃষ্টি নিবারক ব্যোম্‌যান।

জাতিরা প্রায় সকল কার্য্যই বিজ্ঞানের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করিতেছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শিলাবৃষ্টি নাশক এক প্রকার অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

ইউরোপের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি অল্প, এবং তাহাতে কঠিন পরিশ্রমের ফলে যাহা কিছু শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা আবার শিলাবৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে; এই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ শিলাবৃষ্টির আক্রমণ হইতে শস্য সমূহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক দিন হইতে শিলাবৃষ্টি নাশক বন্দুক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; ফ্রান্স ও ইটালি প্রদেশের নানা স্থানে এইরূপ বন্দুক প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। .নেকস্থলে অগ্নিবান (Rocket) দ্বারা শিলাবৃষ্টি উৎপাদন-কারি মেঘ

ধ্বংশ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু উভয় দলের মধ্যে কেহই ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অকৃতকার্য্য হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন যে এমন কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহা শিলাবৃষ্টি উৎপাদন-কারি মেঘের উপর পড়িয়া উহাকে নষ্ট করিতে পারে। অবশেষে ১৮৪৭ অব্দে Arago ও Dupis Belcort নামক দুইব্যক্তি এই কার্য্য সাধন করিবার জন্য এক মতলব স্থির করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে এই শিলাপাত নিবারণ করিতে হইলে, তাম্রের নির্ম্মিত Captive বেলুনের আবশ্যক, তাহাকে অভেদ্য করিবার জন্য উপরিভাগ খুব সরু ও তীক্ষ্ণ করিতে হইবে। কিন্তু এতদিন এই মতলব কেহই কার্য্যে পরিণত করেন নাই। সম্প্রতি দুইজন বেলজিয়ম-দেশবাসী ব্যোমযানবিৎ Capt. Marga এবং Mr. Adhemar-de-la-Hault উক্ত প্রণালীর অনুযায়ী একটী ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত একটী পাত্রে বিস্ফোরক দ্রব্য পূর্ণ করিয়া যাহাতে উহা শিলাবৃষ্টি উৎপাদন কারি মেঘের সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলিয়া যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

এই ব্যোমযানের আকৃতি আমাদের দেশের হুকার খোলের ন্যায়, ইহার মধ্যে তিন মিটার গ্যাস ধরে। বিস্ফোরক পূর্ণ পাত্রটী ঠিক নিম্নভাগে দড়িদ্বারা ঝুলান থাকে। হাইড্রোজেন নামক এক প্রকার লঘু গ্যাসের সাহায্যে ইহাকে উপরে উঠান হয়।

ইউরোপের যে যে স্থানে শিলাপাত দ্বারা শস্যের হানি হয় এক্ষণে সেই সেই স্থানে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইবে। তাহা হইলে আর শস্য হানির আশঙ্কা থাকিবে না।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান সভার ইতিহাস।

(উদ্ধৃত।)

আমাদের দেশে যাহাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হয়, সেই সম্বন্ধে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিষয়ক একখানি মাসিকপত্রে, ডাক্তার ৺মহেন্দ্র লাল সরকার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার ইহাই প্রথম সূচনা। তাঁহার উদ্দেশ্য যাঁহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য পর বৎসর তিনি তিনটী প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ।

(১) এ দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহার সহিত সংযোগে শাখা সভা সংস্থাপিত হউক।

(২) ভারতের লোককে নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, তাহাও প্রকাশিত করা এ সভার আর একটী উদ্দেশ্য হইবে।

(৩) এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানারূপ যন্ত্র ও কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত লোকের আবশ্যক। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। চাঁদা স্বরূপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট সংগৃহীত হউক।

এই সভায় কি কি শাস্ত্র আলোচিত হইবে ও কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, ইহার পর সেই সম্বন্ধে ৺সরকার মহাশয় কলিকাতা, উত্তরপাড়া প্রভৃতি নানাস্থানে বক্তৃতা করেন ও সেই বক্তৃতায় তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বিশদভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। সংবাদপত্র সমূহেও এই বিষয় সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন। সেই সমুদয় বক্তৃতা শ্রবণ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের অনেক বড়লোকের মনে একান্ত বিশ্বাস হয় যে, ভারতবর্ষের
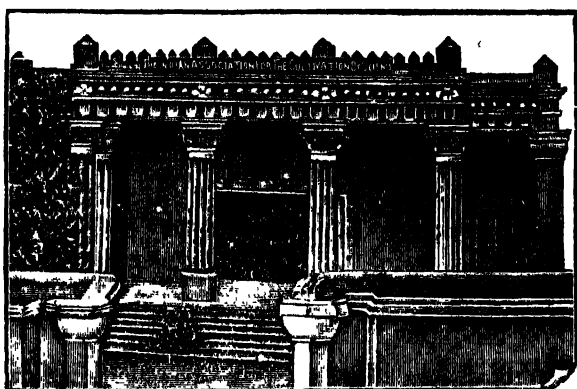
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা।

রাজধানী কলিকাতায় বৃহৎ এক বিজ্ঞানালয় সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অনেক ধনবান লোক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বঙ্গদেশের তৎকালীন ছোটলাট সাহেবও সরকার মহাশয়কে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিলেন। তাহার পর যে যে মহোদয়গণ এই কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ১৮৭৫ সালের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে তাঁহারা একটী সভা করিলেন। বিজ্ঞান সভায় কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সেই সম্বন্ধে এই সভায় সরকার মহাশয় আর একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ সত্বর এই সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও চাঁদা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহারা আরও দুইটী সভা করিয়া বিজ্ঞান সভা স্থাপন সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে, উদ্যোগিগণের তৃতীয় সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন উপস্থিত সভ্যগণ একবাক্য হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা সংস্থাপন করিলেন। সভাদ্বারা কি কি কার্য্য সম্পাদিত হইবে ও

কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহার কর্ম্মচারিরূপে কার্য্য করিবেন, এই অধিবেশনে সে সমুদয় বিষয়ও স্থির হইল।

বিজ্ঞান সভা এইরূপে সংস্থাপিত হইল। বিজ্ঞান সভা এবং ইহার সমুদয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্রিংশ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহারাই সভার সম্পত্তির অধিকারী ও তাঁহারাই সভার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

সভা সংস্থাপনের কিছু দিন পরে সেই সময়ের ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব, এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যে বঙ্গদেশের লোক যদি এককালীন ৭০,০০০ টাকা ও মাসিক ১০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান সভার জন্য কয়েক বৎসরের নিমিত্ত একটী বাটী প্রদান করিবেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে বঙ্গদেশের ধনবান ও শিক্ষিত লোকগণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তাঁহাদের উদ্যোগে বিজ্ঞান সভা এক্ষণে বৃহৎ এক অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অট্টালিকার মধ্যে বৃহৎ একটি হল আছে, তাহাতে প্রায় পাঁচশত লোক উপবেশন করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারেন। পরীক্ষার নিমিত্ত নানারূপ বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি পরীক্ষাগার (Laboratory) নির্ম্মিত হইয়াছে। পরীক্ষাগার নির্ম্মাণের জন্য বিজয়নগরের মহারাজ চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি ক্রীত হইয়াছে ও হইতেছে। জন কয়েক দেশহিতৈষী পণ্ডিত নিয়মিতরূপে প্রতিদিন সাধারণকে নানাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হইয়াছেন। সভার উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রতিমাসে প্রায় এক হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে।

সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া সেই চাঁদার টাকা কার্য্যাধ্যক্ষগণ কিরূপ পরিমিতভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা

শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা স্বরূপ কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। উক্ত টাকার সুদ লাভ করিয়া, ও বিজ্ঞানালয়ের বহির্ভাগ ভাড়া দিয়া, তাঁহারা মূলধন অনেক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানালয়ের বাটী খরিদ, পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ, যন্ত্র ও পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এখনও সভার দেড়লক্ষ টাকার অধিক মূলধন জমা আছে। এই টাকায় ট্রষ্টিদিগের নামে কোম্পানির কাগজ ক্রীত হইয়াছে। কার্য্যাধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকট হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সভার সম্পত্তির মূল্য এক্ষণে প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ টাকা।

এলুমিনিয়ম ধাতু এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা।

এই ধাতুটি ১৮২৭ খ্রীঃ অঃ উহ্লার নামে এক জন জার্ম্মাণ দেশীয় রাসায়নিক পণ্ডিতের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তখন কোনরূপ শিল্পে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। পরে যখন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই ইহার ব্যবহার নানা রূপে হইতে লাগিল। সেই সময় হইতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী নানা রূপে আবিষ্কৃত হওয়ায়, ইহার মূল্য ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে এবং বহু প্রকারে ইহার ব্যবহারও বর্দ্ধিত হইতেছে। গত দ্বাবিংশ বৎসরের মধ্যে ইহার মূল্য কিরূপ ভাবে ন্যূন হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৮৮৯	খৃঃ অব্দে	প্রতি টনের মূল্য	৩২৫৬	পাউণ্ড।
১৮৯১	„	„	৮১২	„
১৮৯২	„	„	৪৯৫	„
১৮৯৬	„	„	১৬৩	„

১৯০১	"	"	১৩০	পাউণ্ড।
১৯০৫	"	"	১৩০	হইতে ১৭০
১৯০৭	"	"	২০০	" ১০৬
১৯০৮	"	"	১০০	" ৬৫

অধুনা এই ধাতু, কয়েকটী খনিজ পদার্থ, যথা, বক্সাইট (Bauxite) ডায়াস্পোর (Diaspore) প্রভৃতি হইতে বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থেও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। যদিও এলুমিনা উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি কয়েকটি ক্রিপ্টোগ্যাম (Cryptogams), বিশেষতঃ লাইকোপোডিয়ম (Lycopodiums) ব্যতীত অপর উদ্ভিদেরা আপন কলেবর বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিতে পারে না। কয়েকটি বৃক্ষের ভস্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহাতে সামান্য পরিমাণে এলুমিনা বর্ত্তমান আছে। যথা L. Clavatum ভস্মে শতকরা ২৬·৬৫ ভাগ এবং L. Chamaecy parissusএ ৫৭·২৬ ভাগ এলুমিনা বর্ত্তমান দেখা যায়, কিন্তু ওক (Oak) ফিগ (Fig) এবং বার্চ্চ (Birch) বৃক্ষের ভস্মে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী :—

উহ্‌লার যখন এই ধাতু প্রথম প্রস্তুত করেন, তখন তিনি এলুমিনিয়ম ক্লোরাইড (Aluminium Chloride) এবং পোটাসিয়ম (Potassium) নামে এক ধাতু উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ একটি বদ্ধ মুচিতে (Crucible) রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করেন। এই উপায়ে এলুমিনিয়ম ধূসর বর্ণের চূর্ণের ন্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ১৮৫৪ খৃঃ অঃ বুনসেন (Bunsen) বৈদ্যুতিক প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করেন। যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া এলুমিনিয়ম প্রস্তুত করা যাউক না কেন, ইহাতে অপর ধাতুর মিশ্রণ থাকিবেই থাকিবে। তবে অল্প পরিমাণে থাকিলে বিশেষ কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। "উত্তম এলুমিনিয়ম" নামে বাজারে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও শতকরা ৯৯·৫ ভাগ প্রকৃত এলুমিনিয়ম বর্ত্তমান। এই সকল অপর ধাতু যাহা

মিশ্রিত থাকে তাঁহাদিগকে মল (Impurities) বলে। প্রধানতঃ এইরূপ এলুমিনিয়মে লৌহ (Iron), সিলিকন (Silicon) এবং সোডিয়ম (Sodium) মল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সিলিকন অধিক পরিমাণে থাকিলে এলুমিনিয়ম বড়ই ভঙ্গপ্রবণ হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারা কোন পাত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে এক প্রকার কলঙ্ক জন্মিতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ।)

সম্পাদক।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

আমাদিগের রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি সামান্য রূপে এই শাস্ত্রের বিষয় জানিতেন। তাঁহারা কয়েকটী ঔষধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যাদি কি রাসায়নিক নিয়মের অধীনে প্রস্তুত হইত, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল কি না, সে বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মূল এবং যৌগিক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে আমরা অধুনা যেমন জ্ঞাত আছি, সেরূপ তাঁহারা জানিতেন এবং বুঝিতেন কি না সে বিষয়ের মীমাংসা বড়ই সন্দেহপূর্ণ। তাঁহারা কেবল ক্ষিতি, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারিটিকে মূল পদার্থ বলিয়া বুঝিতেন, এবং এই কয়েকটি দ্রব্যের দ্বারা পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতেন। "ক্ষিতি" অর্থে, তাঁহারা পদার্থের শুষ্কতা এবং শৈত্যগুণ, "জল" অর্থে শৈত্য এবং রসগুণ, "অগ্নি" অর্থে শুষ্কতা এবং তেজ, এবং "বায়ু" অর্থে রস এবং তেজ বুঝিতেন।

তাঁহারা মনে করিতেন, যে সকল বস্তুই এক অদ্ভুত পদার্থ দ্বারা গঠিত; তবে উল্লিখিত ধর্ম্মের বা গুণের ন্যূনাধিক্যের জন্য পদার্থ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কেন না তাঁহারা দেখিতেন বায়ু হইতে

জলের সৃষ্টি এবং জল হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইতেছে। জল উত্তাপ পাইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হয়। এই বাষ্প প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা মনে করিতেন, যে এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করা সম্ভব, এবং সকল ধাতুকেই স্বর্ণ করা যাইতে পারে।

তথাপি এই সময় হইতেই রসায়ন শস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; এবং ইজিপ্ট দেশ হইতে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ইজিপ্শিয়ান ধর্ম্মযাজকেরাই এই শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা অপর কাহাকেও ইহার বিষয় জানিতে দিতেন না। পরে যখন ৬৪০ খৃঃ অঃ আরবেরা ইজিপ্ট আক্রমণ করে, তখন আরবেরাও এই শাস্ত্রের বিষয় কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করে। আরবদেশের পণ্ডিত গেবার, রসায়ন সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক রচনা করেন, ক্রমে সে গুলি লাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল পুস্তকের প্রধান লক্ষ্য ছিল, যে কি কি প্রকারে সামান্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয়ও লিখিত আছে। তন্মধ্যে ফিল্‌ট্রেশন্ (Filtration), ডিষ্টিলেশন্ (Distillation), ক্রিষ্টালিজেশন্, (Crystallisation) এবং সাব্লিমেশন্ (Sublimation) এই কয়টিই প্রধান। এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারায় তিনি যে সকল নূতন পদার্থের উৎপাদন করিয়াছিলেন, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এই সকল গ্রন্থে লিখিত আছে। ফটকিরি, হিরাকস, সোরা এবং নিশাদল এই সকল দ্রব্যের ব্যবহারও তিনি জানিতেন। তাঁহার পুস্তক সকল পাঠ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি, যে নাইট্রিক্ এসিড (Nitric Acid), প্রস্তুত প্রণালীও তিনি জানিতেন। বস্তুতঃ গেবারই রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক। তাঁহার মতে সকল ধাতুই পারদ এবং গন্ধকের সংযোগে প্রস্তুত; তবে যে আমরা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতে পাই তাহার কারণ পারদ এবং গন্ধকের পরিমাণের বিভিন্নতা।

তিনি মনে করিতেন পারদই প্রধান বস্তু; এবং কেবল গন্ধকের পরিমাণের তারতম্যের জন্য অন্যান্য ধাতুর মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার বিবেচনায় স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুতে কেবল পারদই

বর্ত্তমান আছে, কারণ অগ্নি প্রয়োগ করিলে সে গুলির রূপান্তর হয় না। কিন্তু অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুতে গন্ধকের পরিমাণ এত অধিক যে সামান্য উত্তাপে সে গুলি রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। কেবল যে পারদ এবং গন্ধকের পরিমাণের বিভিন্নতাই ধাতুর বিভিন্নতার প্রধান কারণ তাহা নয়, ইহার আরও একটি কারণ আছে; সেটি পারদের বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ অবস্থা। এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্ণের তারতম্য দেখিয়া তিনি স্থির করেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্যে বিশুদ্ধ পারদ ব্যতীত, একটিতে লোহিত গন্ধক এবং অপরটিতে শুভ্র গন্ধক বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই কারণে স্বর্ণ এবং রৌপ্য একত্রে গলাইলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যায়।

গ্রীস এবং ইতালীর অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, আরব দেশ শিল্প এবং বিজ্ঞানে উন্নতির চরম সীমা লাভ করিতেছিল। ইতিহাস পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে ত্রয়োদশ শতাব্দিতে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই যে সকল রসায়নবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আরব দেশে রসায়ন শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্পেন দেশে বিখ্যাত Raymund Lully, ফরাসি দেশে Arnold Villanovanew এবং জার্ম্মনিতে Albertus Magness জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে অল্পে অল্পে চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে রাসায়নিক আলোচনা সমস্ত সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে রসায়ন শাস্ত্রের অনেকটা উন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই সময়ে ভেষজরসায়ন নামে আর একটি শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়। রোগ নিবারক অদ্বিতীয় ঔষধের আবিষ্কারই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য ভ্রমাত্মক হইলেও, চেষ্টার ফলে অনেক শুভ ফল উৎপাদিত হইয়াছিল। Basil Valentine স্পর্শ মণির (Philosopher's Stone) বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু এতাদৃশ পণ্ডিতেরা যে "পরশ" মণির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। (ক্রমশঃ।)

সম্পাদক।

জীবনীশক্তির মৌলিক উপাদান।

জগতের প্রত্যেক পদার্থের অতুলনীয় ক্রিয়াকলাপ পরিদর্শন করিয়া অনুসন্ধিৎসু মানব স্বতঃই তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। পুরা কালে, বুদ্ধির নবীন বিকাশের সময়, মানবের মন রাশি রাশি প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা তখন সহজ সাধ্য কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিলেন এবং জটিল বিষয়গুলি মনের আপাতঃ সন্তুষ্টির জন্য, বাল-সুলভ যুক্তি দ্বারাই মীমাংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে সেই সমস্ত সমাহিত প্রশ্নই ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব জটীল প্রশ্ন মীমংসার সূত্র বাহির করিয়া দিয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও জটীলতর প্রশ্নের আবিষ্কার করিয়াছে।

জীবিত সৃষ্ট পদার্থ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, স্থাবর ও জঙ্গম। পূর্ব্বে সাধারণতঃ সকলে মনে করিতেন, জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এমন কি প্রাচীন পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরাও মনে করিতেন, যে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কোন বিষয়ের ঐক্য নাই; এবং এই দুই জীবন প্রণালী কার্য্যতঃ, প্রকৃতিগত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই ব্যহ্যতঃ বিভিন্ন জীবন প্রণালীর মৌলিক উপাদান এক।

জীব শরীর হইতে সদ্য গৃহীত একটু পেশী, বৃক্ষের বর্দ্ধনশীল মূল, কিম্বা কোমল হরিৎপত্র হইতে অত্যন্ত পাতলা করিয়া একটু অংশ কাটিয়া, জল মধ্যগত করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে জীব অথবা উদ্ভিদ উভয়েই পৃথক পৃথক অথচ ঘন সন্নিবিষ্ট, জ্যামিতিক কোনরূপ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ, কতকগুলি ক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র গুলিকেই সেল্ (cell) কহে। এক একটি সেল্ এর চতুর্দ্দিকস্থ রেখা গুলিকে সেল ওয়াল (cell wall) কহে। কখনও কখনও সেল ওয়াল গুলি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সেল এর মধ্যস্থ

স্থূল এবং বিন্দু সদৃশ এক একটি নিউক্লিয়াস্ (nucleus) থাকে। এস্থলে জানা উচিত যে কোন কোন সেল এর সেল ওয়াল বা নিউক্লিয়াস নাই। এই নবীন মূল ও সদ্যগৃহীত জীব পেশীগত এই সমস্ত সেল গুলিতে প্রায় স্বচ্ছ, মৃদু ধুসরবর্ণাভ, আটার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ থাকে; তাহাও আবার সূক্ষ্ম, চূর্ণ বালীর ন্যায় বিন্দু বিন্দু, স্বচ্ছ এক প্রকার পদার্থে পূর্ণ; তাহাই প্রোটোপ্ল্যাজম (protoplasm) নামে অভিহিত। প্রোটো-প্ল্যাজমই কি উদ্ভিদ, কি জীব, সমস্ত প্রাণীরই জীবিত অংশ।

১৮৪৬ খৃঃ অঃ প্রথম উদ্ভিদ শরীরে প্রোটোপ্ল্যাজম আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ শীঘ্রই প্রাণী শরীরেও প্রোটোপ্ল্যাজম আবিষ্কার করিয়া জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। এই প্রোটো-প্ল্যাজম সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আবিষ্কারকগণ পরে স্থির করিয়াছেন, যে রাসায়নিক বিশেষত্বই পদার্থের চৈতন্য ও অচৈতন্যের কারণ।

যাহা হউক, জীব ও উদ্ভিদ জীবনী একই প্রোটোপ্ল্যাজম হইতে উদ্ভূত। জীব এবং উদ্ভিদ উভয়ই উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয়, এবং অবশেষে বিনষ্ট হয়। উভয়ের সেলএই প্রোটোপ্ল্যাজম রহিয়াছে; এবং এই প্রোটোপ্ল্যাজমই সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া জীব এবং উদ্ভিদ শরীরের শৈশব অবস্থা হইতে বয়স্ক অবস্থা আনয়ন করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রোটোপ্ল্যাজম নিহত হয়। মৃত বা অচেতন পদার্থ প্রোটোপ্ল্যাজম নহে। রসায়নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে ইহা একটি মৌলিক পদার্থ নহে, কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে এক যৌগিক পদার্থ।

প্রোটোপ্ল্যাজম জীবিত। সেই জন্য তাহারা নিজ ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট অবয়বের মধ্যে খাদ্যের সৃষ্টি করে, এবং জীবনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ইহা ক্রমাগত নিজ আয়তনের কোন অংশ ভগ্ন করে, কোন অংশ কখনও বা নির্ম্মাণ করে। জীব জন্তুর শৃঙ্গ মাংস, এবং উদ্ভিদের সমস্ত পদার্থ এই প্রোটোপ্ল্যাজম সম্ভূত। কোমল নব জাত সেলেই প্রোটোপ্ল্যাজম ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ পুরাতন সেলে প্রোটোপ্ল্যাজম কর্ত্তৃক অন্যান্য পদার্থ নির্ম্মিত হওয়ায় তাহারা নিজে বড়ই অস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রোটোপ্ল্যাজম সাধারণতঃ প্রোটিড (protid) নামক এক প্রকার যৌগিক পদার্থ সম্ভূত। প্রোটিডে নিম্নলিখিত পাঁচটি মূল পদার্থ রহিয়াছে :—

অক্সিজেন	শতকরা	২০·৯	হইতে	২৩·৫
হাইড্রোজেন	"	৬·৯	"	৭·৩
নাইট্রোজেন	"	১৫·২	"	১৭·৫
কার্বন্	"	১৫·৫	"	৫৩·৫
গন্ধক	"	০·৩	"	২·০

এই প্রোটিডের মধ্যে য়্যালবুমেন (albumen) প্রধান। একটি সদ্য প্রসূত ডিম্ব ভগ্ন করিলে, প্রায় বর্ণশূন্য, তরল, অথচ থকথকে যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই য়্যালবুমেন, এবং উহা দেখিয়াই প্রোটিডের একরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। প্রোটোপ্ল্যাজমের অধিকাংশই প্রোটিড। ইহা ব্যতীত প্রোটোপ্ল্যাজমে অনেক পরিমাণে জল, অল্প কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate), অতিঅল্প লৌহ এবং পোটাসিয়াম্ (potassium) ক্যালসিয়াম্ (calcium) এবং ম্যাঙ্গানিজ (manganese) এর ফস্ফেট (phosphate) এবং সাল্ফেট (sulphate) রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রোটোপ্ল্যাজমে অন্য বিশেষ কোন যৌগিক পদার্থ থাকিলে, তাহার অণুগুলি প্রোটীডের অণু অপেক্ষা অধিকতর জটীল।

প্রোটোপ্ল্যাজমের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে দেখা যায়, যে প্রথমতঃ ইহা সঞ্চরণশীল। ইহার গতি দেখিতে হইলে, বৃক্ষ পত্র সঞ্জাত চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, শ্বেত বর্ণাভ এক প্রকার কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। শশা গাছে অথবা বিছুটী গাছে এইরূপ অসংখ্য কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঁটাগুলি এক শ্রেণী সজ্জিত দীর্ঘ নলের ন্যায় কতকগুলি সেল্ল নির্ম্মিত। প্রত্যেক সেল ওয়ালগুলি এক স্তর প্রোটোপ্ল্যাজমে পূর্ণ এবং নিউক্লিয়াসের চতুষ্পার্শ্বেও প্রোটোপ্ল্যাজম্ থাকে। প্রোটোপ্ল্যাজমের এই স্তর হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা বহির্গত হইয়াছে। সেই নালাগুলি কোন কোন স্থানে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা একটির উপর দিয়া যাইয়া অন্যটির সহিত মিলিত হইয়াছে।

প্রোটাপ্লাজম দেখিতে দেখিতে চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া যাইলে, প্রশস্ত নালাগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম নালাগুলিতে, নিউক্লিয়াস হইতে প্রোটোপ্ল্যাজমের ক্রমাগত গতায়াত দেখিতে পাওয়া যায়। শোণিতের মধ্যে দুইরূপ কণিকা থাকে, শ্বেতরক্ত-কণিকা ও লোহিতরক্ত-কণিকা; তাহাদের মধ্যেও একরূপ গতি পরিদৃষ্ট হয়। য়্যামিবইড্ (amoeboid) এর মধ্যেও একরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। পাটা শাওলার পাতা অল্প চাঁচিয়া দেখিলে তাহাতেও প্রোটোপ্ল্যাজমের একরূপ গতি দৃষ্ট হয়।

প্রোটোপ্ল্যাজম তাহার ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত থাকিলে, পুনরায় তাহাকে কার্য্যে উত্তেজিত করা যাইতে পারে। আমাদের শিক্ষা, ক্রিয়াকলাপ, উন্নতির ইচ্ছা, ক্রোধ ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই প্রোটোপ্ল্যাজমের উত্তেজিত হইবার ধর্ম্ম সম্ভূত। বাহিরের কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ বা ক্রিয়া দ্বারা প্রোটোপ্ল্যাজমের উত্তেজিত হইবার ক্ষমতা না থাকিলে আমাদের কোন উন্নতিই সম্ভবপর হইত না। কেননা জীবনী শক্তির মূল উপাদান কোন গুণ বিচ্যুত হইলে, তাহার আধারও সেই গুণ হীন হইয়া পড়ে। কোন জীব বা উদ্ভিদ শরীর হইতে একটু পেশী গ্রহণ করিলে, এইরূপ আকস্মিক আক্ষেপে প্রোটোপ্ল্যাজম গুলি অসাড় হইয়া পড়ে। কিন্তু তাড়িত প্রয়োগে বা সামান্য উত্তাপে তাহারা পুনরায় ক্রিয়া শীল হয়। এই সমস্ত উত্তেজক পদার্থ নানা প্রকার; খাদ্য, আলোক, বায়ু, জল, ইত্যাদি। যে জলীয় পদার্থের মধ্যে প্রোটোপ্ল্যাজম নিহিত থাকে, তাহার বিশুদ্ধতাও অবিশুদ্ধতা অনুসারে প্রোটোপ্ল্যাজমের উত্তেজিত হইবার ক্ষমতার তারতম্য হয়। রুগ্নের কোন বিশেষ বিষয় ব্যতীত কোনরূপ কার্য্যে উত্তেজিত হইবার সম্ভবনা অল্প।

প্রোটোপ্ল্যাজম খাদ্যগ্রহণ করিতে ও বায়ু গ্রহণ এবং প্রতিগ্রহণ করিতেও সক্ষম। খাদ্য গ্রহণ করিয়া প্রোটোপ্ল্যাজম প্রয়োজন ও নিয়ম অনুসারে নিজ শরীরের বৃদ্ধি করে, অথবা অন্য প্রোটোপ্ল্যাজমের সৃষ্টি করে। জীব বা উদ্ভিদ শরীরগত প্রথম জাত সেল গুলিই যে ক্রমাগত আয়তন বৃদ্ধি করিয়া প্রকাণ্ড হইয়া পড়ে তাহা নহে। সেল গুলি নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হইলে, অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক হইলে, এক পার্শ্বে অন্য একটি ছোট সেল

প্রসব করে, তাহাই আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে অন্য একটি সেল উৎপাদন করে।

জীবন পরিচালনের জন্য যে সমস্ত পদার্থ ক্ষয়-প্রাপ্ত-প্রোটাপ্ল্যাজম হইতে বিনির্গত হইয়া পড়ে, জীবের মলমূত্র ত্যাগের ন্যায়, সেই সমস্ত পদার্থকে প্রোটোপ্ল্যাজম পরিত্যাগ করে। অপরিষ্কার পুষ্করিণীর জল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, তাহাতে একটি সেল বিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের প্রোটোপ্ল্যাজম গুলি বেশ পরিষ্কার বাণীর ন্যায় এবং নিউক্লিয়াস বেশ পরিদৃশ্যমান। এই সেল মধ্যে অল্প একটু গোলাকার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাহাকে শূন্য গর্ভ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখা যায়, যে সেই স্থানটি হঠাৎ ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সম্মুখস্থ জল বেগে ঘুরিতে থাকে। পরে ধীরে ধীরে সেই শূন্য স্থান পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং পুনর্ব্বার ছিন্ন হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এই স্থানেই, প্রোটোপ্ল্যাজমের জীবনী শক্তি পরিচালন কালীন সম্পূর্ণ ব্যবহৃত পুনঃ প্রয়োজন শূন্য পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়, এবং বৃদ্ধি পাইলে সেই স্থান ভগ্ন হইয়া সেই অনাবশ্যক পদার্থগুলি জলে মিশ্রিত হয়। এই জীববিশেষে প্রোটোপ্ল্যাজমের এইরূপ ক্রিয়া বেশ ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য অন্য সেলেও এইরূপ ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে, কিন্তু তাহা এত ধীরে ধীরে, যে এরূপ ভাবে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রয়োজন হইলে প্রোটোপ্ল্যাজম নিজ আয়তনের সঙ্কুচন ও প্রসারণ করিতে পারে, এবং উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজনা এক প্রোটোপ্ল্যাজম হইতে অন্য প্রোটোপ্ল্যাজমে নীত হয়। বৃক্ষ ও জীব শরীরে একস্থানে আঘাত করিলে, শরীরস্থ সমস্ত প্রোটোপ্ল্যাজমেই সেই আক্ষেপ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

অতি নিম্নস্তরের জীব হইতে উচ্চতম জীব মানব জীবনের এই মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রত্যেক মনস্বীরই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ জগতের প্রত্যেক জীবিত পদার্থই প্রোটোপ্ল্যাজমের সমষ্টি। মানবের সহিত অন্য অন্য নীচ প্রাণীর এত নিকট সম্বন্ধ, ইহা ভাবিলে বাস্তবিক

শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ে অনন্ত কৌশল পরিদর্শন করিয়া যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এই প্রোটোপ্ল্যাজমই চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে এক সুদুস্তর পরীখা স্বরূপ।

প্রত্যেক জীব একটি সেল বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এবং সেই একটি সেলের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক সচেতন জীবের শরীরই যে গঠন প্রণালীতে অবিভিন্ন তাহা নহে, তাহার বৃদ্ধিও একই নিয়ম ভুক্ত। প্রোটোপ্ল্যাজমে যে যে ধর্ম্ম, মানব জীবনেও সেই সেই ধর্ম্ম কার্য্য করে। প্রোটোপ্ল্যাজমের একটি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অতি মনস্বীও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। মানবের সমস্ত কীর্ত্তি, সমস্ত গৌরব, প্রোটোপ্ল্যাজমের উপর নির্ভর করে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বিবিধ।

লেমন গ্রাস (Lemon grass) হইতে তৈল।—বার্ম্মা প্রদেশে টউনগু নামক স্থানে লেমন গ্রাস হইতে সুন্দর রূপে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। এই তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিও সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। বার্ম্মা প্রদেশে লেমন গ্রাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তৈলের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইলে কারবার মন্দ চলিবে না। চেষ্টা করিলে আমাদের দেশেও লেমন গ্রাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

চিনি।—ভারত বাসীর সাধারণতঃ বিশ্বাস হাড়ের কয়লা এবং রক্ত মিশ্রিত না করিলে শুভ্র চিনি প্রস্তুত হইতে পারে না। বাস্তবিক এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। গুড় হইতে শুভ্র চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত কয়লা এবং রক্ত ভিন্ন উপায় নাই বটে, কিন্তু অন্য অন্য দেশের লোকেরা ইক্ষু কিম্বা বিট রস গুড়ে পরিণত না করিয়াই শুভ্র চিনি প্রস্তুত করিতে পারে কাজেই হাড়ের কিম্বা রক্তের প্রয়োজন হয় না। আগামী মধ্য

প্রদেশ ও বেরারের প্রদর্শনীতে যুক্ত প্রদেশের এসিট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকাল্‌চাব রস হইতে একবারে শুভ্র চিনি প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শন করিবেন। অতি অল্প ব্যয়ে এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইবে। ইক্ষু কৃষকেরা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে এই নূতন প্রণালী দেখিয়া আসিলে অনায়াসে শুভ্র চিনি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন।

ঘড়ি।—ফ্রাঙ্কো ব্রিটিশ একজিবিশনে এক অদ্ভুত ঘড়ী প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘড়ির মূল্য ১৫০০০৲ টাকা। ইহার আকার সাধারণ ওয়াচের ন্যায় এবং দুই দিকেই মুখ। প্রত্যেক কোয়াটারে, অর্দ্ধঘণ্টায় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি হয়। ইহা সূর্য্যের উদয় অস্ত এবং গ্রীন উইচরে মীন টাইম নির্দ্দেশ করে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে চন্দ্রের উদয় অস্ত, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সময়, মাস, তারিখ ও বার পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। দম দিলে আপনা আপনিই উপরোক্ত সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হয়।

প্ল্যাটিনামের জন্ম ভূমি।—রাশিয়া দেশের প্ল্যাটিনাম ক্ষেত্রই সর্ব্ব প্রধান। তাহার পরেই কলোম্বিয়াব ক্ষেত্র। চোকো উপসাগর তীরস্থিত নুড়ি সকল ধৌত করিয়া যে প্ল্যাটিনাম পাওরা যায়, তাহাতে প্রায়ই সুবর্ণ কিম্বা অন্য ধাতু অনেক পবিমাণে মিশ্রিত থাকে। স্যানজুয়ান নদীর উপনদী প্ল্যাটিনা, কনডাটা, কেজন এবং অন্য শাখা প্রশাখাব তীরেও প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত আগুয়া ক্ল্যারা নদী এবং বাবনাবা নদীর তীরেও এই ধাতু পাওয়া যায়। এই দুই নদীই আট্রাটো নদীব উপনদী। এই সমস্ত নদীই দক্ষিণ আমেরিকাব কলম্বিয়া প্রদেশে প্রবাহিত।

ইক্ষু হইতে মোম প্রস্তুত প্রণালী।—জাভা দ্বীপে ইক্ষু হইতে মোম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইক্ষু রস বিশুদ্ধ করিবাব সময় যে পদার্থ বিনির্গত হয় তাহাকে, ঐরূপে মোম প্রস্তুত করিবাব জন্যই উদ্ভাবিত এক যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কৃত করিয়া পেট্রোল বেনজিনের সহিত ফুটাইতে হয়। ক্রমে ক্রমে পেট্রোল বেনজিন উড়িয়া যাইলে মোমের ন্যায় সবুজ বর্ণের এক প্রকার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। তাহাকে ক্লোরিণের সাহায্যে শুভ্র করিলেই উৎকৃষ্ট মোম প্রস্তুত হয়।

ম্যালেরিয়া।

ভারতবর্ষে সচরাচর যে সকল জ্বর হইয়া থাকে, তাহা যে কোন কোন মশার কামড়ে হইয়া থাকে, তাহার উত্তম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল জ্বরে সচরাচর প্রথমে শীত বা কম্প, তাহার পরে গায়ের তাপ বৃদ্ধি এবং সর্ব্বশেষে ঘাম হইয়া থাকে। এই জ্বর সাধারণতঃ বর্ষার শেষে অত্যন্ত কঠিন ও সাংঘাতিক হইয়া থাকে এবং ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগে যত লোকের প্রাণ নাশ করে, তাহার দ্বিগুণ লোকের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। অতএব কি করিলে এই সকল জ্বর কমাইয়া লোক প্রাণ রক্ষা করিতে, আর এই সকল জ্বরাদির জন্য লোকের যত কষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিবারণ করিতে পারাযায়? প্রথমতঃ আমাদিগকে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল জ্বর সংক্রামক। অতএব যে মশা এই রোগ ছড়াইয়া বেড়ায়, রোগীকে সেই সব মশা যাহাতে কামড়াইতে না পারে তজ্জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে মশারীর ছিদ্র খুব ছোট এবং যাহাতে একটীও গর্ত্ত নাই, (অর্থাৎ যাহা আদৌ ছেঁড়া নহে) রোগীকে তাহার ভিতর রাখিলে, তাহাকে মশার কামড় হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রোগীকে যদি একটা ঘরে একা রাখিতে পারা যায়, তবে তাহাই করা উচিত এবং রোগী ছোট ছেলে হইলে তাহাকে একটা ঘরে একা রাখা আরও বেশী আবশ্যক এবং রোগীকে কুইনাইন, সিন্‌কোনা, ফেব্রিফিউজ্ বা জ্বর নাশক সিন্‌কোনা, অথবা সিনকোনা গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত করা অন্য কোন ঔষধ খাইতে দেওয়া উচিত। যে ক্ষুদ্র জীব এই জ্বর করিয়া দেয়, এই সকল ঔষধে তাহাকে দেহের রক্ত হইতে বাহির করিয়া ফেলে। ডাক ঘরে কুইনাইনের এক পয়সা দামের যে মোড়ক বিক্রয় করা হয়, বয়স্ক লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মাত্রা বা পরিমাণ। ছেলেরা এই সকল জ্বরে অত্যন্ত ভোগে, অতএব জ্বর হইবামাত্রই তাহাদিগকে কুইনাইন দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে সর্ব্বদা জ্বর হয়, সেই সকল স্থানে বয়স্ক লোকেরা যদি নিয়ম করিয়া, সপ্তাহে দশ গ্রেণ করিয়া দুইবার কুইনাইন খান, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রায় কাহারও জ্বর হয় না। ক্রমশঃ।
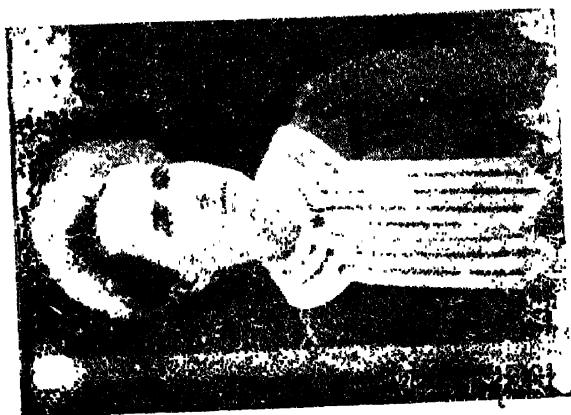
বিজ্ঞান দর্পণ।

১ম বর্ষ।] ফাল্গুন ১৩১৪, [illegible] ১৯০৭। [২য় সংখ্যা।

মানব।

যে মানব স্বীয় জ্ঞানবলে সুদূরস্থিত গ্রহগণের পরিমাণ স্থির করিতেছে, বুদ্ধি বলে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিবেকবলে অতি মহৎ কর্ম্মেও সু ও কুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করতঃ শনৈঃ শনৈঃ শুভ ফল লাভ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে, সেই মানবই যে অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রম সমুদ্ভূত, ইহা ভাবিতে প্রথমে সাধারণে বড়ই ইতস্ততঃ করিয়াছিল। এখনও অনেকে নিজ আকৃতি প্রকৃতির সহিত বানরের আকৃতি প্রকৃতির সমত্ব দেখিতে লজ্জা বোধ করে। কাজেই ডারউইনের অনুমান প্রথমে লোক সমাজে বড়ই নিন্দনীয় হইয়াছিল। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক "Descent of Man"কে লোকে বানরের [illegible] কারিত এবং পাঠের অযোগ্য বলিয়া মনে [illegible]

ডারউইন নি[illegible] শরীর হইতে ম[illegible] উন্নতির ধারাবাহিকত্বই প্রতি[illegible] [illegible] কিরূপে নিকৃষ্ট জীব [illegible] ক্রমে শারীরিক উন্নতি [illegible] মানবে পরিণত হইয়াছে, [illegible] বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছে[illegible] জীব শরীরের সহিত মানবদেহের কি সম্পর্ক তাহার[illegible] [illegible]।

আজকাল সকল বৈজ্ঞানিক[illegible] ক্রমোন্নতিশীলত্বে বিশ্বাস করেন। যদি মানব ক্রমোন্নতিশীল না হইত, তাহা হইলে আদিম মানবের

বর্ব্বরোচিত অবস্থার পরিবর্ত্তন কি সম্ভব হইত? গিরীগুহাবাসী, আমমাংসভোজী, উলঙ্গ, পাশবপ্রকৃতিসম্পন্ন আদিম মানব আজও পর্য্যন্ত অন্যান্য পশুর ন্যায় একই অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। জগতে যে দিন জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, যে প্রথমদিনে সৃষ্ট কোন পদার্থ প্রাণ পাইয়া জীবিত খ্যাত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, নিত্য নূতন, অথচ পুরাতন হইতে প্রশস্ততর কোন পদার্থে, অথবা পুরাতন পদার্থেরই কোন অংশ প্রশস্ততর করতঃ তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সেই নূতনীকৃত পুরাতন পদার্থে জীবন সঞ্চার নিরবচ্ছিন্ন চলিয়া আসিতেছে এবং আদিম অতি নিকৃষ্ট জীবই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মানবে পরিণত হইয়াছে।

ইহাই মানব সৃষ্টির অতি সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত। শাস্ত্রাদিতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস অন্যরূপ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মতে, ভগবান প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা মানব শরীর নির্ম্মাণ করতঃ, স্বয়ং সেই মৃত্তিকা মূর্ত্তির নাসিকা-রন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া অচেতন মূর্ত্তিতে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিলেন। হিন্দুমতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জানু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। মানব সৃষ্টির এরূপ ইতিহাস একবারেই কাল্পনিক। মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতির সৃষ্টি কেমন করিয়া সম্ভব? তবে হিন্দু ঋষি মানবকে জাতীয়তা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন—"ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।" আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথকও নহি। হিন্দু মতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস যেরূপ কাল্পনিক, খৃষ্ট মতেও তদ্রূপ, বরং খৃষ্টানদের কল্পনা আরও নিকৃষ্টতর। "Let us make man in our own image, after our own likeness" এরূপ উক্তির ওরূপ ব্যাখ্যা বাস্তবিকই বালকসুলভ। "God's offspring are we"—গ্রীক পণ্ডিতগণ মানবকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিতেন। মহম্মদের মতে, জগদীশ্বর স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনিও কোন মানবের জন্ম দেন নাই। এইরূপে দেখা যায় প্রতিধর্ম্মে মানবসৃষ্টির একটা না একটা কৌতুকপ্রদ ইতিহাস রহিয়াছে। এরূপ ইতিহাস উৎপত্তির কারণও যথেষ্ট।

ধর্ম্মশাস্ত্রে মানব সৃষ্টির ইতিহাস যেরূপই থাকুক না কেন, সাধারণের

বিশ্বাস যে দেহ মাটী হইতে নির্ম্মিত, ভগবান বাস্তবিকই মাটী হইতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বিবেকী, বুদ্ধিমান, কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনভিজ্ঞ কোন লোককে "তিনি কিরূপে নির্ম্মিত?" একথা জিজ্ঞাসা করিলেই, তৎক্ষণাৎ অবিচলিত চিত্তে তিনি উত্তর দিবেন "মাটীর দেহ! ভগবান মাটী লইয়াই মানব সৃষ্টি করিয়াছেন।" খৃষ্টানেরা এরূপ বিশ্বাসের একটু সংস্কার করিয়াছেন ;--

Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the soul.

বানরই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মানবে পরিণত হইয়াছে, এরূপ অতি অপ্রিয় সত্যে বিশ্বাস করা অপেক্ষা, ভগবান মৃত্তিকার দ্বারাই একবারে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে সাধারণতঃ সকলেরই ভাল লাগে। কাজেই বিজ্ঞানশাস্ত্র অনভিজ্ঞগণ যে ডারউইনের মতকে অশ্রদ্ধা করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ডারউইনের অভিমত প্রথমতঃ লোকের নিকট কিরূপ বিদ্রূপাস্পদ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর ইতিবৃত্ত Paul Carus রচিত "Rise of Man" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে :—

When the writer of these lines (Paul Carus) was a child, he knew a pleasant gray-haired teacher of a country parish school, who used tell the story, that when he once explained to his children, the first Chapter of the Bible, one of the boys, the son of a rich farmer, rose and said—"Mr. Teacher, my father says, we are descended from the ape." Our sage old pedagogue cut off all further perplexities by saying—"It would not be proper here to discuss the private affairs of your family."

অসাধারণ ধৈর্য্যশীল, অমানুষিক ধীশক্তি সম্পন্ন ডারউইন বহু গবেষণা দ্বারা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সত্য না বুঝিয়াও, সেই সত্যের গভীর মর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারিয়াও, অনেকে স্বচ্ছন্দে

তাঁহাকে উপহাস করেন। যদি ডারউইনের অভিমত অসত্যও হইত, কষ্ট কল্পনা প্রসূতও হইত, অথবা একবারে বাস্তবিক বিজ্ঞান বহির্ভূতও হইত, তথাপি তাঁহার আবিষ্কার যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, একথা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখেন না। ভগবান ইচ্ছা করিলেন, আর মাটী দিয়া এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাশীল মানব সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, অথবা জগদীশ্বর নিজ দেহের বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ জাতি সৃষ্টি করতঃ মানব সৃষ্টি করিলেন, এরূপ ধারণা অপেক্ষা সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে, অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব সৃষ্টির দিন হইতে, এমন কি ভগবানের সৃষ্টিকল্পনার দিন হইতে, বাস্তবিকই মাটীর দ্বারাই প্রথম অতি নিকৃষ্ট জীব সৃষ্টি করতঃ, পশু শ্রেষ্ঠ বানর সৃষ্টির দিন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর সৃষ্ট পদার্থ ক্রমাগত উন্নত করিয়া, বহু রূপে সৃষ্টি করণোপযোগী উপকরণ পরীক্ষা করতঃ ভগবান মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ মনে করাই অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। এইরূপ মনে করিলে, ধূলি হইতে অবিভিন্ন পদার্থ সৃষ্ট হইলেও, মানব-সৃষ্টির গৌরব বৃদ্ধি পায়, মানবের মহত্ব আরও প্রকাশ পায় এবং মানব যে সৃষ্ট অন্যান্য জীবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ন্যায় সঙ্গত অধিকারী তাহাই প্রমাণ হয়।

কোন নূতন মতে বিশ্বাস করা অপেক্ষা, অসত্য হইলেও পুরাতন মতে বিশ্বাস করিতে লোকে ভালবাসে এবং শত শত প্রমাণ থাকিলেও, নূতন মতের জন্য মনের কোণে একটু অবিশ্বাসের ছায়া পোষণ করে। মানবের এইরূপ পুরাতন বিশ্বাসে আশক্তির জন্যই, সক্রেটিশ রাজদণ্ডে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা বাস্তবিক ধূলি হইতে একবারে অনায়াস-সৃষ্ট নহি। আমাদের উৎপত্তির ইতিহাস ইহা অপেক্ষা আরও মহত্তর; এবং বাস্তবিকই মানব সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পুত্র এবং তাঁহারই প্রতিকৃতি স্বরূপ। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

আবাদ।

ভারত বর্ষের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি অন্যান্য দেশের অনেক কৃষকের নিকট উপন্যাস বলিয়া মনে হয়। সুজলা সুফলা ভারত ক্ষেত্রে এত শস্য উৎপন্ন হয়, যে তদ্দারা ভারত জননীর নিজসন্তান প্রতিপালিত হইয়াও, অন্য দেশের অনেক লোক পরিপুষ্ট হয়। বর্ষায় দিগন্ত ব্যাপী শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখিলে মনে হয়, যেন জগতে ভারতক্ষেত্রই বুঝি লক্ষ্মীদেবীর আদরের আবাসস্থল। কত অনাবৃষ্টি, কত অতিবৃষ্টি, কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, বর্ষায় কতবার উৎকট প্লাবন পীড়িত হইয়াও, ভারতক্ষেত্র অপর্য্যাপ্ত শস্য বিদেশে পাঠাইতেছে। তবে ইহার কুফল অবশ্যম্ভাবী, এবং অনেক সময়ে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। দেশে দুর্ভিক্ষ নষ্ট হয় না, প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা গত বৎসর অপেক্ষা ভীষণতর হইয়া পড়ে, কঙ্কালসার কৃষক বহু কষ্টে লাঙ্গলের মুষ্টি ধরিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে থাকে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে শস্যের রপ্তানি বন্ধ করা অসম্ভব। কাজেই শস্যের উৎপত্তি বৃদ্ধি করা ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই। কি করিলে ভারত ক্ষেত্রে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শস্য উৎপাদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করা আজকাল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যে ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহার মৃত্তিকার সহিত বায়ুর সংমিশ্রণই কৃষিকার্য্যের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য। মাটী এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যে তজ্জাত বৃক্ষাদি ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিয়াও ভগ্ন না হয় এবং অনায়াসে মৃত্তিকা হইতে পরিপোষক খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন কর্ষিত মৃত্তিকায় বায়ুর গতিবিধি এবং ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র সমভাবে জল থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কয়েকটির অভাব হইলে, কখনও শস্য ভালরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না, অথবা শস্য একবারেই উৎপন্ন হয় না।

কর্ষণ অপেক্ষাকৃত গভীর হইলে, উপরোক্ত কয়েকটী বিষয়ের প্রত্যেক-টিই ক্ষেত্রে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। প্রথমতঃ বায়ু অনায়াসে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াই মূল বহুদূর

পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে পারে বলিয়া, ঝড় বৃষ্টির উৎপাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। তৃতীয়তঃ ক্ষেত্রের কোন এক কোণে জল থাকিলেও, কৈষিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বলবান হয় বলিয়া, ক্ষেত্র সর্ব্বত্র সমপরিমাণে ভিজিয়া উঠে।

সম্প্রতি গোয়ালিয়র গভর্ণমেণ্ট বাষ্পপরিচালিত লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করাইবার জন্য ইউরোপ হইতে যন্ত্রাদি আনয়ন করিতেছে। উক্ত গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছে যে, ইউরোপ হইতেই একজন ঐ সকল কার্য্যে পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ লোক আনাইয়া কৃষক সকলকে এরূপ লাঙ্গলের উপকারিতা, কার্য্য প্রণালী এবং কি উপায়ে আবাদ করিলে শস্যোৎপত্তি ভাল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

বহুকাল যাবৎ কেবল মৃত্তিকার উপরিভাগমাত্র কর্ষণ করিয়া চাষ হইয়াছে বলিয়া, এখন ভূমির গভীর কর্ষণ বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ক্ষেত্রে রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, কি উপায়ে কৃষককুল সেই গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে কৃষককুলকে শিক্ষা দেওয়া এখন প্রত্যেক জ্ঞানবানেরই কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

যদি সাবধানতার সহিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা কৃষককুল পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ভারতের দুর্ভিক্ষ নষ্ট হইবেই, অধিকন্তু ভারত ক্ষেত্র অনেক দেশের লোক প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে।

ইহা অনেকার সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, মূল যে খাদ্য গ্রহণ করিলে, বৃক্ষ জীবিত থাকে, এবং বর্দ্ধিত হয়, মৃত্তিকা গভীরতর কর্ষিত হইলে, সেই খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কাজেই খাদ্যের অভাব হয় না বলিয়া, বৃক্ষজাত শস্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অনেক অভিজ্ঞের মুখে শুনা যায়, যে মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি কর্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে। পূরা কালেও এ বিষয়ে কৃষককুলের লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা ইসপ গল্পচ্ছলে এসম্বন্ধেও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মুমূর্ষু কৃষক পুত্রগণকে "ক্ষেত্রে রত্ন লুকায়িত রহিয়াছে, আমি গত হইলে ক্ষেত্র খুঁড়িয়া রত্ন উদ্ধার করিও" এইরূপে রত্ন পাইবার আশায় প্ররোচিত করিয়া, ক্ষেত্র গভীর কর্ষণ করাইয়াছিলেন বলিয়াই পুত্রগণ

পরবৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য পাইতে সক্ষম হইয়াছিল। অনেক অনুর্ব্বর দেশের কর্ষণ গভীর হওয়ায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্র অন্য অন্য উর্ব্বর দেশস্থ ক্ষেত্রের সমতুল্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল শস্যের প্রয়োজন যেরূপ অধিক, তাহাতে শরীরের ক্ষমতা দ্বারা ক্ষেত্রের গভীর কর্ষণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কাজেই যন্ত্রের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্য মৃত্তিকার স্তর, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, শস্যের উৎপত্তির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বাষ্প পরিচালিত লাঙ্গলের প্রচলন কর্ত্তব্য। এই সমস্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাতাগণের নিকট অনুসন্ধান করিলে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা সদুপদেশ দিতে পারিবেন, কেন না এরূপ কার্য্য বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে তাঁহারা পটু হইতে পারিতেন না।

ইহা অতি সত্য, যে ভারতবর্ষে কলের লাঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইলে শুভ ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ বায়ুস্থিত অক্সিজেন মাটীর আর্দ্র স্তরের বহুদূর পর্য্যন্ত মিশ্রিত হইয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ববর্ত্তী শস্যের অবশিষ্ট পরিত্যক্ত অংশ মাটীর অনেক নিম্নভাগে পর্য্যন্ত মিশ্রিত হইবার অবসর পায়। সেই সমস্ত পদার্থ জল এবং কারবণিক এসিড গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই গ্যাস নিম্নস্তরের চূর্ণ বা ভগ্নোন্মুখ মাটী কিম্বা প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। এই বিশ্লিষ্ট পদার্থ গুলি বৃক্ষের জীবনের জন্য বিশেষ উপযোগী। গভীর কর্ষণ না হইলে, সেই মৃত্তিকা অথবা প্রস্তর স্তর পর্য্যন্ত এই গ্যাস যাইয়া উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ বাষ্প পরিচালিত যন্ত্রে চাষ করিলে একবারে অনেক পরিমাণ ক্ষেত্র আবাদ হইতে পারে। কাজেই পূর্ব্বে যে জমীগুলি অনুর্ব্বর বলিয়া পরিত্যক্ত ছিল, তাহাও শস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়া উঠে।

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে জমীর নিম্নস্তরে অনেক পরিমাণে জল বর্ত্তমান থাকে। গভীর কর্ষণ হইলে সেই সমস্ত জল কৈশিক আকর্ষণে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকন্তু মনস্যুনের (monsoon) সময় বহুদূর পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করিতে পাইবে বলিয়া, মাটীর মধ্যস্থিত সার জলে দ্রব হইয়া প্রত্যেক স্থানে সমপরিমাণে মিশিবার অবসর পাইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মাটীর সহিত বায়ুর সংমিশ্রণ চাষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাষ্প পরিচালিত লাঙ্গল মাটী একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেই আল্গা মাটী ক্রমাগত বায়ুর সংস্পর্শে আসায় মাটীতে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়, কাজেই মাটী অনেক দূর পর্য্যন্ত চাষের উপযোগী হইয়া চূর্ণ হইয়া পড়ে। আবার রাসায়নিকক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে বলিয়া, মাটীর উত্তাপও বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত গুলিই প্রচুর শস্য উৎপাদনের উপযোগী। বাষ্প পরিচালিত যন্ত্রে আমাদের সুবিধা ও অসুবিধার পরিমাণ স্থির করিলে, সুবিধার পরিমাণই অধিক হয়।

আমাদের দেশের জমী স্বভাবতঃই উর্ব্বর। আমরা যদি তাহার উর্ব্বরতা শক্তি অন্য কোন উপায়ে আরও একটু বৃদ্ধি করি, তাহা হইলে তাহার শুভফল সম্বন্ধে নিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পায়। আমাদের কৃষককুল দরিদ্র। কিন্তু তাহাদের পিতৃস্থল জমীদারগণ যদি কৃষকগণের এবং সেই সঙ্গে নিজের শুভ কামনায়, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদি কৃষিকার্য্যের জন্য নিজ জমীদারীর মধ্যে প্রচলন করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

রেডিয়াম।

মানব অনুপম অনুসন্ধিৎসা এবং অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে এই মাটীর পৃথিবী হইতে প্রতিদিন রাশি রাশি অদ্ভুত রত্ন আবিষ্কার করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপার সৃষ্টি গরিমা প্রকাশ করিতেছে। এই ভূগর্ভেই স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, প্রভৃতি অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে। কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা আরও বিস্ময় জনক, অধিকতর মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কৃত হইবে না। বৈজ্ঞানিক দিন দিন উন্নতি মার্গে আরোহণ করিতেছে; দিন দিন অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কার করিয়া, অচিন্তনীয় যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া জগৎ চমৎকৃত করিতেছে। তাহার নিকট অসাধ্য নাই, অসম্ভব নাই; কারণ প্রকৃতি তাহার শিক্ষয়ত্রীণ প্রকৃতি ধীরে ধীরে নিজরত্ন ভাণ্ডারের এক একটি অমূল্য রত্ন তাহার হাতে তুলিয়া দিতেছেন।

যে নূতন পদার্থ আবিষ্কারে বিজ্ঞান জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, পদার্থের নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই রেডিয়ামের আবিষ্কর্ত্তা অলৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন এক ফরাসী দম্পতি মনসিয়র এবং ম্যাডাম কুরি।

রেডিয়ামের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা হইতে এক্সরে (X Ray) নামক আলোকের অনুরূপ এক আলোক রশ্মি নির্মুক্ত হয়। যে পিচ্‌-ব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তাহাতেই অতি অল্প পরিমাণে রেডিয়াম থাকে। একটন পিচব্লেণ্ডে মাত্র তিন গ্রেণ রেডিয়াম পাওয়া যায়।

ইউরেনিয়াম ধাতুতে যে যে ধর্ম্ম রহিয়াছে, রেডিয়ামও সেই সমস্ত ধর্ম্ম বিশিষ্ট, তবে ইউরেনিয়ামে ধর্ম্মগুলি সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হয় না। ইউরেনিয়ামে প্রথমে রেডিয়োয়্যাকটিভ্ (radioactive) ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হওয়াতেই, এই নূতন মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রেডিয়ামের অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই ধাতুর কোনরূপ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকেও ইহা হইতে তিন প্রকার আলোক ও যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপ নিরবচ্ছিন্ন বিনির্মুক্ত হয়। তবে ধাতুর নিজের পরিবর্ত্তন না হইলেও এই আলোক ও উত্তাপ বিনির্মুক্তি বশতঃ অন্য এক প্রকার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সপ্রমাণিত হইয়াছে।

প্রফেসর সার উইলিয়ম র‍্যামজে কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে রেডিয়াম হইতে বিনির্মুক্ত আলোক ও উত্তাপ হিলিয়াম নামক এক প্রকার বায়বিয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। পদার্থের এইরূপ পরিবর্ত্তন বৈজ্ঞানিক জগতে সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব।

উত্তাপ রশ্মি ব্যতীত যে তিন প্রকার আলোক রশ্মি বিনির্গত হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা য়্যালফা, বিটা এবং গামা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গামা রশ্মির ধর্ম্ম এক্সরের (X Ray) সমতুল্য। যে সমস্ত পদার্থ সাধারণ আলোকে অস্বচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থে এই আলোক প্রবেশ করিয়া পদার্থগুলিকে স্বচ্ছ করিয়া তুলে। যদি কতকগুলি

মুদ্রা উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলেও এই আলোক তাহাদিগকে ভেদ করিতে পারে।

বিটা রশ্মির এইরূপে ভেদ করিবার ক্ষমতা অল্পতর, কিন্তু ইহার অন্যরূপ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে; তন্মধ্যে নেগেটিভ্ ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ (negative electric charges) বহন করিবার ক্ষমতাই সর্ব্ব প্রধান। এই নেগেটিভ্ ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ, ক্রুকস্ টিউবের ক্যাথোড্ রশ্মির (Cathode rays of Crookes tube) অনুরূপ। ইহাকেই ইলেক্‌ট্রোণ (Electrone) কহে। প্রফেসর জে.জে.টমসন স্থির করিয়াছেন, যে এই সমস্ত ইলেকট্রোণ পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর।

য়্যাল্‌ফা রশ্মির ভেদ করিবার ক্ষমতা একবারেই অল্প, এমনকি অতি পাতলা ধাতব পাত কিম্বা অতি পাতলা কাগজও ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এই রশ্মি পজিটিভ ইলেক্‌টিক চার্জ্জ (Positive electric charges) বহন করে। এই রশ্মি আলোকময়, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অতি ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি, এবং রেডিয়ামের পরমাণু হইতে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতগণ রেডিয়াম আবিষ্কারের পূর্ব্বে, পরমাণুকেই (atoms) পদার্থের ক্ষুদ্রতম বিভাগ মনে করিতেন। অধুনা নূতন মতানুসারে পরমাণু আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত। লর্ডকেলভিন পদার্থের অণুসংখ্যা নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, যে এক ফোঁটা জলকে পৃথিবীর আয়তনের মত বড় করিলে, সেই জলবিন্দু সন্নিবিষ্ট অনুগুলি এক একটি মটরের সম আয়তন বিশিষ্ট হইবে। সেই অণুগুলি আবার পরমাণুতে বিভক্ত। এখন সেই পরমাণুও লক্ষ লক্ষ অংশে বিভক্ত হইতে পারে। রেডিয়ামের পরমাণু সর্ব্বদা অস্থির ভাব সম্পন্ন, সেই জন্য ইহার পরমাণু ক্রমাগত বিপ্রকর্ষিত হইতেছে।

স্পিনথ্যারিস্কোপ্ যন্ত্রে রেডিয়ামের যে আলোক স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই য়্যাল্‌ফা রশ্মি সমুদ্ভূত পজিটিভ ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ। ইহাতে অতি সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম ব্রোমাইড্, একটি জিঙ্ক সালফাইড (Zinc sulphide) প্রলিপ্ত পর্দ্দার সন্নিকটে রাখা হয়। এস্থলে জানা উচিত, যে

আজ পর্য্যন্ত রেডিয়ম্ ধাতু মূল ভাবে পাওয়া যায় নাই, সাধারণতঃ ব্রোমাইড কিম্বা ক্লোরাইড ভাবেই পাওয়া যায়। জিঙ্ক সালফাইড দিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহার উপর রেডিয়ামের রশ্মি বিকীর্ণ হইলে জিঙ্ক সালফাইড আলোকিত হইয়া পড়ে। জিঙ্ক সালফাইড ভিন্ন অন্য যে পদার্থ রেডিয়াম সংস্পর্শে আলোকিত হইয়া পড়ে, পর্দ্দা তাহা দ্বারা প্রলিপ্ত করিলেও চলিতে পারে। সেই পর্দ্দাটিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, রেডিয়াম সমুদ্ভূত য়্যাল্‌ফা রশ্মির নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়।

রেডিয়াম হইতে ক্রমাগত আলোকময় কণিকা বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই কণিকা এত অসাধারণ ক্ষুদ্রতম যে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ রেডিয়াম হইতে শত শত বৎসর একই অপরিবর্ত্তিত গতিতে কণিকা বিক্ষিপ্ত হইয়াও রেডিয়ামের পরিমাণ কমিয়াছে কিনা বোধগম্য হয় না। মন্‌স্ বেকরেল স্থির করিয়াছেন যে একশত কোটী বৎসর এইরূপ ভাবে কণিকা বিকীর্ণ হইলে, এক গ্র্যাম রেডিয়ামের সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র পরিমাণ কমিয়া যায়।

সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ রেডিয়ামের এই অসাধারণ ক্ষমতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে স্পিনথ্যারিস্কোপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তিন প্রকার :—

প্রথম।—অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে দেখিবার কাচ খণ্ডের (microscopic slide) ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ দেড় ইঞ্চি ক্ষমতা বিশিষ্ট অবজেক্ট গ্ল্যাস যুক্ত (object glass) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়।

দ্বিতীয়।—ইহাতে প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা একটি নল থাকে। সেই নলের এক প্রান্তে জিঙ্ক সালফাইড প্রলিপ্ত পর্দ্দা থাকে, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই একটি সূচ্যগ্র দণ্ডের উপর রেডিয়াম ব্রোমাইডের কণিকা সংযুক্ত থাকে। এই দণ্ড ইচ্ছানুরূপ পর্দ্দার যে কোন অংশে লইয়া যাইতে পারা যায়, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত পর্দ্দা অথবা পর্দ্দার কোন অংশ আলোকিত হয়। নলের অন্য প্রান্তে, পদার্থের আয়তন অধিকতর বর্দ্ধিত দেখাইবার উপযোগী কতকগুলি

লেন্স্ (lenses) একত্রিত করা থাকে। এই লেন্সগুলি অপর একটি নলে আঁটা ; এবং সেই নল প্রথমোক্ত নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করান থাকে। লেন্স সংযুক্ত এই নলটিকে প্রয়োজনানুরূপ বাহির করিয়া কিম্বা প্রথম নলে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষার্থীকে রেডিয়াম সংযুক্ত দণ্ড স্বীয় দর্শনোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

(ক) লেন্স ; (খ) লেন্স সংযুক্ত টিউব ; (গ) বাহিরের টিউব ; (ঘ) রেডিয়াম সংযুক্ত দণ্ড উঠাইবার ও নামাইবার স্ক্রু।

স্পিনথ্যারিস্কোপ।
(দ্বিতীয় প্রকার।)

তৃতীয়।—দ্বিতীয়েরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অল্প আয়াসে নির্ম্মিত। প্রভেদ এই যে, ইহাতে রেডিয়াম সংযুক্ত দণ্ড নলের গাত্রে একবারে প্রোথিত থাকে।

স্পিনথ্যারিস্কোপ রাত্রিতে দেখাই ভাল ; তবে দিবসে যে দেখা যায় না তাহা নহে। দিবসে দেখিতে হইলে, দর্শনেচ্ছুকে প্রথমে এক অন্ধকার গৃহে পাঁচ ছয় মিনিট কাল অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে চক্ষু রেডিয়ামের বিচ্ছুরিত কণিকা দেখিবার উপযোগী হইবে। পরে অন্ধকার গৃহেই স্পিনথ্যারিস্কোপ দেখিতে হইবে। অন্ধকার গৃহের প্রয়োজন এই যে, উপরোক্ত Zinc sulphide এর পর্দ্দাতে সূর্য্য আলোক লাগিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ সেই আলোক গ্রহণ করতঃ আলোকিত হইয়া পড়ে। প্রথমে সূর্য্যালোক লাগিয়া আলোকিত হইয়া পড়িলে, রেডিয়াম নিঃসৃত আলোক

পর্দ্দার উপরে পতিত হইলেও, পর্দ্দা পূর্ব্ব হইতেই আলোকিত থাকে বলিয়া, রেডিয়ামের আলোক গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই কিছু সময়ের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার স্থগিত রাখিতে হয়, এবং পরে পর্দ্দা হইতে আলোক অপসৃত হইলে, পুনরায় তাহা রেডিয়াম নিঃসৃত আলোক গ্রহণের উপযোগী হয়।

উল্লিখিত প্রথম যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হইলে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেরূপ ভাবে অন্য পদার্থ দেখিতে হয়, সেইরূপে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ঠিক করিয়া লইলেই রেডিয়ামের ক্রিয়া দেখা যায়। দ্বিতীয় যন্ত্রে দেখিতে হইলে লেন্স সংযুক্ত নলটি টানিয়া আনিয়া লেন্স হইতে রেডিয়াম দর্শনোপযোগী দূরে অবস্থিত হইলেই দেখা যাইবে। তৃতীয় যন্ত্রের উপরিস্থিত লেন্সটিকে স্ক্রু হইতে অল্প খুলিলেই দেখা যাইবে। যন্ত্রগুলিকে এইরূপ ভাবে ঠিক করিয়া লইয়া দেখিলে, কাল পর্দ্দার উপরে সমুজ্জ্বল আলোক কণিকা বিকীর্ণ হইতে দেখা যাইবে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার

সি. আই. ই., এম. ডি., ডি. এল।

হাওড়ার ৯ ক্রোশ পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী আর একটী ছয় মাসের শিশু পুত্র লইয়া কলিকাতার নেবুতলালেনস্থ তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের আলয়ে উপস্থিত হন। শৈশবের সুখস্মৃতি-বিজড়িত সেই স্থান ডাক্তার সরকার কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কলিকাতায় কিছুকাল অবস্থিতির পর পাইকপাড়া গ্রামেই সরকারের পিতাঠাকুর মাত্র দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গ গমন করেন। পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহেন্দ্রলাল সমাতৃক পুনরায় পাইকপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্পকাল পরেই, মাতা ঠাকুরাণী পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া চিরকালের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর, সরকারের জননী চারি বৎসর মাত্র জীবিতা ছিলেন। তিনিও দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সরকার তাঁহার মাতাপিতার প্রথম সন্তান। জননীর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার জন্ম হয়। হিন্দু গৃহস্থে এব্যাপার প্রায়ই অশ্রুত-পূর্ব্ব।

মাতুলালয়ের সন্নিহিত কোন পাঠশালায় জনৈক গুরু মহাশয়ের অধীনে মহেন্দ্র লালের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিয়ৎকাল পরেই ৺ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের অধীনে, তিনি ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই প্রথমশিক্ষক দে মহাশয়ের প্রতি তাঁহার স্নেহাশক্তি চিরসমান ছিল।

পারিবারিক অবস্থার অসচ্ছলতাহেতু, জেষ্ঠ মাতুল বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, গভর্ণমেণ্টের অধীনে ট্র্যাভলিং প্রিণ্টারের কার্য্য করিতেন এবং সৈনিক বিভাগের আদেশ অনুসারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল ঠাকুর দাস বাবুর অধীনে বিদ্যাভ্যাসের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল তৎকালে অবৈতনিক ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশের সার্দ্ধ এক বৎসর পরে, ১৮৪২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর, স্বাস্থ্যের অসুস্থতা নিবন্ধন, সরকার মহাশয় অনেককাল স্কুলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাজেই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ তাঁহার নাম কাটিয়া দেন। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালিক প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্রের করুণায়, তিনি পুনরায় স্কুলে প্রবেশ করিতে পাইয়াছিলেন। এই মহোদয়ের স্মৃতি তিনি আমরণ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত পূজা করিতেন।

তিনি হেয়ার স্কুলে ১৮৪৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে, তথা হইতে, "জুনিয়ার স্কলারশিপ" নামক বৃত্তিলাভ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেব এবং সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপক জোন্স সাহেবের তিনি অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন।

হিন্দু কলেজ সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয় "সিনিয়র স্কলারশিপ" লইয়া আরও দুই এক বৎসর উক্ত কলেজ অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, তাঁহার প্রবৃত্তি ও বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। মিলের লজিক এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়নই, তাঁহার এরূপ প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। ঐ সকল পুস্তক পাঠে, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়া বা ধর্ম্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তৎকালে মেডিক্যাল কলেজেই কেবল মাত্র মানুষের জ্ঞাতব্য ও অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত এবং শিক্ষার্থীরা কেবল উক্ত বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইত। কাজেই সরকারমহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। মিষ্টার সাটক্লিফ তাঁহাকে অন্ততঃ আরও এক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে রাখিবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইতেছে না দেখিয়া এবং এরূপ অবাধ্যতার জন্য, সাটক্লিফ সাহেব সরকারমহাশয়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার অনুরোধরক্ষা করিতে যাইলে, সময়ের অপব্যয় করা হইবে ভাবিয়া, সরকারমহাশয় সাটক্লিফ সাহেবকে শান্ত করিবার জন্য জোন্স সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য রীতিমত আদেশ পাইলেন।

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিবার পর, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে সরকারমহাশয় বিবাহ করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃত লাল জন্ম গ্রহণ করেন।

১৮৫৪ হইতে ১৮৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, তিনি এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তত্রত্য সমস্ত অধ্যাপকেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। চক্ষুচিকীৎসার অধ্যাপক ডাক্তার আর্চ্চার সাহেবের তিনি সমধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন। ডাক্তার

অর্চ্চারের স্নেহাকর্ষণ ইতিবৃত্ত বাস্তবিকই অলৌকিক। সরকার যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে কোন আত্মীয় শিশুর চক্ষুচিকীৎসার জন্য তিনি তাহাকে কলেজের আউটডোর ডিস্‌পেন্‌সারিতে লইয়া যান। পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ ডাক্তার অর্চ্চারের অধীনস্থ রোগিগণের পরিচর্য্যা করিত; এবং তিনিও জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে, চক্ষুর গঠন, প্রকৃতি, কার্য্যপ্রণালী, এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। যে দিন সরকার মহাশয় চিকীৎসার জন্য তাঁহার আত্মীয় পুত্রকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন ডাক্তার অর্চ্চাব উপরোক্ত ছাত্র-গণকে চক্ষুর গঠন সংক্রান্ত একটি জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করেন। উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সরকার মহাশয় তখন কিছু দূরে কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি প্রশ্ন শুনিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চঃস্বরে তাহার উত্তর দিলেন। উত্তর শুনিয়া ডাক্তার ছাত্রগণকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাত্রগণের সকলেই সরকারের পরিচিত ছিল। তাহাদের নিকট সরকারের পরিচয় অবগত হইয়া এবং একজন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তাঁহার সেরূপ প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইল দেখিয়া তিনি সরকারকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, ডাক্তার, সরকারকে চক্ষু সম্বন্ধীয় রাশি রাশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হওয়ায় সরকারকে তাঁহার অধীনস্থ রোগিগণের দেখা শুনা করিতে বলিলেন। এইরূপে ডাক্তার আর্চ্চারকে সরকার স্নেহ জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

আলোক চিত্র।

(Photography)

সহজে ফটোগ্রাফী শিক্ষা করা যাইতে পারে, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অত্যন্ত বিরল। অর্থের অপব্যয় না হয়, অথচ শিক্ষার্থী ফটোগ্রাফী অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই প্রবন্ধ লিখিত। যদি প্রবন্ধের কোন অংশ পাঠকের বোধগম্য না হয়, আমাকে লিখিলে, এই পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

ফটোগ্রাফীর ইতিহাস লিখিতে হইলে এ প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশিত হইবে না : ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ফটোগ্রাফীর প্রধান উপাদান ক্যামেরা (Camera)। উহার সাইজ (size) শিক্ষার্থীর অর্থসঙ্গতি ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; কেহ হাফ প্লেট (half plate) সাইজ, কেহবা কোয়ার্টার প্লেট (quarter plate) সাইজ পসন্দ করেন। শিক্ষার্থীর শেষোক্ত ক্যামেরাই ভাল ; কেননা উহা অনায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, প্লেট এবং কাগজের ব্যয় অল্প হয়, এবং এনলার্জ (enlarge) করিয়া ইচ্ছানুরূপ বৃহদায়তনের চিত্র ও করিতে পারা যায়। হাফপ্লেট ক্যামেরা হইতে বড় এবং কোয়ার্টার প্লেট ছবি, দুইই তুলা যাইতে পারে। আজকাল তিন প্রকারের ক্যামেরা হইয়াছে ; তন্মধ্যে হ্যাণ্ড (hand) ক্যামেরা একটি। এই ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ছবি তোলা যাইতে পারে ; এবং ইহার অধিকাংশই কোয়ার্টার প্লেট সাইজ। অন্য প্রকারের ক্যামেরাকে হ্যাণ্ডক্যামেরা এবং ষ্ট্যাণ্ড (stand) ক্যামেরা দুইই করা যাইতে পারে। ইহারও অধিকাংশ কোয়ার্টার প্লেট সাইজ। তৃতীয় প্রকার ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা। ইহা যে কোন সাইজের হইতে পারে।

প্রথমোক্ত হ্যাণ্ড ক্যামেরা যন্ত্রের উৎকৃষ্টতা অনুসারে অতি সামান্য হইতে বহু মূল্যের পাওয়া যায়। এই প্রকার ক্যামেরাতে প্রায়ই ১২ খানি প্লেট একসঙ্গে পূরিয়া লইতে হয়। এই ক্যামেরার কতকগুলির ফোকাস (focus) করিতে হয় না। যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার দিকে

ক্যামেরার মুখ ফিরাইয়া সাটার (shutter) টিপিলেই ছবি উঠে। কোন্ ছবি কতখানি উঠিবে, তাহা ভিউ ফাইণ্ডারে (view finder) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্যামেরাতে, ক্যামেরা হইতে ৬ কিম্বা ৯ ফিট দূরে যে সকল পদার্থ আছে তাহার ফোকাস হয় না; ৯ ফিট হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী সমস্ত পদার্থেরই ফোকাস করা থাকে। কাজেই এই সমস্ত ক্যামেরায় ৯ ফিটের অধিক দূরবর্ত্তী পদার্থের ছবি তুলিতে হয়। অন্য প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে ছবি ফোকসে করা যায় সে জন্য ক্যামেরার পার্শ্বে দাগ কাটা থাকে। স্ক্রু ঘুরাইয়া তিন ফিট পাঁচ ফিট প্রভৃতি ঘরের কাছে কাঁটা আনিলে তত ফিট দূরবর্ত্তী জিনিস ফোকাসে আসে।

দ্বিতীয় প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরা প্রায় ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার অনুরূপ। ক্যামেরার পশ্চাতে স্থাপিত গ্রাউণ্ড গ্লাসে (ground glass) ছবি প্রতিফলিত হয় ও স্ক্রু ঘুরাইয়া ক্যামেরার বেলো (bellow) বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া ছবির ফোকাস করিতে হয়। ইহার আর এক সুবিধা যে ক্যামেরার এক পার্শ্বে তিন ফিট, পাঁচ ফিট প্রভৃতি দাগ কাটা থাকে। তাড়াতাড়ি কাজ করিবার সময় বেলোসংলগ্ন কাঁটা এই দাগের নিকট আনিলে আর ফোকাস করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার অনেকগুলিতে প্লেটের পরিবর্ত্তে ফিলম্ (film) ও ব্যবহার করা যায়। দিবালোকেও ফিলম্ বাহির করা ও ঢুকান যাইতে পারে। তৃতীয় প্রকার, ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা; ইহার বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন।

ফটোগ্রাফীর দ্বিতীয় উপাদান ক্যামেরার ষ্ট্যাণ্ড (stand)। ষ্ট্যাণ্ডটি খুব শক্ত হওয়া প্রয়োজন, যেন সহজে না কাঁপে। অনেক ষ্ট্যাণ্ড প্রথম দৃষ্টিতে বেশ শক্ত অনুমান হয়; কিন্তু উপরে ক্যামেরা বসাইলে কাঁপিতে থাকে। এই সমস্ত কিনিবার সময় দেখিয়া লওয়া উচিত। ছোট ক্যামেরার জন্য ষ্ট্যাণ্ডকে চারিবার মুড়িয়া ও বড় ক্যামেরার দুইবার মুড়িয়া অল্প আয়তন করিবার বন্দোবস্ত থাকিলেই ভাল হয়। ষ্ট্যাণ্ড ওজনে হাল্কা হওয়া প্রয়োজন; যাহাতে সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায় এই প্রকার ষ্ট্যাণ্ডই ভাল। ষ্ট্যাণ্ড ফটোগ্রাফারের বুক কিম্বা গলা পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলে আরও ভাল হয়। এই প্রকার উঁচু ষ্ট্যাণ্ডের সুবিধা এই যে, ইহার উপর

ক্যামেরা বসাইলে গ্রাউণ্ড গ্লাসটি ঠিক চোখের সম্মুখে থাকে, হেলিয়া দেখিতে হয় না। ষ্ট্যাণ্ডের উপরিভাগ অর্থাৎ যেখানে ক্যামেরা বসাইয়া দিতে হয় সেই যায়গাটা যেন প্রশস্ত হয়; সরু হইলে ক্যামেরা বড় নড়ে। ক্যামেরা বসাইবার স্ক্রুটি ষ্ট্যাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ষ্ট্যাণ্ড ক্রয় করিবার সময় ষ্ট্যাণ্ডটি দাঁড় করাইয়া ক্যামেরা বসাইবার যায়গায় হাত দিয়া ঘা দিলে, যদি ষ্ট্যাণ্ড না নড়ে, তাহা হইলে ষ্ট্যাণ্ড প্রায় দৃঢ় হইয়া থাকে। বন্ধুর যায়গায় যাহাতে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য ষ্ট্যাণ্ডের পায়ের নিচের ভাগ টানিয়া বা ঢুকাইয়া প্রয়োজনানুরূপ ছোট বড় করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ডে বসাইয়া তৎপরে চিত্র উত্তোলনের জন্য তাহাকে নিম্ন লিখিত রূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম; হ্যাণ্ড ক্যামেরা—কোয়াটার প্লেট সাইজ। প্রথমে যে প্রকার ক্যামেরা সর্ব্বদা ফোকাসে থাকে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। ইহাতে দুইটি ভিউফাইণ্ডার থাকে। একটিতে লম্বা ভাবে অন্যটিতে পাশভাবে ছবি দেখায়। ক্যামেরার দুই পাশে দুইটি থাকে। ইহা ঠিক ছোট ক্যামেরার কাজ করে। কোন কোন ক্যামেরাতে গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপরে ছবি পড়ে, তাহা দেখিয়া প্লেট এক্‌সপোজ (expose) করিতে হয়। হ্যাণ্ড ক্যামেরার এই সকল প্রকারেই বারটি করিয়া শ্লাইড (slide) থাকে। তাহাতে ড্রাইপ্লেট পুরিয়া ক্যামেরার ভিতর বসাইয়া দিতে হয়। ইহার সবই অন্ধকার ঘরে (dark room) করিতে হয়। রাত্রিতে ঘরের ভিতর ইহা করিলেই চলে। প্লেট পুরিবার আগে ক্যামেরার উপর যে নম্বরগুলি আছে তাহা 0 নম্বরে আনিতে হইবে। কয়খানি প্লেট একস্‌পোজ্‌ড্‌ হইল তাহা জানিবার জন্য সকল ভাল হ্যাণ্ড ক্যামেরার উপরে একটি ছিদ্র দিয়া নম্বর বাহির করা থাকে। ইহাতে বার পর্য্যন্ত নম্বর আছে। এক্‌স্‌পোজ্‌ড্‌ প্লেট বাহির করিবার জন্য ভাল হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে আরও একটি দরজা থাকে। এই দরজা কোন ক্যামেরার নিম্নে থাকে; এবং কোনটার বা পিছন দিককার দরজাটি দুই ভাগ করা থাকে। উপরের ভাগদিয়া প্লেট পুরিতে হয় ও নিম্নের

ভাগ দিয়া একস্‌পোজ্‌ড্‌ প্লেট বাহির করিতে হয়। কোন ক্যামেরার দরজার সম্মুখে ইনষ্ট্যান্টেনিয়াস (Instantaneous) ও টাইম্‌ একস-পোজার (Time exposure) দেওয়ার কল আছে; এবং অন্যান্য কতক-গুলির সম্মুখের দরজা খুলিয়া তবে একস্‌পোজারের মাত্রার পরিবর্ত্তন বা ডায়াফ্রাম্‌ (diaphragm) ছোট বড় ইত্যাদি করা যায়। প্লেটে যত পরিমাণ ছবি তুলিতে হইবে, ক্যামেরা নড়াইয়া, ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া ঠিক ততটুকু পরিমাণ ছবি গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তাহার পর একসপোজার দিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরার সবই উপরোক্ত প্রকার কেবল তাহাতে অল্প দূরবর্ত্তী পদার্থেরও ফোকাস করা যায়। ফোকাস করিবার জন্য ক্যামেরার পাশে একটা স্ক্রু আছে। তাহা ঘুরাইলে ক্যামেরার গাত্র সংলগ্ন একটা ছিদ্র দিয়া ৩, ৬, ৭, ৯, ২০ ফিট প্রভৃতি লেখা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দূরস্থ সমস্ত জিনিষ ফোকাস্‌ করা হইয়া যায়। কোন কোন

ম্যাগ্যাজিন হ্যাণ্ড ক্যামেরা।

ক্যামেরাতে ৩, ৫, ৯ প্রভৃতি ফিট দূরবর্ত্তী জিনিষ ফোকাস করি-বার জন্য ছোট ছোট লেন্স থাকে, তাহা ক্যামেরার লেন্সের সম্মুখে

ধরিলে ৩, ৫, ৯ প্রভৃতি ফিট দূরবর্ত্তী জিনিষের ফোকাস হয়। এই সকল প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাকে ম্যাগাজিন ক্যামেরা বলে। এই সকল ক্যামেরাতে প্রায়ই শ্লাইড আটকাইয়া যায়; ক্যামেরা কিনিবার সময় এই সকল দেখিয়া লইতে হইবে। ম্যাগাজিন ক্যামেরার অধিকাংশই কোয়াটার সাইজ্।

অন্য প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে ডার্ক শ্লাইড (dark slide) আছে; প্রত্যেক ছবি তুলিবার সময় নূতন প্লেটপূর্ণ ডার্ক শ্লাইড ক্যামেরার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া ছবি তুলিতে হয়।

আরও এক প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরা আছে। ইহাতে ফিলম্ দিয়া কাজ করিতে হয়। একটা কাল কাগজ জড়ান রিলের মধ্যে ফিলম্ থাকে। এই প্রকার ক্যামেরাতে দিনের বেলাই ফিলম পোরা যায়, তজ্জন্য অনেকটা সুবিধা আছে। প্রত্যেক ফিলমে ছয় কিম্বা বারখানি ছবি তোলা যায়। বাহির হইতে স্ক্রু ঘুরাইলে একটি একটি করিয়া ফিলম্ নিজস্থানে আসে ও ব্যবহৃতগুলি রিলে জড়াইয়া যায়। ড্রাইপ্লে অপেক্ষা ফিলমের দাম বেশী। সর্ব্বপ্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাই ষ্ট্যাণ্ডে বসাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্থান বিশেষে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্লেট একস্‌পোজ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে হাতে রাখিয়া একস্‌পোজ করা অসম্ভব; কেননা ক্যামেরা নড়িয়া যায়। একথা জানা বিশেষ দরকার যে, হাতে কামেরা রাখিয়া ছবি তুলিতে হইলে কখন ⅕ সেকেণ্ডের বেশী এক্‌স্‌পোজ দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে ক্যামেরা নড়িয়া যাইবে। হাণ্ডক্যামেরাতে ⅕ সেকেণ্ডেরও বেশীক্ষণ এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়; কিন্তু তাহা কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা যত অভ্যাস হইবে ততই জানিতে পারা যাইবে। যাঁহারা বন্দুক ব্যবহারে অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে নিশানা ঠিক করিয়া নিশ্বাস লইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিলে হাত কাঁপেনা। ক্যামেরা বাম হাতে জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার পর বুক ভরিয়া নিশ্বাস লওয়ার পর দম বন্ধ করিয়া সাটার টিপিয়া বেশীক্ষণ একস্‌পোজার দেওয়া যায়। শতচেষ্টা করিলেও হ্যাণ্ড ক্যামেরায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এক্‌স্‌পোজার দেওয়া অসম্ভব। ম্যাগ্যাজিন ক্যামেরাতে এক্‌স্‌পোজার দিবার জন্য স্প্রিং অথবা

বলটিউব (ball & tube) সংযুক্ত শাটার থাকে।* ফিলম্ ক্যামেরাতে সচরাচর বল ও টিউব সংযুক্ত হয়। বল ও টিউব থাকিলে এক্স্পোজার দিবার সময় ক্যামেরা নড়িবার ভয় থাকে না।

ক্যামেরা ব্যবহার কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা বিক্রেতার নিকট জানিয়া লওয়া প্রয়োজন, বই দেখিয়া শিক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব।
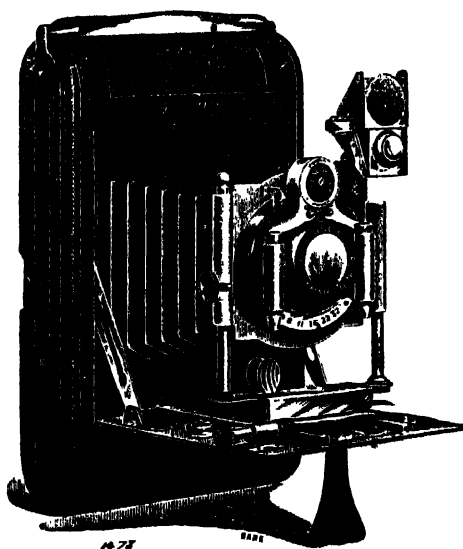
হ্যাণ্ড ক্যামেরা।

ইহা ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার মত ব্যবহার করা যায় ফিল্ম ও প্লেট দুইই ব্যবহার হয়।

ইংরাজি নামের বাংলা ব্যাখ্যা।

সাইজঃ—নানা প্রকার মাপের ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা পাওয়া যায়। যথা ৪¼ × ৩¼ ইঃ, ৬½ × ৪¾ ইঃ, ৮½ × ৬½ ইঃ; এবং নাম করণের সুবিধার জন্য উক্ত নামগুলি যথাক্রমে কোয়াটার প্লেট, হাফ প্লেট, ফুল প্লেট বলে, ইহার বড় সাইজগুলির মাপ হিসাবে নাম আছে যেমন ১০ × ৮ইঃ ১০ × ১২ ইঃ প্রভৃতি।

ফোকাস—স্ক্রু ঘুরাইয়া বেলো দীর্ঘ কিম্বা সঙ্কুচিত করিয়া অর্থাৎ ক্যামেরা সংযুক্ত লেন্স গ্রাউণ্ড গ্লাস হইতে দূরে কিম্বা নিকটে আনিয়া

গ্রাউণ্ড গ্লাসে যখন ছবিখানি স্পষ্ট দেখা যাইবে তখন ছবির ফোকাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাটার—ইহা একটি যন্ত্র ; ইহা টিপিলেই ছবি এক্‌স্‌পোজ্‌ড্‌ হয়। ইহার মধ্যে ইন্‌সষ্টান্টেনিয়াস্‌ বা টাইম এক্‌স্‌পোজার দিবার বন্দোবস্ত আছে।

গ্রাউণ্ডগ্লাস—ক্যামেরার পশ্চার্দ্দিকে ঘসা কাচ আছে ; ইহার উপরে ছবি প্রতিফলিত হয়।

ভিউফাইণ্ডার—ইহা ছোট ক্যামেরার মত কাজ করে ; সমস্ত হ্যাণ্ড ক্যামেরাতেই ইহা লাগান থাকে। ইহার দ্বারা কতখানি ছবি, প্লেটে উঠিবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ক্যামেরার গ্রাউণ্ডগ্লাস নাই ; বা যাহাতে আন্দাজি ফোকাস্‌ করিয়া ছবি তুলিতে হয়, তাহাতে ইহা লাগান থাকে সেজন্য তাড়াতাড়ি কাজের অত্যন্ত সুবিধা হয়। ইহা দুই প্রকার হয়, একরকম ক্যামেরার উপর হইতে দেখিলে ছবি দেখা যায়, অন্যপ্রকার সোজা দেখিতে হয়।

এক্‌স্‌পোজার—শাটার টিপিলে লেন্সের মুখ খুলিয়া যায়, ছবি প্রতিফলিত হইয়া প্লেটে পড়ে এবং প্লেটের উপরে আলোক রশ্মির ক্রিয়া হয়। সাটার কিম্বা ক্যাপ খুলিয়া বন্ধ করাকে ও ড্রাই প্লেটের উপর আলোক রশ্মির ক্রিয়াকরণকে এক্‌স্‌পোজ করা বলে।

ড্রাই প্লেট—জিলাটিন নামক এক প্রকার পদার্থ গরম জলে গলাইয়া সমানভাবে কাচের এক পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিয়া, তাহার উপর সিলভার আইওডাইড, সিলভার ব্রোমাইড প্রভৃতি রৌপ্যের যৌগিক পদার্থ প্রলিপ্ত করা থাকে ; এবং তাহাতে আলো লাগিলে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহা চোখে দেখা যায় না কিন্তু ডেভলপ (develop) করিলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ড্রাইপ্লেট দেখিতে হরিদ্রা বর্ণের।

ফিল্‌ম্‌—কাচের পরিবর্ত্তে সেলুলয়েড নামক পদার্থের উপর জিলাটিন লাগাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া করা থাকে। ইহাতে ড্রাইপ্লেটের মতই কাজ হয় এবং ইহাতে ছবি উঠে। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা পড়িয়া গেলে ভাঙ্গিয়া ছবি নষ্ট হয় না এবং ইহা খুব হাল্কা।

ষ্ট্যাণ্ড—ক্যামেরা বসাইবার কাষ্ঠ বা ধাতু নির্ম্মিত উচ্চ ত্রিপদ।
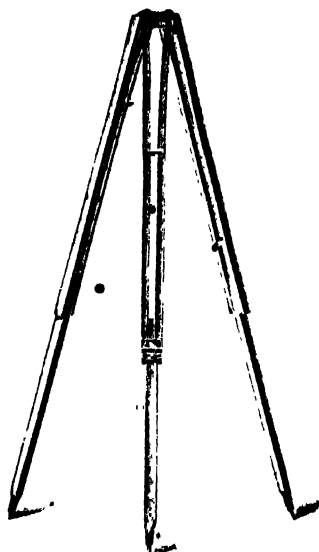
ষ্ট্যাণ্ড।

ইন্‌স্‌ষ্ট্যাণ্টেনিয়াস এক্‌স্‌পোজার—খুব কম সময় এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যথা ১/২, ১/৪, ১/১০, ১/২৫, ১/৫০, ১/১০০ সেকেণ্ড ইত্যাদি।

টাইম এক্‌স্‌পোজার—যথা ১ মিনিট, ৫ মিনিট বা তদূর্দ্ধ সময়ের এক্‌সপোজারকে টাইম্‌ এক্‌স্‌পোজার কহে।

শ্লাইড—ম্যাগাজিন হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে টিনের খাপ থাকে তাহার মধ্যে ড্রাইপ্লেট পূরিয়া দিতে হয়।

ডার্কশ্লাইড—কাষ্ঠের কিম্বা অন্য ধাতব বাক্সের মত। ইহার মধ্যে ড্রাইপ্লেট রাখিতে হয়। ইহা বন্ধ করিয়া দিলে, ইহার মধ্যে কিছুতেই আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এক্‌স্‌পোজার দিবার আগে ক্যামেরাতে লাগাইয়া ইহার একধার টানিয়া বাহির করিবার পর এক্‌স্‌পোজ করিলে ড্রাইপ্লেটে আলোক রশ্মি লাগে। তাহার পর বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তখন প্লেট-শুদ্ধ বাহির করিয়া লওয়া যায়। এই প্রকার ডার্ক শ্লাইড সর্ব্বপ্রকার ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরাতে প্রয়োজন হয়; এবং কোন কোন প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতেও থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

ম্যালেরিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয়তঃ—আমাদিগকে এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যে এই সকল সর্ব্বনেশে মশা আর না থাকে। ইঁহারা লোকের ঘর বাড়ী হইতে ৩০০ বা ৮০০ হাতের মধ্যে ছোট ছোট জলস্রোতে এবং পুকুরের ধারে জলের কাছে ঘাসের মধ্যে ডিম পাড়ে। বড় বড় জলাশয়ের জল নিকাশের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট পুকুর ও ডোবা ভরাট করা এবং সমস্ত বদ্ধজল সরাইয়া ফেলা ভাল। আমরা যদি সর্ব্বদা এত না করিতে পারি, তাহা হইলে গ্রামের নিকটের ছোট ছোট পুকুর, ডোবা ভরাট করিয়া ফেলিলেই এবং পুকুরের জলের ধারের ঘাস কাটিয়া ফেলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এই মশা কেরোসিন তেলে মরিয়া যায়। অতএব যদি খানিকটা তুলা কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া এবং দড়ির একদিকে বাঁধিয়া পুকুরের জলের উপর দিয়া, এমন করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, যে জলের উপরে পাতলা এক পোঁচ তেল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে মশার অধিকাংশ ডিম প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। দশ দিন অন্তর একবার করিয়া ঐরূপ করিতে হইবে। মশা রাত্রি ভিন্ন প্রায় অন্য কোন সময়ে কামড়ায় না, এবং খাদ্যের জন্য যতদূর না গেলে নয়, তাহার বেশী দূরে যায় না। ঠাণ্ডা যায়গায় ইহারা সমস্ত শীতকাল ঘুমায়। ঘরের দেওয়াল ও সমস্ত এঁদো কোণ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। এখন যে প্রকার উপায়ের কথা বলিয়া দেওয়া হইল, এই প্রকার সামান্য সামান্য উপায় অবলম্বন করায়, অনেক জ্বরাক্রান্ত গ্রাম পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। (উদ্ধৃত। Calcutta Gazette, January 13,1909.)

বিবিধ।

সূর্য্যমুখী।—রুষিয়ার অন্তর্গত ককেসাস প্রদেশে সূর্য্যমুখী ফুল দ্বারা বাগান সাজান হয় এবং তাহার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া সাবান এবং রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শাখা ও পাতা পুড়াইয়া পটাশ বাহির করা হয়। গত বৎসর এই সকল কারখানায় ১৫ হাজার টন পটাশ

বাহির হইয়াছিল। আমাদের দেশে তৈল হইতে না হইলেও, পটাশে বিশেষ লাভ হইতে পারে।

রেডিয়ামের শক্তি।—মোসিয়র এফ বোর্দ্দা কোরাণ্ডম, রুবি, টোপাজ, স্যাফাসার প্রভৃতি প্রস্তর এবং এলুমিনিয়ম জাতীয় পদার্থের উপর রেডিয়মের এক অদ্ভুত শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার কিরণে শুভ্র কোরাণ্ডাম টোপাজের বর্ণ ধারণ করে। স্বাভাবিক টোপাজ অধিকতর সুন্দর হয়, এবং ফিকা রংঙের চুণির বর্ণ আরও গাঢ়তর হয়। বর্ণহীন, পোড়ান (fused) এলুমিনা রেডিয়াম ব্রোমাইডের শক্তির (action) মধ্যে আনিলে, প্রথমে গোলাপী এবং তৎপরে লাল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। আবিষ্কারক এই সকল আশ্চর্য্য শক্তির কারণ বলেন নাই, তিনি বলেন এই সকল পরিবর্ত্তন অক্সিজেনের ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয় না, কারণ অত্যন্ত অল্প উত্তাপেই একই রকম ফল পাওয়া যায়।

আতস বাজী।—আতস বাজী দ্বারা নানাপ্রকার কথা বলান যায়। এই বিষয় ফরাসী বিজ্ঞানসভায় বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। উদ্ভাবক গত তিন বৎসর এই সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে নানাপ্রকার বিস্ফোরক দ্বারা কথা বলান যায়। রেলগাড়ীতে ব্যবহার করিবার জন্য এক প্রকার টোটা আবিষ্কার করিয়াছেন; এই টোটা মহাশব্দে "থাম" বলিয়া আওয়াজ করে। তিনি ফরাসীদিগের জাতীয় উৎসবে ব্যবহার করিবার জন্য আর এক প্রকার টোটা আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা হইতে "সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘজীবি হউক" এই কথা সশব্দে বহির্গত হয়।

মদ্যের নাইট্রোজেন।—মদ্য প্রস্তুত করিতে অনেক পরিমাণে মিশ্রিত নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া যায়; ইহাকে এমোনিয়া রূপে কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহাও বিফল হইয়াছে।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার

সি. আই. ই., এম ডি., ডি. এল।

Lakshmibilas Press.
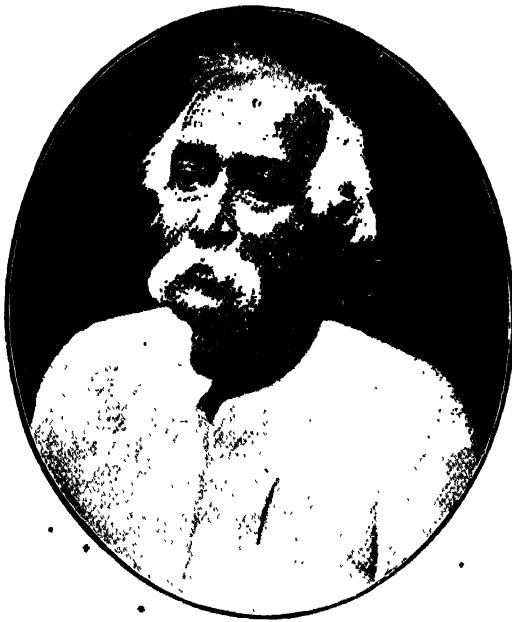
বিজ্ঞান দর্পণ।

১ম বর্ষ।] চৈত্র ১৩১৫, মার্চ্চ ১৯০৯। [৩য় সংখ্যা।

গণনা যন্ত্র।

Der Parktische নামক একজন যন্ত্র নির্ম্মাতা অতি সহজ উপায়ে গুণ করিবার নিমিত্ত একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই যন্ত্রের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ইহার মূল্য এইরূপ অন্য যন্ত্র অপেক্ষা অনেক অল্প ; এবং ইহার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংখ্যাদ্বয়ের গুণ ফল বাহির করা যায়। উপরোক্ত চিত্র হইতে যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে পাঁচটি সরু সরু ফলক রহিয়াছে, সেই ফলক কয়টি যন্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্ত। সেই পাঁচটী ফলকে ১ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই রূপ দুইটি সংযুক্ত ফলকের মধ্যে আবার ৯টি অন্য ফলক রহিয়াছে। ইহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ বাহির করিয়া আনা যাইতে পারে। এই মধ্যস্থিত ৯টি ফলকের এক প্রান্তে ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখিত রহিয়াছে। এই ফলক ৯টিতে উপরোক্ত সংখ্যা ভিন্ন অন্য সংখ্যাও রহিয়াছে, কিন্তু এই সংখ্যা গুলি এরূপ ভাবে লিখিত, যে এই ফলকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিলেই (২য় চিত্র) যন্ত্রে সংযুক্ত ফলকোপরিস্থিত রাশির সহিত, মধ্যবর্ত্তী ফলকের প্রান্তস্থিত রাশির গুণ ফল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়ে। যথা ৪ × ৪৪ = ১৭৬।
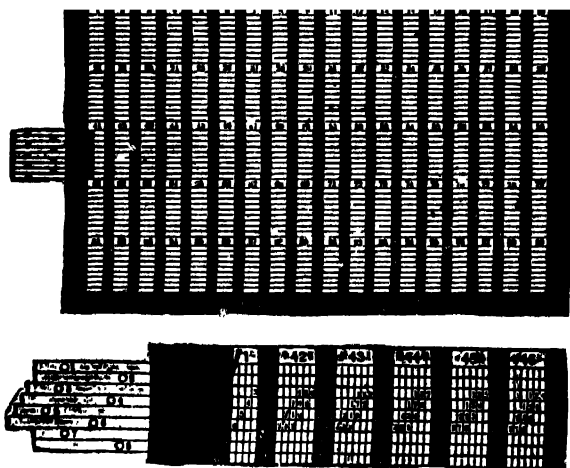
২য় চিত্রে ৬৫৪৩ এর সহিত সংযুক্ত ফলেকের যে কোন রাশির গুণ ফল বাহির করা যাইতে পারে। কেন না দেখা যাইতেছে ৬,৫,৪,৩ কে ৪৪ এর সহিত গুণ করিলে যে গুণ ফল হইবে তাহা ৪৪ ঘরে রহিয়াছে; যথা, ১৩২, ১৭৬, ২২০, ২৬৪। এইরূপে ঠিক করিয়া লইয়া ঐ গুণ ফল গুলি যোগ করিয়া লইলেই ৬৫৪৩ এর সহিত ৪৪ এর গুণ ফল বাহির হইয়া পড়িবে। কেবল মাত্র যে এইরূপ দুইটি সংখ্যা বিশিষ্ট রাশিরই গুণ ফল বাহির হয় তাহা নহে, দুই অপেক্ষা বহু সংখ্যাবিশিষ্ট রাশিরও গুণফল বাহির করা যাইতে পারে। ৬৫৪৩ কে ৪৫৪৬ দিয়া গুণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ৪৫৪৬ কে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ৪৫ ও ৪৬ করিয়া লইতে হয়। পরে:—

৬৫৪৩ × ৪৬ = ৩০০৯৭৮

৬৫৪৩ × ৪৫ = ২৯৪৪৩৫

২৯৭৪৪৪৭৮

৬৫৪৩কে ৪৬৪৫ দিয়া গুণ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় এই যন্ত্র সাহায্যে তদপেক্ষা অনেক অল্প সময় লাগে; কেবল মাত্র যোগে অভ্যস্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

আনারস।

ভারতবর্ষে সুমিষ্ট এবং খাদ্যোপযোগী আনারসের অত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও, এবং আনারস আবাদের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষেত্র সত্ত্বেও দেখা যায়, এদেশে আদৌ প্রয়োজনানুসারে আনারস উৎপন্ন হইতেছে না। এদেশে আনারস উৎপন্ন হয় সত্য, ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষকেরা আনারসের আবাদও করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কি উপায়ে আবাদ করিলে, আনারস পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরতর বা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, সে বিষয়ে কৃষকেরা একবারও চেষ্টা করে না। ইহার ফলে বাজারে যে সমস্ত ফল বিক্রীত হয়, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে অন্যদেশে তাহা গোমহিষাদির খাদ্য ব্যতীত আর অন্য কোন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তথায় কৃষকেরা যেরূপ উৎকৃষ্ট, বৃহদায়তন, সুমিষ্ট এবং প্রচুর রসযুক্ত আনারস উৎপাদন করে, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের আনারস কিছুই নহে। ভারতবর্ষে আনারস যে নূতন তাহা নহে, বস্তুতঃ এদেশে বহু শতাব্দি ধরিয়া আনারসের চাষ চলিয়া আসিতেছে। কেবল মাত্র মালাবার, উত্তর বঙ্গ এবং আসামে আজকাল তবুও যেন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর আনারস উৎপাদিত হইতেছে। বাজারে প্রয়োজনানুরূপ আনারস এই কয়েকটি মাত্র দেশ হইতে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই ষ্ট্রেটসেট্‌লমেণ্ট, মরিসাস, বা লঙ্কাদ্বীপ হইতে যে সমস্ত আনারস আমদানি হয়, তাহা কাঁচা কিম্বা অত্যন্ত পক্ক হইলেও, বাজারে তৎক্ষণাৎ দুই আনা হইতে চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশে অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর না হইলেও, মিষ্টতায় সমান আনারস, সামান্য চেষ্টা করিলে বাশি বাশি উৎপন্ন হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, উত্তর বঙ্গে একটা অল্প আয়তন বাগানে, অতি সুমিষ্ট এবং বড় আনারস উৎপাদিত হইতেছে, সেই সমস্ত আনারস বাজারে অনায়াসে আট আনা মূল্যে বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও হয়ত এইরূপ সামান্য সামান্য ভূখণ্ডে উৎকৃষ্ট আনারসের আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের অভাব পরিপূরিত হয় না। সার জর্জ্জ ওয়াট তাঁহার "কমারসিয়াল প্রডাক্টস অফ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে

লিখিয়াছেন, যে—"এদেশের কৃষকেরা ভাল অথবা ব্যবসায় উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে আনারস উৎপাদন করিতে আদৌ চেষ্টা করে না। ইহার ব্যবসা আরম্ভ করিলে, নিঃসন্দেহ লাভজনক হইবে।"

অন্যান্য দেশে আনারসের রীতিমত ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ইউ-নাইটেডষ্টেট্‌শ অন্তর্গত ফ্লরিডা উপদ্বীপে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে আনারস সম্বন্ধে একবারে অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আজ যদি কেহ পূর্ব্বসাগর তীরের কোন উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কত ক্রোশ ক্ষেত্র কেবল মাত্র নিবীড় আনারস গুল্মে পূর্ণ। তথায় বাৎসরিক ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ ঝুড়িরও বেশী ফল উৎপন্ন হয়; প্রত্যেক ঝুড়িতে প্রায় আটচল্লিশটি করিয়া আনারস থাকে। সিঙ্গাপুরে আনারসের মোরব্বার এক বিস্তৃত কারখানা রহিয়াছে। ১৯০৬ সালে ৭,০৭,৪৯৮ সাত লক্ষ, সাত হাজার, চারিশত অষ্টনব্বই এবং ১৯০৭ সালে ৮,৪৫,৯৭৬, আটলক্ষ, পঁয়তাল্লিশ হাজার, নয় শত ছিয়াত্তর বাক্স আনারসের মোরব্বা সিঙ্গাপুর হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশের লোকই আনারসের মোরব্বার সমধিক্ আদর করে এবং প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। ইউরোপের প্রয়োজনীয় সমস্ত মোরব্বা কেবল মাত্র সিঙ্গাপুর হইতে রপ্তানি হয় এবং পাকা আনারসের অধিকাংশই ফ্লরিডা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে অল্পদিন হইল, এক আনারসের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। সেখানকার অধ্যক্ষ অতিশয় কর্ম্মপটু এবং সুদক্ষ। তাঁহার তত্ত্বাবধান ও কার্য্যপ্রণালী দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে ফ্লরিডা ও ষ্ট্রেটসেট্‌লমেণ্টএর ব্যবসাদারগণ কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। এই নূতন কারখানা হইতে ১৯০৭ সালে ১,৯০,০০০ এক লক্ষ, নব্বই হাজার বাক্স আনারসের মোরব্বা রপ্তানি হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বাক্সে ২৪ টিন মোরব্বা ছিল। ১৯১০ সালে সম্ভবতঃ ২৪০,০০,০০০ দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টিন মোরব্বা প্রেরিত হইবে। এরূপে অনুমিত হইতেছে যে যখন কারখানা সম্পূর্ণরূপে চলিবে ও যখন অপর্য্যাপ্ত ফল সংগৃহীত হইবে, তখন প্রতিদিন কারখানায় পাঁচ হইতে ছয় হাজার টিন মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার জল বায়ুই পরিলক্ষিত হয়। কোথায়ও বা মরুভূমির ন্যায় উত্তাপ, আবার কোথায়ও বা মেরুর ন্যায় শীত। সেই জন্যই মনে হয়, হনলুলু, ফ্লরিডা বা ষ্ট্রেটসেট্লমেণ্ট ইত্যাদি স্থানে যে ব্যবসা চলিতেছে, কোন মাহাজন ইচ্ছা করিলে আমাদের দেশেও এই কারবার চালাইতে পারেন। কৃষকেরা যদি যথেষ্ট অর্থ পায় এবং যদি তাহারা সময় মত আবাদের উপদেশ পায়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে অন্য অন্য দেশের কৃষকের ন্যায় ব্যবসার উপযোগী রাশি রাশি অনারস উৎপাদন করিতে পারে।

আনারসের চাষ তত জটিল নহে। যে জমীতে সাধারণ গাছ পালা উৎপন্ন হয়, এবং যদি সেই জমী হইতে বর্ষার সময় জল নিকাশের বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে সেই জমীতে যথেষ্ট আনারস উৎপন্ন হইতে পারে। যে জমীর উপরিস্তরের মাটী সহজে চূর্ণ হইয়া যায় এবং নিম্ন স্তরে বালুকা থাকে, সেই জমীতে আনারস প্রচুর উৎপন্ন হয়। কেন না এই সমস্ত জমীর জল কৈশিক আকর্ষণের জন্য অতি সহজে নিম্নগ হয়। ফ্লরিডা দেশে কৃষকেরা দেড়ফুট্ অন্তর এক একটি গাছ রোপণ করে। কিন্তু বাহামা দ্বীপে এক একর জমীতে ২০,০০০ কুড়ি হাজার আনারস গাছ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গাছে একটি আনারস ফলে। প্রত্যেক আনারস আট আনা, চারি আনা, দুই আনা, কিম্বা কেবল মাত্র এক আনাতে বিক্রীত হইলেও, এক একর জমীর ফসল হইতে যথেষ্ট লাভ থাকে। শুধু আনারস হইতে নহে, আনারসের তন্তু হইতেও লাভ হয়। লণ্ডনের বাজারে এই সমস্ত সূতার প্রতি টনের মূল্য ৪৫০ চারি শত পঞ্চাশ টাকা। সার জর্জ্জ ওয়াট উপরিউক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ঐ সমস্ত সূতা উত্তর বঙ্গে এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। হনলুলু দ্বীপে আনারসের ছাল হইতে, ইক্ষুরস বাহির করিবার যন্ত্র সাহায্যে, যথেষ্ট পরিমাণ রস বাহির করা হয়। সেই রসহীন ছাল জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রস হইতে পাইন আপেল ব্র্যাণ্ডি, ভিনিগার, সিরাপ ইত্যাদি নানারূপ পানীয়ও প্রস্তুত হয়। অধুনা ঐ রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

আমাদের দেশে আনারস চাসের উপযোগী জমীর অভাব নাই। কোন লোক কিছু টাকা লইয়া চেষ্টা করিলে, অনায়াসে কারবার চলিতে পারে। বিদেশ হইতে আনারস উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইবে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা বিদেশে পাঠাইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বিদেশ হইতে এদেশে যে সমস্ত আনারস প্রেরিত হয়, তাহাই বন্ধ করিবার জন্য দেশের মাহাজনগণকে অনুরোধ করিতেছি।

এলুমিনিয়ম ধাতু এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাধারণ ধর্ম্ম :—

এই ধাতু দেখিতে টিনের ন্যায় শুভ্র ; এবং ইহাকে ঘসিয়া খুব চাক-চিক্যশালী করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক চিক্কন না করিয়া ইহা ব্যবহার করাই প্রশস্ত। এই ধাতুকে হাতুড়িতে পিটিয়া পাতলা কাগজের ন্যায় করা যায় এবং টানিয়া অতি সূক্ষ্ম তারে পরিণত করা যাইতে পারে। এই সকল অবস্থায় পরিণত করিতে হইলে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১৫০ ডিগ্রি তাপের প্রয়োজন হয়। এই ধাতুর উপর সজোরে আঘাত করিলে ইহা হইতে এক রকম কর্কশ স্বর নির্গত হয়। ৭০০ ডিগ্রি উত্তাপে ইহা একেবারে দ্রব হইয়া যায়। ইহাকে গালাই করিবার সময় সোহাগা ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এই দ্রব্যের সংস্পর্শে এলুমিনিয়ম খারাপ হইয়া যায়। বিশুদ্ধ-ধাতুতে লৌহের ন্যায় মরিচা পড়ে না, কিন্তু অবিশুদ্ধ হইলে ইহাতে এক রকম শুভ্র বর্ণের কলঙ্ক জন্মায়।

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (Hydrochloric Acid) দ্বারা ইহা শীঘ্রই দ্রবীভুত হয়, কিন্তু অন্যান্য এসিডের (Acid) দ্বারা হয় না। অর্গানিক এসিড (Organic Acid) ইহাকে অতি অল্প পরিমাণে দ্রব করিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল এসিডের (acid) সহিত যদ্যপি লবণ মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে এই ধাতু অতি শীঘ্র দ্রবীভুত হয়। এ

জন্য এই ধাতুর দ্বারা রন্ধন পাত্র প্রস্তুত করা উচিত নয়। এই ধাতু অত্যন্ত লঘু, এজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। ইহার দ্বারা লঘু চসমার ফ্রেম (frame) প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

Alloys of Aluminium.

তাম্র সংযোগে এলুমিনিয়ম হইতে এক প্রকার ধাতু প্রস্তুত করা যায়; উহার বর্ণ অবিকল স্বর্ণের ন্যায়। সচরাচর এলুমিনিয়ম ব্রোন্‌জ্ (aluminium bronze) বলিয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা দশভাগ এলুমিনিয়ম বর্ত্তমান থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক স্বর্ণের ন্যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে বিশুদ্ধ তাম্রের প্রয়োজন, কারণ অন্য ধাতুর মিশ্রণে ইহার গুণের তারতম্য হইয়া পড়ে। এই এলুমিনিয়ম ব্রোনজ প্রথমে অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ অবস্থায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু বারম্বার অগ্নি উত্তাপে গলাইলে, তখন উহা হইতে নানা সামগ্রী প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া এলুমিনিয়ম অপেক্ষা আর এক প্রকার কঠিনতর ধাতু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে শতকরা চারি ভাগ রৌপ্য মিশ্রিত করিতে হয়। অনেক সময়ে এই ধাতু হইতে রাসায়নিক তুলাদণ্ড (chemical Balance) প্রস্তুত করা হয়।

সম্পাদক।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের অনুরোধে ও তথাকার অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণের অনুমতি লইয়া, সরকার মহাশয় উক্ত কলেজে আলোক সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতায় ছাত্রগণকে চক্ষুর গঠন এবং কার্য্যপ্রণালী যে আলোক সম্বন্ধীয় কোন একটি

যন্ত্র বিশেষের ন্যায় তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। সেই বৎসরেই সরকার মহাশয় তৎকালিক প্রসিদ্ধ বেথুন সোসাইটির কোন এক দিনের সভায়, দূরস্থিত পদার্থ সমূহ অবলোকন কালীন চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ কিরূপে আপনা আপনিই উপযোগী হইয়া পড়ে, তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

সরকার মহাশয় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যয়ন অতিশয় গৌরবের সহিত শেষ করিয়াছিলেন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা, ভেষজ-বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা এবং ধাত্রীবিদ্যায় অনেক পদক, পারিতোষিক এবং বৃত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে কোন নূতন তথ্যের সংগ্রহে এবং তাহার সংবাদ সম্বন্ধে অনেক অধ্যাপকেরও অগ্রণী ছিলেন।

তিনি মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের কোন প্রশ্নের উত্তরে আরসিনিকের মারাত্মক মাত্রার পরিমাণ, গ্রন্থে উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর, এবং অনেক লোক এক ড্রামেরও অধিক আরসেনিক খাওয়ার অভ্যাস করিয়াও বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন না, এরূপ লেখায় পরীক্ষায় সুবর্ণ পদক প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কেননা তৎকালিক উক্ত বিদ্যার অধ্যাপক মনে করিয়াছিলেন, যে জুরিসপ্রুডেন্সে আরসিনিকের সম্বন্ধে এরূপ উত্তর অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। এই ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালিক নূতন মাসিকপত্রিকা সকল অধ্যাপক পাঠ করেন নাই; কিন্তু এই সকল পত্রিকা পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তবে সরকার মহাশয় ওরূপ উত্তর করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ফেরার সাহেব আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করায় সরকার মহাশয় ১৮৬৩ খৃঃ অঃ এম, ডি, পরীক্ষা প্রদান করেন; এবং তিনি প্রথম স্থান ও অন্য পরীক্ষার্থী স্বর্গীয় ডাক্তার জগবন্ধু বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে ৺চন্দ্র কুমার দে প্রথম ও সরকার মহাশয় দ্বিতীয় এম, ডি,।

এই বৎসর স্বর্গীয় ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় "বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ দি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়। এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা কালীন সভায় ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিয়া একটি

বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমে সেক্রেটারী এবং তিন বৎসর পরে এই এসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

হোমিওপ্যাথির এইরূপ নিন্দাবাদ শুনিয়া স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যদি ডাক্তার সরকারকে হোমিওপ্যাথিমতে একবার কোন প্রকারে দীক্ষিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সরকার নিশ্চয়ই হোমিওপ্যাথির প্রসার বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু ডাক্তার সরকারের নিকট তাঁহার সমস্ত যুক্তি তর্ক বিফল হইল। ডাক্তার সরকার, হোমিও-প্যাথি চিকীৎসায় যে সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়াছে, তাহা ঔষধের পরিবর্ত্তে, যে কঠিন রীতি নীতির অনুশাসনে রোগী পরিচালিত হইয়াছিল, তাহারই গুণে রোগী রোগ বিমুক্ত হইয়াছে মনে করিলেন। কোন একদিন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে Morgan's Philosophy of Homoepathy for the Indian field নামক গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রদান করাতে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন কেননা তিনি মনে করিলেন, এই বারে হোমিওপ্যাথিমতে রোগ নিবারণ যে একবারে অসম্ভব তাহা বিশেষ রূপে সপ্রমাণ করিবার অবসর পাইবেন। তিনি পুস্তক খানি একবার পড়িয়াই বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে এই গ্রন্থ সমালোচনা করিতে হইলে ইহার প্রথাগুলি চিকীৎসার্থে বাস্তবিক নিয়োজিত করা বিশেষ আবশ্যক; কেননা উক্ত পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা হোমিওপ্যাথির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার প্রথা গুলিকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া, তবে হোমিওপ্যাথি-মতে কোন সত্য আছে কি না দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কাজেই তিনি রাজেন্দ্র বাবুর অধীনস্থ রোগিগণের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে হোমিওপ্যাথি প্রথায় সত্য নিহিত রহিয়াছে, এই প্রথানুযায়ী চিকীৎ-সকগণকে চিকীৎসক সমাজ হইতে বিদুরিত করা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। হোমিওপ্যাথি প্রথার কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তিনি "Supposed Uncertainty in Medical Science &c." নামক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কোন সাধারণ সভায় অগণ্য সহযোগী চিকীৎসকগণের সম্মুখে এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার

বিশ্বাস অধিকতর একথা অম্লানবদনে স্বীকার করিলেন। সমস্ত ডাক্তারগণ উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন; ডাক্তার সরকারকে নানরূপে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

অবশেষে ডাক্তার সরকারকে তাঁহারা জলপড়া চিকীৎসকের দলভুক্ত করিয়া চিকীৎসক সমাজ হইতে বিদূরিত করিলেন। ডাক্তার সরকার এক ঘরে হইলেন। ডাক্তার ফেরার মহেন্দ্র লালকে বলিলেন—"একবার ভাবিয়া দেখ, এরূপ ভাবে নূতন পথ অবলম্বন করিলে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় রোধ হইবার সম্ভাবনা, একবার উদরের ভাবনা ভাবিও।" ডাক্তার সরকার অচঞ্চল স্বরে, হৃদয়ের অমানুষিক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"লাভ ও ক্ষতির কথা ভাবিতে পারিতেছিনা, যাহা সত্য জানিয়াছি তাহা না করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে।"

১৮৬৮ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে প্রথমে ডাক্তার সরকারের সম্পাদকত্বে "Calcutta Journal of Medicine" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

এই পত্রিকায় ১৮৬৯ খৃঃ অঃ আগষ্ট মাসে "On the Desirablity of a National Institution for the Cultivation of Physical Sciences by the Natives of India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এবং এই প্রবন্ধেই বর্ত্তমান "Indian Association for the Cultivation of Science" সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়।"

ডাক্তার সরকার ১১৭০ খৃঃ অঃ ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts এর এবং আট বৎসর পরে ১৮৭৮ খৃঃ অঃ Faculty of Medicine এর সদস্য নিযুক্ত হন। এই Facultyর অন্যান্য সভ্যগণ একজন অবৈজ্ঞানিক হোমিওপ্যাথিপ্রথাবলম্বী চিকীৎসকের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে সদস্য নির্ব্বাচনে বাধা প্রদান করেন। ইহাতে সরকার মহাশয় উক্ত Facultyকে এক খানি পত্র লিখেন; ফ্যাকাল্টিও এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। পরে ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথি চিকীৎসার প্রধান প্রধান সূত্র এবং তৎসম্ভূত প্রত্যক্ষ কার্য্যগুলি তন্মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ চিকীৎসক

হিপোক্রেটিশ হইতে তৎপরবর্ত্তী অন্য মহোদয়গণের অভিমত দ্বারা সমর্থন করতঃ ফ্যাকাল্‌টিকে আর এক খানি পত্র লিখেন। ফ্যাকাল্টি হোমিও-প্যাথিকে absurd and irrational system of transcendental nonsence বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার সরকার স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকীৎসাই কেবল মাত্র বিজ্ঞান সম্মত। সরকার অখণ্ড যুক্তিদ্বারা ফ্যাকাল্‌টির সমস্ত তর্ক পণ্ড করিয়া জয়ী হইলেন এবং তিনিও উক্ত ফ্যাকাল্‌টির সদস্য নিযুক্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ সময়ের পণ্ডিতেরা স্থির বিশ্বাস করিতেন যে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব। গেবার (Geber) পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে যখন তাম্রের সহিত দস্তা মিশ্রিত করা যায় তখন উহা হইতে স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্বর্ণের এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। উহাই এখনকার পিত্তল। তিনি দেখিলেন পারদ এবং শীসক একত্রে মিশ্রিত করিলে টিন (Tin) প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এই দুই ধাতুর মিশ্রণে টিনের ন্যায় এক প্রকার শুভ্র ধাতু প্রস্তুত হয়। এই সময়ে তাঁহারা জানিতেন যে ধাতু হইতেই লবণের (salt) উৎপত্তি। যথা, তাম্র হইতে তুঁতের সৃষ্টি। এই তুঁতে জলে দ্রব করিয়া উহার মধ্যে এক খণ্ড পরিষ্কৃত লৌহ নিমগ্ন করিলে ঐ লৌহের উপর তাম্র লাগিয়া যায়; ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভাবিতেন যে লৌহকে তাম্রে পরিণত করা হইল। ইহার ফলে, স্পর্শমণির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতে লাগিল।

পরে প্যারাসেলসাস্ (Paracelsus) রসায়ন শাস্ত্রের সহিত ভেষজ শাস্ত্রের একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন (১৪৯৩—১৫৪১ খ্রীঃ অঃ)।

তখন তাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রকে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বুঝিতেন।

এতাবৎকাল লোকে যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, ভ্যান হেলমণ্ট (Van Helmont) তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন (১৫৭৭—১৬৪৪ খ্রীঃ অঃ)! তিনি যদিও "বায়ুকে" একটি মৌলিক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তথাপি তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই বায়ু অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বুঝাইয়া দেন, যে ধাতুকে কোন একটি এসিডের (acid) সহিত একত্র করিলে, যদিও ঐ ধাতু দৃষ্টতঃ নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি বিশেষ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উহাকে পুনরায় ধাতুরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই সময়ে আরও কতকগুলি রাসায়নিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে গ্লবারের (Glauber) নাম প্রথম উল্লেখ যোগ্য। ইনি অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধের সৃষ্টি করেন (১৬০৩—১৬৬৮ খ্রীঃ অঃ)। এই সময়ে রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) অনেকগুলি রাসায়নিক সত্যের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন (১৬২৭—১৬৯৬)

পরে বেচার (Becher) এক অদ্ভুত মতের আবিষ্কার করেন (১৬৩৫—১৬৮১ খ্রীঃ অঃ) এবং পরে উহা ষ্টাল (Stahl) দ্বারা প্রমাণিত হয় (১৬৬০—১৭৩৪ খৃঃ অঃ)। বেচারের মতে সমস্ত দহ্যমান পদার্থে দুইটি প্রধান বস্তু বর্ত্তমান থাকে, এবং যখন কোন পদার্থ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, সেই দুই প্রধান বস্তুর একটি পৃথক হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায় এবং অপরটি পড়িয়া থাকে; কোন একটি ধাতুকে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিলে, কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে তাহা ভস্ম হইয়া গেল; ইহার কারণ ঐ ধাতুটিতে দুইটি প্রধান বস্তু বর্ত্তমান ছিল; অগ্নি সংযোগে একটি বাহির হইয়া উড়িয়া গেল এবং অপরটি ভস্মাকারে পড়িয়া রহিল। যে বস্তুটি উড়িয়া গেল তাহার নাম ফ্লজিষ্টন (Phlogiston) রাখিলেন। ষ্টালের (Stall) মতে এই ফ্লজিষ্টন (Phlogiston) অতি অল্প পরিমাণে প্রত্যেক বস্তুতে বর্ত্তমান কিন্তু তৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ফ্লজিষ্টনকে বায়ু হইতে পৃথক

করিয়া উদ্ভিদেরা নিজেদের শরীর পুষ্ট করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে পারে ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কোন দ্রব্য পচিয়া যাইতে দেখিলে তাঁহারা বলিতেন যে উহা হইতে ঐ ফ্লজিষ্টন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছে।

যখন কোন ধাতুকে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করা হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার গুরুত্ব বাড়িয়াছে; ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা যে ফ্লজিষ্টনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু পরে যখন রাসায়নিক তুলাদণ্ডের সৃষ্টি হইল, লাভয়সিয়ার (Lavoisier) অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে এই ফ্লজিষ্টনের অনুমান (Phlogiston Theory) একেবারেই ভ্রমাত্মক। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

মানব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানব কি?—মানব শরীর ও অন্যান্য নিকৃষ্টতর প্রাণীর শরীর একই উপাদান সংগঠিত; রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমস্ত জীব শরীরই অবিভিন্ন মৌলিক উপাদান সমূহের যোগে সম্ভূত; অধিকন্তু মানবও ভীত হইলে, ক্রুদ্ধ হইলে, বা অন্য কোন বিশেষ ভাবাপন্ন হইলে, দৈহিক বা মুখ মণ্ডলের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন দ্বারা মনের ভাব প্রকটিত করে; আবার জননী গর্ভে, কয়েক প্রকার বিশেষ জীব ব্যতীত, মানবেতর সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি প্রণালী প্রায় একরূপ এবং সকলেরই বিকাশ বৃদ্ধি ও বিনাশ একই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত। মানব বা অন্যান্য জীবের দৈহিক উপাদানে, ক্রিয়াকলাপে, জীবনের কার্য্য পরিচালনে, বিকাশ বৃদ্ধি এবং বিনাশে, কোনও প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না।

এত সমস্ত থাকিলেও মানব পশু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য ; এমন কি অনেক পণ্ডিতেও মনে করেন যে, মানবই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। মানব কোন্ বিশেষ গুণ বিভূষিত হইয়া অন্যান্য পশু অপেক্ষা মহত্তর হইয়াছে এবং জগতে মানব কিরূপে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই তথ্য নিরাকরণ জন্য অধুনা বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা চলিতেছে।

জ্ঞান এবং বুদ্ধিই মানবকে ইতর জীব হইতে মহত্তর করিয়াছে। কোন বিশেষ কার্য্যের রীতি নীতি লক্ষ্য করিয়া, সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে সেই রীতি নীতির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ অথবা কোন বিশেষ রীতি নীতি অবলম্বন কবিয়া আয়াসসাধ্য ও ক্লেশকর কোন কার্য্যকে সুবিধাজনক অনায়াস সাধ্য করিবার যে শক্তি তাহাই মানবের জ্ঞান এবং বুদ্ধি। এই জ্ঞান এবং বুদ্ধি বলেই, মানব কোন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তাহার ভাবী ফলের অনুমান করিয়া লয় এবং ভবিষ্যতের পথ হইতে অনেক কণ্টক দুব করিয়া ফেলে ; জ্ঞান এবং বুদ্ধিই মানবকে আয়াসসাধ্য সুমহান অনুষ্ঠানের সুচারু উপায় অবলম্বন করিবার শক্তি প্রদান করে, আর মানবও অনায়াসে তাজমহলের ন্যায় চির গৌরবান্বিত সৌধ, টেমসের চির বিস্ময়কর সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে ; অতর্কিত ভয়ঙ্কর বিপদরাশি মানব বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় ; এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া শীতের শেষে শস্য সংগ্রহ করে। অন্যান্য ইতর প্রাণী প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে যাহাতে জীবিত থাকিতে পারে, আপনাকে তাহারই উপযোগী করিয়া তুলে ; কিন্তু মানবই কেবল মাত্র নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহকে নিজের উপযোগী করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

মানবের এইরূপ হিতাহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অঙ্কুর প্রথমে কিরূপে সঞ্জাত হইয়াছিল ?—ইহা বাস্তবিকই বড় জটিল প্রশ্ন। ইহার সাধারণতঃ দুইটি উত্তর, এবং দুইটিই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। হয় ইহা প্রায়পশু-তুল্য প্রথম মানবের প্রকৃতিনিষ্ঠ ছিল ; অথবা ইহা বহিস্থ কোন কারণে মানব প্রকৃতিতে একবার অঙ্কুরিত হইয়া, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত, ক্রম-বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রথম উত্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে রহস্যপূর্ণ, জ্ঞানাতীত, অবোধ্য শক্তি কর্ত্তৃক পক্ষী ডিম্বে, শাবকের মানসিক বা শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বীজ, শাবকোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই সন্নিবেশিত থাকে, সেই কুহেলিশক্তি-তেই প্রথম মানবে, মানবের এই অদ্ভুত জ্ঞান বুদ্ধির অঙ্কুর সন্নিবেশিত হইয়াছিল; আবার দ্বিতীয় উত্তরে প্রতিপন্ন হয় যে, মানব অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও বুদ্ধি লাভ করিয়াছে; কাজেই প্রথম মানবের উৎপত্তির পর, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ নৈসর্গিক অবস্থাই জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রথম কারণ হইয়াছিল। ডারউইনের সময় হইতে এই দ্বিতীয় উত্তরই মানবের জ্ঞান বুদ্ধির কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণেরও সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তি এই দ্বিতীয় উত্তরের উপর ন্যস্ত।

আজকাল অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিৎ বিশ্বাস করেন যে, এই হিতাহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তি মানবের আদি পুরুষে প্রচ্ছন্ন ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল না; পরন্তু মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধি, মানব নূতন নূতন নৈসর্গিক ব্যাপার পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতারই ফল স্বরূপ।

মানব ক্রমাগত উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আজ যাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি, যাহাকে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের চরম বলিয়া স্বীকার করিতেছি, কালই আবার তদপেক্ষা মহত্তর আবিষ্কারে এবং অধিকতর আশ্চর্য্য জনক উদ্ভাবনে আজিকার নূতন, অপদার্থে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে। এই উন্নতির মূল জ্ঞান ও বুদ্ধি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ক্রমবর্দ্ধনশীল অভিজ্ঞতাই জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎপত্তির স্থান। অবশ্য ইহা সত্য যে, আদি মানব যে নৈসর্গিক ক্রিয়া সমূহ লক্ষ্য করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, সেই নৈসর্গিক ক্রিয়া-পরীক্ষাস্থানের পরিসর অত্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্যামেরা ক্রয় করিবার সময় বিক্রেতার নিকট ক্যামেরা কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয় তাহা বেশ করিয়া দেখিয়া লইলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়।
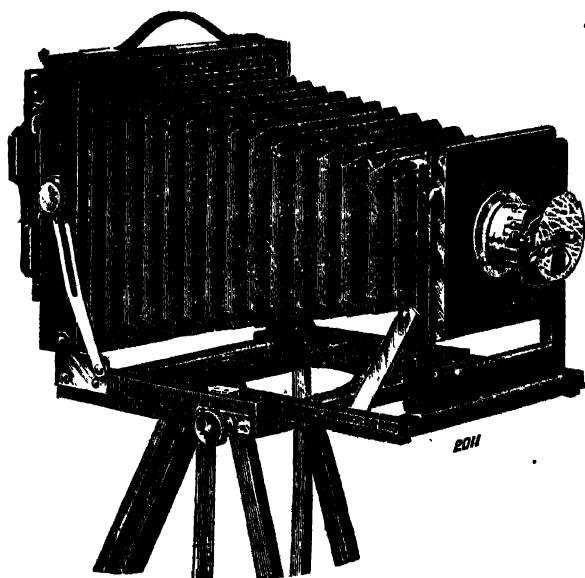
ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা।

বেলো মোটা হইতে সরু হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় প্রকার ক্যামেরা, ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা ইহা ষ্ট্যাণ্ডের উপর বসাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন ক্যামেরাতে শাটার থাকে কিন্তু অধিকাংশ ক্যামেরাতেই ক্যাপ থাকে। ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা $\frac{1}{4}$ সাইজ হইতে অনেক বড় সাইজের পর্য্যন্ত হয়। ইহা মেহগনি বা সেগুন কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই দুই কাষ্ঠই এদেশে বেশ ব্যবহারো-পযোগী। যদি পিত্তল দ্বারা বাঁধান হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। ষ্ট্যাণ্ডক্যামেরা

দুই প্রকার; প্রথম প্রকার ক্যামেরার বেলো মোটা হইতে ক্রমে সরু গিয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার ক্যামেরার বেলো সমান্তরাল (parallel) প্রথম প্রকার ক্যামেরা সরু বেলো হওয়ার জন্য হাল্কা হয়; কিন্তু অনেক নির্ম্মাতা হাল্কা করিতে গিয়া অনেক সময়ে খারাপ করিয়া ফেলেন। ভাল ক্যামেরা মুড়িলে খুব ছোট হইয়া যায়, ক্যামেরা খুব শক্ত (rigid) অথচ হাল্কা হওয়া চাই। ক্যামেরার সম্মুখে যেখানে লেন্স লাগাইতে হয় সেখানে উচু ও নীচু করিবার (rising front) ও দুই
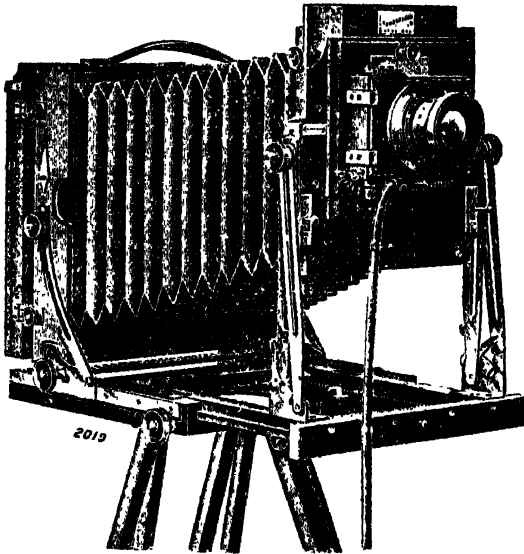
ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা সম্মুখ উঁচু বা (rising front) করা হইয়াছে।

পাশে (cross front) সরাইবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। ক্যামেরার পশ্চাৎভাগ হেলাইবার (swing back) বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম, নীচের দিকটা ক্যামেরাসংলগ্ন থাকিলে উপর দিকটা হেলান যায় এবং দ্বিতীয়, উপর দিকটা ক্যামেরা-সংলগ্ন থাকিলে নিচের দিকটাও হেলান যায়। ষ্ট্যাণ্ডক্যামেরার পশ্চাতে গ্রাউণ্ড, গ্লাস থাকে, ইহার উপর লেন্সের দ্বারা ছবি প্রতিফলিত হয়।

গ্রাউণ্ড গ্লাসকে যাহাতে লম্বা ও পাশভাবে করা যায় তাহার বন্দোবস্ত
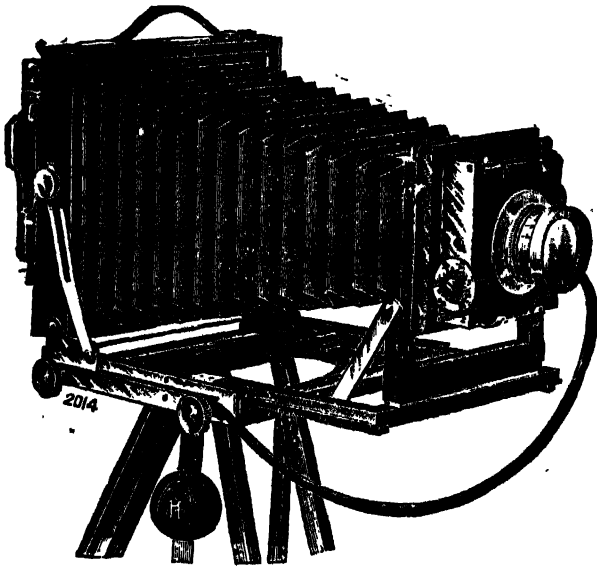
বেলো দ্বিগুণ লম্বা করা (double extension) করা ষ্ট্যাণ্ড
ক্যামেরা রোলার ব্লাইণ্ড শাটার সমেত।

আছে ; তাহারই জন্য সোজা ও পাশ ভাবে ছবি উঠে। যাহাতে লং ফোকাস লেন্স (Long focus lens) ব্যবহার করা যায় তজ্জন্য ক্যামেরার বেলো দ্বিগুণ লম্বা (double extension) করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়। ত্রিগুণ লম্বা (Triple extension) করা গেলে আরও ভাল হয় কেন না প্রয়োজন হইলে ইহাতে টেলিফোটো (telephoto lens) ও ব্যাবহার করা যাইতে পারে। বেলো দ্বারা ছবির কোন ভাগ বাদ না যায় তাহা দেখিয়া লইতে হইবে।

ডার্কশ্লাইড বইয়ের মত বা অন্যান্য প্রকারের পাওয়া যায়। বইয়ের মতন ডার্ক শ্লাইডে দুখানি প্লেট দেওয়া যায় দুই খানির মধ্যে একখানি মোটা কাল রঙের কার্ড থাকে। এক্স্পোজ করিবার জন্য দুধারে দুখানি কাষ্ঠের শ্লাইড আছে তাহা টানিয়া উঠাইলেই প্লেট দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে অসাবধানতায় শ্লাইড না উঠিয়া পড়ে তজ্জন্য প্রত্যেক
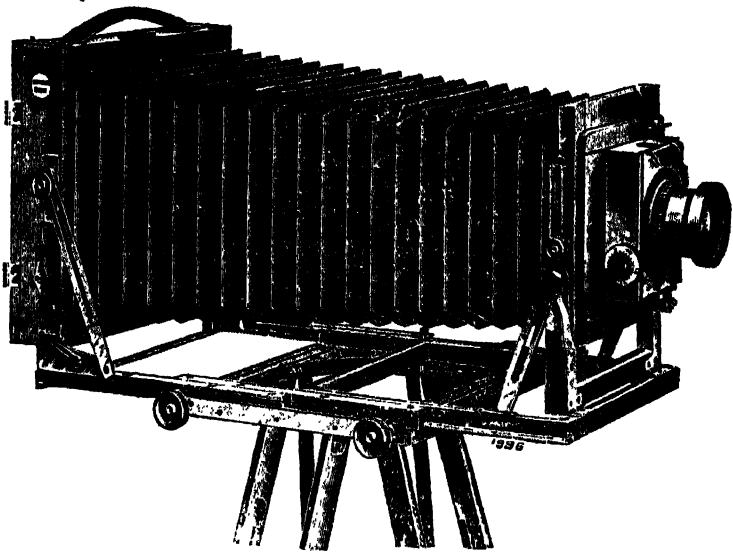
ত্রিগুণ লম্বা করা (triple extension) সমান্তরাল
(parallel) বেলো ক্যামেরা।

স্লাইডের উপরে একটি পিন থাকে তাহা দ্বারা আটকাইয়া দিলে আর খুলিবার ভয় থাকে না।

ক্যামেরার কোন যন্ত্র বা স্ক্রু দ্বারা কি করিতে হয় তাহা বারবার নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যবহার করিয়া বেশ মনে করিয়া রাখিলে পরে কোন হাঙ্গামে পড়িতে হয় না। ফোকাস করিতে হইলে একখানি পুরু কাল কাপড় দ্বারা ক্যামেরার পশ্চাৎভাগ ঢাকিয়া লইয়া নিজের মাথাও ঢাকিয়া লইতে হয়। বাম হস্তে কাল কাপড়ের দুই পাশ চিবুকের নিচে একত্র করিয়া নিচ হইতে আলো আসিবার পথ বন্ধ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে স্ক্রু ঘুরাইয়া বেলো বড় ও ছোট করিয়া যখন দেখা যায় যে গ্রাউণ্ড গ্লাসে ছবিটি বেশ স্পষ্ট হইয়াছে তখন ফোকাস্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গ্রাউণ্ড গ্লাসে ছবিটি উল্টা হইয়া পড়ে। গ্রাউণ্ডগ্লাস হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি পশ্চাৎ হইতে দেখিলেই ফোকাস ঠিক হইয়াছে কিনা ভাল বুঝিতে পারা যাইবে।

ফোকাসিং ক্লথটি দ্বারা যাহাতে সমস্ত ক্যামেরাটি মুড়িয়া ফেলা যায় এত বড় হওয়া চাই। তাহার মধ্য দিয়া যেন আলো প্রবেশ না করে। ভেলভেট দ্বারা প্রস্তুত জিনিষই বাজারে বিক্রয় হয় কিন্তু দুই তিন প্রস্থ পুরু কাল টুইল হইলে বেশ সস্তায় হইতে পারে।

লেন্সের মুখে ক্যাপের পরিবর্ত্তে শাটার থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। কারণ হস্তদ্বারা ১/২ কিম্বা ইহা অপেক্ষা কম এক্‌স্‌পোজার দেওয়া অসম্ভব। আজ কালকার নূতন প্রকার যন্ত্রে ৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায় কিন্তু পূর্ব্বে আন্দাজ করিয়া টাইম এক্‌স্‌পোজার দেওয়া হইত অবশ্য দশ সেকেণ্ড কিম্বা তদূর্দ্ধ ঘড়ি দেখিয়াই দেওয়া হয়।

শাটার।

শাটার অনেক প্রকার আছে তন্মধ্যে যেগুলি বেশী ব্যবহার হয় ও নির্দ্দোষ (accurate) সেই গুলির সম্বন্ধেই লিখিব।

থরন্টন্ পিকার্ড কর্ত্তৃক প্রণীত রোলারব্লাইণ্ড শাটার বেশ ভাল। ইহাতে রবারের বল ও টিউব দ্বারা কাজ করিতে হয় ইহাতে ১/২ হইতে

রোলার ব্লাইণ্ড শাটার।

১/৯০ পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায় এবং নূতন উদ্ভাবিত টাইম্ ভ্যাল্‌ভ দ্বারা ৩ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়। ইহা লেন্সের পশ্চাতে কিম্বা সম্মুখে লাগাইয়া দেওয়া যায়।

ইউনিকম্ শাটার—এই শাটার বেশ ছোট এবং অল্প স্থানে সন্নিবেশ করা যায় সম্মুখের ও পশ্চাতের লেন্সের মধ্যে (between lens) ইহা কার্য্য করে। ইহা কেবল ধাতুদ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহাতে ১ হইতে ১/১০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত একস্‌পোজার দেওয়া যায়। বল টিউব বা হস্ত দ্বারা একটি ঘোড়া (trigger) টিপিলেই এক্‌স্‌পোজাব দেওয়া হয়।

অটোম্যাট্ শাটার—ইউনিকম্ শাটারের মতনই কিন্তু প্রত্যেকবার এক্‌স্‌পোস করিবার পূর্ব্বে ইহার স্প্রিং ঠিক করিয়া দিতে হয় না। বল টিউব বা ঘোড়া টিপিলেই এক্‌স্‌পোজার হয়। ভলিউট, কৈলস, প্রভৃতি শাটার প্রায় এই রকম।

ফোকাল প্লেন শাটার—এই শাটার লেন্সের নিকট না হইয়া ড্রাই প্লেটের ঠিক সম্মুখে লাগান থাকে। ইহা কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত এবং প্লেট খানির মত চওড়া হয়। প্রথমে এক প্রস্থ কাপড় থাকে তাহা গুটাইয়া ফেলিলে মধ্যে ফাঁকটি দেখা যায় তাহার পর আর এক প্রস্থ কাপড় থাকে। মধ্যে ফাঁকটি ছোট বড় করিলেই এক্‌স্‌পোজারের অনেক তারতম্য হয়। কারণ ফাঁকটি যত বড় হইবে তত বেশী আলো প্লেটে লাগিবে এবং যত ছোট হইবে তত কম আলো লাগিবে শাটার লেন্সের নিকটস্থ থাকিলে ড্রাইপ্লেটে যত আলোক লাগে, তাহা হইতে ড্রাই প্লেটের যত নিকটস্থ শাটার হয় তত বেশী আলো ড্রাই প্লেটে লাগে এবং তজ্জন্য আরও কম এক্‌স্‌পোজারের প্রয়োজন হয়। সেজন্য এই প্রকার শাটারে ৫ হইতে ১/১০০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়।

লেন্স।

লেন্স সম্বন্ধে মোটামুটি কথা লিখিয়া দিব। যে সকল ক্যামেরাতে একখানি লেন্স থাকে তাহার বেশী ভাগই ভাল নয় কারণ গ্রাউণ্ডগ্ল্যাসে দেখা যায় যে প্রতিফলিত ছবির মাঝখানটা ফোকাস হয় কিন্তু চারিপাশে ঝাপ্‌সা থাকে। যদিও ছোট ডায়াফ্রাম দ্বারা ভাল করিয়া আনা যায় কিন্তু তাহা হইলে বেশী এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়। কতকগুলিতে দুই তিনটি লেন্স একত্র করিয়া আটকাইয়া দেওয়া থাকে তাহা দেখিতে
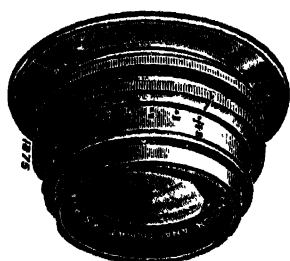
লেন্স।

ঠিক একখানি লেন্সের মত। এগুলিরও অনেক সময়ে উপরোক্ত দোষ থাকে। এই একখানি লেন্স (single lens) দ্বারা দৃশ্য বেশ সুন্দর উঠে এবং বেশ পরিষ্কার হয়। আজকালকার সিঙ্গল্ লেন্সে এই দোষ অনেকটা কম করা হইয়াছে।

রেক্‌টিলিনিয়ার লেন্সে—(Rectilinear lens) এসকল দোষ নাই। ইহাতে দুইটি লেন্স তফাৎ বসান থাকে। এই প্রকার লেন্স দ্বারা বাড়ী, দৃশ্য প্রভৃতি সবরকম ছবিই তুলিতে পারা যায়।

পোর্ট্রেট লেন্স—দ্বারা প্রতিমূর্ত্তিই কেবল তোলা হয় ইহাতে কেবল এক সমতলে (plane) এ যাহা আছে তাহারই ফোকাস হয় এবং অন্যান্য জিনিষ ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হইয়া যায় তজ্জন্য ছবি বেশ সুন্দর দেখায়।

টেলিফোটোগ্রাফিক লেন্স—দ্বারা খুব দূরের পদার্থ কাছে বেশ বড় দেখায়। ইহা দ্বারা অতি দূরস্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রভৃতির ছবিও বেশ কাছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিতে গেলে বেলো খুব বাড়াইয়া দিতে হয় এবং ছবি যত বড় হয় তজ্জন্য এক্‌স্‌পোজারের তারতম্য হয়। বেশ পরিষ্কার দিনে ইহা ব্যবহার করা উচিত। যদি একটুও ঝাপ্‌সা থাকে তাহা হইলে আইসোক্রোমাটিক স্ক্রিন (Isochromatic screen)—ইহা হরিদ্রা বর্ণের একখানি কাচ সম্মুখে দিয়া ছবি তুলিতে হয় অবশ্য তাহার জন্য বেশী এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়।

ওয়াইড এঙ্গল লেন্স—ইহার দ্বারা অনেকখানি ছবি প্লেটের মধ্যে আসে, যেখানে বাড়ীর ছবি লইতে হইলে বেশী পশ্চাতে গিয়া ছবি

লইবার যায়গা না থাকে সেখানে এই লেন্স ব্যবহার করিলে খুব নিকট হইতেই সমস্ত বাড়ীর ছবিখানি গ্রাউণ্ড গ্ল্যাসের মধ্যে আসে।

সিঙ্গল্ লেন্স অপেক্ষা রেক্‌টিলিনিয়র লেন্স কেনাই উচিত। গ্রাউণ্ড গ্ল্যাসের ধার পর্য্যন্ত ছবি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইতেছে তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। লেন্স বেশ যত্নের সঙ্গে রাখিয়া দেওয়া উচিত। শেময় চামড়ার ব্যাগে শুষ্ক যায়গায় রাখিলে ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে ও ক্যামেরা ব্যবহার করিবার সময় শেময় চামড়া বা রেশমের রুমাল দ্বারা লেন্স খুলিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত, বিশেষতঃ বর্ষাকালে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া লেন্স মুছা উচিত। বর্ষাকালে লেন্সে এক প্রকার সাদা দাগ হয় তাহা মুছিয়া না ফেলিলে লেন্সে দাগ পড়ে তাহা কিছুতে উঠেনা। মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়াও মধ্যে মধ্যে মুছিলে ভাল হয়।

ক্যামেরা ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রাদির সম্বন্ধে মোটামুটি লিখিয়া দিলাম, এখন কি প্রকারে কার্য্য করিতে হয় তাহা লিখিব। কেবল ক্যামেরা ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিলে ভাল লাগেনা এতএব কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে লিখিব। এ পর্য্যন্ত যাহা শেখা গিয়াছে তাহাতেই ছবি তোলা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ইংরাজির বাংলা ব্যাখ্যা।

ক্যাপ—চামড়া দ্বারা মোড়া পেষ্টবোর্ডের তৈয়ারী চাকতির মত ইহা দ্বারা লেন্সের মুখ বন্ধ করা যায়।

বেলো—চামড়া দ্বারা প্রস্তুত জিনিষই ভাল হয়। গ্রাউণ্ডগ্ল্যাস ও লেন্সের মধ্যের যায়গা ইহা দ্বারা বন্ধ করা থাকে। ইহা এমন ভাবে তৈয়ারী যে ইহা মুড়িয়া ফেলা খুব সহজ।

বল ও টিউব—ইহা রবারের প্রস্তুত, ইহাতে একটি রবারের বল আছে ও তাহাতে রবারের নল লাগান আছে। নলটি শাটারে লাগাইয়া বল টিপিলে বাতাসের চাপে এক্‌সপোজার হয়।

টাইম্ ভ্যালভ—এই যন্ত্র বল ও টিউবের মধ্যে নলটি কাটিয়া লাগাইয়া দিতে হয়, ইহাতে $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, ১, ২ ও ৩ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌সপোজার দেওয়া যায়।

ডায়াফ্রাম্—ইহাকে এপারচারও বলে। লেন্সের মুখ যত চওড়া তাহার মাপকে ডায়াফ্রাম বলে। এক এক প্রকার লেন্সের এক এক রকম ডায়াফ্রাম্ আছে। যথা f ৮, f ১৬ প্রভৃতি ইহাকে এই প্রকারে না বলিয়া ইউনিফরম্ সিষ্টেমও বলে।

যথা	f ৬	f ৮	f ১১	f ১৬	f ২২
ইউনিফরম্ সিষ্টেম্	২	৪	৮	১৬	৩২।

ডায়াফ্রাম্ যত ছোট হয় ছবি তত পরিষ্কার হয়। ডায়াফ্রাম দুই প্রকার আছে ওয়াটার হাউস ইহা পিতলের চাকৃতির, ইহার মধ্যে নানা মাপের গোল ছিদ্র করা আছে ইহা লেন্সের পশ্চাতে পরাইয়া দেওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার আইরিস, ইহা মাপ মত ছোট বড় করিবার জন্য একটি কাঁটা আছে তাহা সরাইলেই গর্ত্ত ছোট বড় করা যায়। গর্ত্ত যত ছোট হয় তত বেশী একৃস্‌পোজারের প্রয়োজন হয়। যেমন f ৮এ যত একৃস্‌পোজার দিতে হয় f ১১ তে তাহার দ্বিগুণ একৃস্‌পোজার দিতে হয়।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

বিবিধ।

রেডিয়ামের ক্ষেত্র।—আয়র্লণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রের জলে রেডিয়ম আছে। পূর্ব্বে তাহা কেহ জানিত না।

পৃথিবীতে খাদ্য পরিমাণ।—সার উইলিয়ম ক্রুকস বলেন ১৯৩১ খ্রীঃ অঃ পৃথিবীতে যত খাদ্য উৎপন্ন হইবে তাহা দ্বারা পৃথিবীর লোকের খাদ্য সঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার মতে সাগরাভ্যন্তরে যে সকল সামুদ্রিক গাছ (weeds) পাওয়া যায় তাহা এখন হইতেই কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বিষয় কিছু নূতন নহে এসিয়াবাসী বহুকাল হইতে সামুদ্রিক গাছ খাদ্যের জন্য ব্যবহার করে।

---

* ব্লকগুলি ১৪৮ নং চিৎপুর রোডস্থ ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম বিক্রেতা দাসও দত্ত কোম্পানী অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

শিল্প-বিজ্ঞান সমিতি।—বিদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য এবৎসর শিল্প-বিজ্ঞান সমিতি হইতে একজন ছাত্র মাসিক ১০০৲ টাকা, আট জন ৫০৲ টাকা ও এগার জন ২৫৲ টাকা বৃত্তি এবং আশী জন পাথেয় পাইয়াছেন।

অদ্ভুত চসমা।—ফ্রান্সের কম্যান্ডান্ট সলিয়ে একপ্রকার চসমা আবিষ্কার করিয়াছেন তদ্দ্বারা সর্ব্বদিক এমনকি পশ্চাতেও দেখিতে পাওয়া যায়; দূরদৃষ্টি প্রভৃতি চক্ষু রোগও ইহা দ্বারা ভাল হয়। বধির লোকগণ এই চসমা পরিলে, কর্ণে না শুনিলেও, পশ্চাতে কি হইতেছে দেখিতে পাইবেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে।

রবার গাছ।—দক্ষিণ আমেরিকায় রাওডি জেনেরার নিকট এক জঙ্গলে রবার গাছ পাওয়া গিয়াছে সেখানে ২০০০ লোক লাগাইলে ২০ বৎসর রবার পাওয়া যাইবে।

মক্ষিকার শিক্ষা।—রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির মিঃ স্মিথ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিনি মক্ষিকাকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি ছাড়িয়া দিলে পলায়ন করে না। কতকগুলি চাকা ঘুরায়, বল ও ডাম্বেল ঠেলিয়া দেয়। তিনি বলেন যে মক্ষিকা কি করে তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং মনে করে যে সে চলিয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন।

জনৈক রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার রেল রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময় অনুমান ৪০০ শত পাউণ্ড ওজনের ৩০ ফুট লম্বা একটী রেল ওজন করিতে বাধ্য হন। তাহার নিকট ২৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন করা যাইতে পারে এরূপ একটা স্থির আলম্ব বিন্দু বিশিষ্ট দাঁড়ী পাল্লা (balance of fixed fulcrum ছিল। তিনি ঐ রেল কি প্রকারে ওজন করিতে পারেন?

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যিনি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক বৎসর বিনা মূল্যে "বিজ্ঞান দর্পণ" পত্রিকা দেওয়া যাইবে।

সম্পাদক।

নিয়মাবলী।

"বিজ্ঞান দর্পণ" বিজ্ঞান সভার অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত হারাধন রায় এম, এ, এফ্, সি, এস্ সম্পাদিত এবং ছাত্রগণ পরিচালিত বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্র।

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

বিজ্ঞান দর্পণে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা মাসের ২০সে তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিনিময় পত্র, চিঠি এবং মূল্য প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হারের নিমিত্ত পত্র লিখিতে হইবে।

২১০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ "বিজ্ঞান দর্পণ।

বিজ্ঞান দর্পণ।

১ম বর্ষ।] বৈশাখ ১৩১৬, এপ্রিল ১৯০৯। [৪র্থ সংখ্যা।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ফ্লজিষ্টন মতের সংস্থাপন সময় হইতে এবং লাভয়সিয়ারের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমানীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত নানা দেশে অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতের আবির্ভাবে রাসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি লাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের ব্ল্যাক (Black), প্রিষ্টলি (Priestley) এবং ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish), সুইডেনে শীল (Scheele), এবং ফরাসী দেশে ম্যাকার (Macquer), ইহাদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য। ১৭৫৪ খ্রীঃ অঃ ব্ল্যাক স্থিরক্ষার (fixed alkali) সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, তাহাতে যে কেবল ফ্লজিষ্টন মতের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল এমন নহে, ইহার দ্বারা পরিমান-সংক্রান্ত (quantitative) রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এতাবৎ কাল সকলে আঙ্গারিক ক্ষারকে (Carbonated alkali) দাহকারক ক্ষার (caustic alkali) হইতে অপেক্ষাকৃত সরল যৌগিক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, যখন আঙ্গারিকক্ষারকে দগ্ধ চূণের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইতে দাহকারক ক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্ল্যাক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, যে যখন আঙ্গারিক ম্যাগনেসিয়াকে (magnesia) অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, উহার গুরুত্বের হ্রাস হইয়া থাকে ; এবং তখন তাহাতে কোন দ্রাবক (acid) মিশ্রিত করিলে উহা স্ফোটনশীল হয় না।

এই গুরুত্বের হ্রাসের প্রধান কারণ, যে যখনই আঙ্গারিক ম্যাগনেসিয়াকে দগ্ধ করা যায় তখনই উহা হইতে এক প্রকার বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, কাজেই উহা পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া পড়ে। এই বায়ুর অস্তিত্ব ইনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করেন ; এবং ইহাকে স্থির বায়ু (fixed air) নামে অভিহিত করিলেন।

প্রিষ্টলি (Priestley) বহু প্রকার গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাতি জ্বালাইলে উহা হইতে এক প্রকার গ্যাস বা বাষ্প জন্মিয়া থাকে। ১৭৭২ খ্রীঃ অঃ ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উহার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রমাণ করিলেন বাতি জ্বালাইয়া যে বাষ্প জন্মিয়া থাকে উহাতে কোন প্রাণী অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। প্রাণিগণের নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময়ে ঐ একই বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি অম্লজান (Oxygen) বাষ্প আবিষ্কার করেন। পরে তিনি অন্যান্য অনেক প্রকার বাষ্প আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দঃ তিনি অম্লজান (Oxygen) এবং জলজানের (Hydrogen) মিশ্রণে জলের সৃষ্টি সপ্রমাণ করেন।

এই সময়ে ক্যাভেণ্ডিস্ও (Cavendish) কতকগুলি সত্যের আবিষ্কার করেন। যদিও তাঁহার আবিষ্কারের সংখ্যা বহুল ছিল না, তথাপি সেগুলিতে তাঁহার চূড়ান্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে বায়ুর (air) উপাদান সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাসায়নিক পণ্ডিতেরা মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা প্রিষ্টলির প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করিয়া নানারূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ অঃ ক্যাভেণ্ডিস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বিশুদ্ধ

বায়ুতে শতকরা ২০.৮ ভাগ অম্লজান (oxygen) এবং ৭৯.২ ভাগ যবক্ষারজান (nitrogen) বর্ত্তমান আছে।

যে সময়ে ইংলণ্ডে ক্যাভেণ্ডিস এবং প্রিষ্টলি তাঁহাদের গবেষণায় মনোনিবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুইডেন দেশে শীল (Scheele) তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বায়ু সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে গিয়া তিনি অম্লজান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাসায়নিক গবেষণায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে যখনই বায়ু ফ্লজিষ্টনের সহিত মিলিত হয় তখনই বায়ুর পরিমাণের সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়, অতএব বায়ুর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটুকু নিশ্চয়ই পূর্ব্ববায়ু হইতে গুরু হইবে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তাহার বিপরীত ফল দেখিলেন। যে অংশটুকু বিলুপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি কয়েকটি ধাতু, ফস্‌ফরাস, এবং অন্যান্য কয়েক বস্তুকে একটি বায়ুপূর্ণ বদ্ধ পাত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেখিলেন যে একই প্রকার ফল হইল। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে ফ্লজিষ্টন, বায়ুর একটি উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া যে একটি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে সেটি উত্তাপ বা অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং এই উত্তাপ পাত্রের ভিতর হইতে অবশ্যই বাহির হইয়া যায়। প্রথমোক্ত বায়ুর ঐ উপাদানের নাম তিনি অগ্নি-বায়ু (Fire air) রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার মতে যখন পারদ ভস্মকে (calx of mercury) অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় তখন অগ্নির ফ্লজিষ্টন টুকু পারদ ভস্মের সহিত মিলিত হইয়া পারদের সৃষ্টি হয় এবং অগ্নিবায়ু বাহির হইয়া যায়, যথা—

অগ্নি

ফ্লজিষ্টন + অগ্নিবায়ু + পারদ ভস্ম

পারদ

= পারদভস্ম + ফ্লজিষ্টন + অগ্নি বায়ু
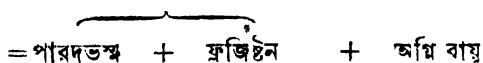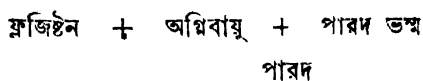
১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি ক্লোরিন গ্যাস (chlorine gas) আবিষ্কার

করেন। কিছুদিন পরে ইনি মলিবডিক (molybdic) এবং টংস্টিক্ (Tungstic) এসিডের ভিন্ন অবস্থান প্রমাণ করেন।

প্রুসিয়ান ব্লু (Prussian Blue) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময়ে তিনি ইহা হইতে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড (hydrocyanic acid) পৃথক করেন। তিনি উদ্ভিদ এবং জীবরাজ্য সম্বন্ধীয় রসায়ণ শাস্ত্রের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি আঙ্গারিক এসিড সর্ব্বপ্রথমে তিনিই প্রস্তুত করেন; যথা, টারটারিক (Tartaric), অগ্জালিক (Oxalic), সাইট্রিক (Citric), ম্যালিক (Malic), গ্যালিক (Gallic), ইউরিক (Uric), ল্যাকটিক (Lactic) এবং মিউসিক (Mucic)। ইহা ব্যতিত তিনি গ্লিসিরিণও (Glycerine) আবিষ্কার করেন। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

লৌহের মরিচা।

টিলডেন লৌহের মরিচা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাকালীন সাধারণ লৌহে (Commercial Iron) এবং ইস্পাতে যে প্রায়ই অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে তৎসম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। এই সমস্ত মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে গন্ধকের যৌগিক পদার্থই প্রধান। এই সমস্ত যৌগিক পদার্থ মুক্ত বায়ু এবং জলের সংস্পর্শে আসিলে এসিড (acid) উৎপন্ন করে। টিলডেনের পরীক্ষাকালীন কারবনিক এসিড বর্জ্জিত হইয়াছিল। লৌহমিশ্রিত গন্ধকের যৌগিক পদার্থ অক্সিডাইজড (Oxidised) হইয়া, এবং এসিড উৎপন্নকারী অন্য পদার্থ জল এবং অক্সিজেনের ক্রিয়ার মধ্যে আসিয়া, ভিন্ন ভিন্ন এসিড উৎপন্ন করে; এই সমস্ত বিভিন্ন এসিডের মধ্যে ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং লৌহও কোন যৌগিক পদার্থে (ferrous salt) পরিণত হয়। অবশেষে এই

ফেরাস সল্ট ক্রমাগত অক্সিজেনের সংস্পর্শে অক্সিডাইজড্ হইয়া পড়ে ; ইহাই বাস্তবিক টিলডেনের পরীক্ষায় মরিচার কারণ হইয়াছিল।

উক্ত পরীক্ষায় ক্রোমিক (chromic) এসিড দিবার পর, জল এবং বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেও, লৌহে মরিচা পড়ে নাই। কেন না যে সমস্ত পদার্থ বায়ু ও জল সংস্পর্শে এসিড উৎপন্ন করে, লৌহের উপরিভাগ হইতে সেই সমস্ত পদার্থ ক্রোমিক এসিড দ্বারা বিদূরিত হয়। টিলডেনের মতে উক্ত ক্রোমিক এসিড অক্সিজেনের সহিত লৌহের ক্রিয়ার শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেননা দেখা যায় কারবনিক এসিডযুক্ত স্বাভাবিক বাতাস (যে বাতাসের উপাদানগুলি পরীক্ষিত নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী) লাগাইলে উক্ত লৌহে অতি শীঘ্র মরিচা পড়িয়া যায়।

টিলডেন আরও বলিয়াছেন যে লৌহকে ক্ষীণশক্তিবিশিষ্ট (dilute) ক্রোমিক এসিডে কয়েক বৎসর ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিলে লৌহের বর্ণেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; এবং লৌহ ক্রোমিক এসিডের ক্রিয়ায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এসিডে মিশ্রিত হয় না ; কেননা উক্ত এসিডে অধিক পরিমাণে এমোনিয়া (ammonia) ঢালিলেও কোন কিছু অধস্থ (precipitate) হয় না। লৌহ যৌগিকে এমোনিয়া দিলে ফেরিক হাইড্রক্সাইড (ferric hydroxide) প্রস্তুত হয়। এই ক্রোমিক এসিডে লৌহক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত হয় ; কাজেই অধিক এমোনিয়া ঢালিলেও কোন কিছু অধস্থ হইয়াছে কিনা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এমোনিয়া দিয়া যদি উক্ত লৌহ সংমিশ্রিত ক্রোমিক এসিড ব্লটিং পেপারের সাহায্যে ছাঁকিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, যে ব্লটিং পেপারের উপরে ফেরিক হাইড্রক্সাইড রহিয়াছে, কাজেই ক্রোমিক এসিডের ক্রিয়ায় যে লৌহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

মাখন।

বাজারে আজকাল ঘৃতের মূল্য যেরূপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ ঘৃতের সঙ্কুলান সম্ভবপর নহে।* কাজেই লোকে ঘৃতের অনুরূপ অতি জঘন্য পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ব্যবহার জনিত কুফল অবশ্য-ম্ভাবী এমন কি অনেক সময়ে এই সমস্ত কুখাদ্যের জন্য প্রাণ রক্ষা করাও দায় হইয়া পড়ে। আমরা ক্রয় করিবার কালে বেশ বুঝিতে পারি যে ঘৃত অতি জঘন্য, কিন্তু আর কোনও উপায় নাই বলিয়া, জানি-য়াও নির্ব্বিরোধে বিষ ক্রয় করিয়া প্রিয় পরিজনের মুখে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ি। অধুনা এক নূতন প্রথায় মাখন প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বাদাম (ground nut) উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সমস্ত বাদাম এখান হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় রাশি রাশি রপ্তানি হয়; ইহাতে তৈলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক; এমন কি ভাল বাদাম হইতে শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল বাহির হয়। তৈল বাহির করিয়া লইবার পর এক প্রকার শ্বেত চূর্ণ অবশিষ্ট থাকে, ইহাতে পুষ্টিকর অংশ মসুর প্রভৃতি কড়াইএর প্রায় সমতুল্য। প্রথমতঃ অল্প গরম করিয়া পরে খোসা বাদ দিয়া এবং অবশেষে পেষণ যন্ত্রে রীতিমত চূর্ণ করিয়া লইয়া আমেরিকার মাখনওয়ালারা এই শস্ত হইতে গত দশ বৎসর যাবৎ এক প্রকার মাখন প্রস্তুত করিতেছে। জন-সাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহার ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মুদির দোকানে, এমনকি চাটনীর দোকানেও এই মাখন বিক্রীত হইতেছে। ফিলাডেলফিয়ায় প্রথমে অতি অল্প পরিমাণে বাদাম হইতে মাখন প্রস্তুত হইত। তখন মনে হইয়াছিল যে এ ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি হইবে না। অবশেষে মারস্যালের ল্যাম্বার্ট সাহেব ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি মাখন প্রস্তুত

করিবার জন্য কলকারখানাও স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বাজারে একটি বাদামের আড়ত স্থাপন করিয়া ক্রেতাকে বাদামের বস্তার সঙ্গে সঙ্গে মাখন প্রস্তুত প্রণালীর উপদেশ পত্রিকা প্রদান করিতেন। লোকেও এই মাখন ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কি উপায়ে বাদাম অপেক্ষা একবারে বাদামের মাখন বাজারে রাশি রাশি বিক্রীত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার ফলে অতি শীঘ্র নূতন কল কারখানা উদ্ভাবিত হইয়া পড়িল। এখন তিনটি যন্ত্রে এক একটি কারখানা চলিতেছে। একটিতে বাদাম ভাজা হয় দ্বিতীয়টিতে খোসা ছাড়ান হয় এবং তৃতীয়টিতে ভাজা এবং খোসা ছাড়ান বাদাম চূর্ণ করা হয়। এখন এক একটি কারখানায় প্রতিদিন ২০০০ পাউণ্ড মাখন প্রস্তুত হইতেছে।* এই তিনটি যন্ত্রের মূল্য ৬০০ ডলার বা ১৮৭৫ টাকা। একটি ৫ হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট এঞ্জিনে বা বা মোটরে এই সমস্ত কলগুলি পরিচালিত হয়। যাঁহারা একবারে এত বড় কারখানা করিতে না পারেন, তাঁহাদের জন্য ছোট ছোট যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। আমাদের দেশের লোক ভারত জাত দ্রব্য বিদেশে না পাঠাইয়া তাহা হইতে আমাদের দেশের উপযোগী অনেক জিনিষ তৈয়ারী করিবার অবসর পাইলেও, বেশ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন। যদি কেহ বাদামের মাখন কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি নিম্ন লিখিত উপায়ে চেষ্টা করিতে পারেন। ইহার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন নাই। একটা কড়া এবং হামান দিস্তা হইলেই যথেষ্ট হইবে। বাদামগুলি কড়ায় ফেলিয়া এরূপ ভাবে গরম করিয়া লইতে হইবে, যে তাহার খোসাগুলি অনায়াসে কাপড়ে ঘসিলেই যথেষ্ট পরিমাণে উঠিয়া যাইতে পারে। সেই খোসা গুলি কুলায় করিয়া উড়াইয়া দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাখনের মত না হইয়া পড়ে ততক্ষণ হামান দিস্তায় পিসিতে হইবে। ইহাই মাখনের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার লোকে যখন ইহার ব্যবহার করিতেছে; তখন ইহার পুষ্টিকরত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বাদাম উৎপন্ন হয়, এবং যেখানে সেখানে

বিক্রীত হয়। কাজেই প্রত্যেক গৃহস্থই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

দুষ্প্রাপ্য মূল পদার্থের তালিকা।

১=সাঙ্কেতিক অক্ষর (symbol)

২=পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight.)

৩=আবিষ্কারক (discoverer)

৪=আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity)

৫=প্রধান প্রাপ্তিস্থান (principal source)

৬=দ্রব করিবার উত্তাপ (melting point)

৭=ধর্ম্ম (properties)

(নির্দ্দেশকের সংখ্যার সহিত পদার্থের নিম্নস্থিত সংখ্যা মিলাইয়া লইতে হইবে।)

য়্যাক্‌টিনিয়াম (Actinium)

৩=ডেবিয়ার্ন।

৫=পিচব্লেণ্ড।

৭=রেডিও-য়্যাকটিভ।

বেরিয়াম (Barium)

১=Ba.

২=১৩৭-২

৩=শীল, ১৮৯৯ খৃঃ অঃ।

৪=৪.০

৫=হেভি স্পার।

৭=হরিদ্রাবর্ণ, অতি সহজে দ্রব করা যায়, স্বাভাবিক বায়ুতেই অক্সিডাইজড্ হয়, এবং জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে।

বেরিলিয়াম (Beryllium or Glycinum)

১ = Be.

২ = ৯.১

৩ = ভেগিলিন, ১৭৯৮ খৃঃ অঃ।

৪ = ২.১

৫ = বেরিল।

৭ = শ্বেতবর্ণ; টানিয়া তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে; নমনীয়; সহজে অক্সিডাইজড হয় না; এবং এসিডে দ্রবীভূত হয়।

বোরণ (Boron)

১ = B.

২ = ১১.০

৩ = গেলুসাক, ১৮০৮ খৃঃ অঃ।

৫ = বোর‍্যাক্স (সোহাগা)

৭ = অত্যন্ত কঠিন, ধাতব নহে; ইহার দুই প্রকার allotrophic modification আছে।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

১ = Ca.

২ = ৪০.০

৩ = ডেভি, ১৮০৮ খৃঃ অঃ।

৪ = ১.৬

৫ = চা খড়ি।

৭ = রূপার ন্যায় শুভ্র, অতি কোমল এবং সহজে নমনীয়। জলকণা-পূর্ণ বাতাসে অতি শীঘ্র অক্সিডাইজড হয়।

ক্যারোলিনিয়াম (Carolinium)

৩ = বাস্কার ভিল, ১৯০১ খৃঃ অঃ।

৫ = মোনাজাইট বালুকা।

সিসিয়াম (Caesium)

১ = Cs.

২ = ১৩২.৯

৩ = বুনসেন, ১৮৬০ খৃঃ অঃ।

৫ = মিনারেল ওয়াটার।

৬ = ২৭ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

৭ = অত্যন্ত কোমল, এবং দেখিতে পোটাসিয়ামের স্থায়। জলকণা-সিক্ত বাতাসে শীঘ্র অক্সিডাইজ্‌ড হইয়া যায়।

সিরিয়াম (Cerium)

১ – Ce.

২ = ১৪০.২

৩ = বারজিলিয়াস, ১৮০৩ খৃঃ অঃ।

৪ = ৫.৫

৫ = সেরাইট।

৭ = কোমল, নমনীয়। জলসিক্ত বাতাসে অক্সিডাইজ্‌ড হয়, এবং এসিডে গলিয়া যায়।

ক্রোমিয়াম (Chromium)

১ = Cr.

২ = ৫২.০

৩ = ভেগিলিন, ১৭৯৭ খৃঃ অঃ।

৪ = ৫.৯—৬.৮

৫ = লৌহ মিশ্রিত ক্রোম প্রস্তর।

৬ = অত্যন্ত অধিক উত্তাপে দ্রবীভূত হয়।

৭ = অত্যন্ত কঠিন ; এবং উত্তপ্ত করিলে অতি ধীরে ধীরে অক্সি-ডাইজ্‌ড্‌ হয়।

কোবাল্ট (Cobalt)

১ = Co.

২ = ৫৮.৭

৪ = ৮.৯৫৭

৫ = স্ম্যালটাইন।

৭ = অত্যন্ত কঠিন, নমনীয়·এবং টানিয়া তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে; বাতাসে অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয় না, এবং চুম্বকধর্ম্ম বিশিষ্ট।

কলাম্বিয়াম (Columbium)

১ = Cl.

ইহা প্রায় নিয়োবিয়ামের অনুরূপ।

ডেসিপিয়াম (Decipium)

১ = Dp.

২ = ১৭১.০

৩ = ডিলাফরটাঁ। ১৮৭৮ খৃঃ অঃ।

৫ = স্যামারসাইট।

ডাইডিমিয়াম (Didymium)

১ = Di.

২ = ১৪২.০

৩ = মোসাণ্ডার, ১ ৪১ খৃঃ অঃ।

৪ = ৬.৫৪

৫ = ইট্রোসেরাইট

৭ = শুষ্ক বাতাসেও অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়, এবং জলও বিশ্লিষ্ট করে।

ডিস্প্রোসিয়াম (Dysprosium)

১ = Dy.

৩ = এল ডি বয়বাড্রাণ, ১৮৮৬ খৃঃ অঃ।

৫ = অতি দুষ্প্রাপ্য

(ক্রমশঃ)

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডার্ক রুম।

ক্যামেরা পছন্দরূপ কেনা হইলে পর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্ধকার ঘর বা ডার্করুম (dark room)। যদি বাড়ীতে কোন খালি ঘর থাকে তবে তাহা লইয়া যদি ডার্করুম করা যায় তাহা হইলে বেশ ভাল হয়। তাহা না পাইলে সিঁড়ির নিচের ঘর হইলেও চলিতে পারে। যদি তাহাও সম্ভব না হয় তাহা হইলে যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে ছাদের উপরে কি উঠানে কাঠের ছোট ঘর করিয়া ডার্করুম করিলেই হয়। যদি কোনটাই সম্ভব না হয় তাহা হইলে অগত্যা রাত্রে কোন ঘরে ডেভলপ্ (develope) করিতে হইবে। ডার্করুমে প্রথমে একটি ভাল রুবি ল্যাম্প (ruby lamp) বা লাল কাচ দেওয়া ল্যাম্প দরকার। সাদা আলো বা কোন প্রকারে তাহার কার্য্যকারী রশ্মি (actinic rays) যদি এক্‌স্‌পোজ্ করা প্লেটে লাগে তাহা হইলে প্লেট নষ্ট হইয়া যায় বা ফগ্‌ড্ (fogged) হয়। সেই জন্য লাল আলোর প্রয়োজন, লাল আলোতে প্লেট নষ্ট হয় না; কিন্তু আজকাল যেরূপ প্লেট প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে এই লাল আলো বেশীক্ষণ লাগিলে অল্প ফগ্‌ড্ হইয়া যায়। বিশেষতঃ আইসোক্রোমাটিক প্লেট-গুলিকে সযত্নে লাল আলোর রশ্মি হইতে রক্ষা করিতে হয় কারণ লাল আলো এই প্লেটে লাগিলে প্লেট খারাপ হইযা যায়।

রুবিল্যাম্প হইতেও কখন কখন কার্য্যকরী রশ্মি (actinic rays) বহির্গত হয়, খারাপ লাল কাচ হওয়ার জন্য এইরূপ হয়। কাচ কার্য্যো-পযোগী কিনা বা তাহা হইতে কার্য্যকরী রশ্মি (actinic rays) বহি-র্গত হয় কিনা তাহা দেখিতে হইলে একখানা ডার্কস্লাইড লইয়া তাহার ভিতর একখানা ড্রাই প্লেট পুরিয়া লইতে হয়, তাহার পর রুবিল্যাম্প জ্বালিয়া ডার্কস্লাইডের এক পাশের স্লাইড অর্দ্ধেক টানিয়া

খুলিয়া এই লাল আলোর ল্যাম্প হইতে একফুট দূরে এক মিনিট ধরিতে হইবে। যদি লাল কাচ দিয়া সাদা আলোর কার্য্যকরী রশ্মি আসিয়া থাকে তবে প্লেট অন্ততঃ তিন মিনিট ডেভলপ করিলে দেখা যাইবে যে যে ভাগে লাল আলো লাগিয়াছে তাহার কাল রঙ হইয়া গিয়াছে। যদি খুব কম রশ্মি আসে তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে কেবল অল্প কাল হইয়াছে।
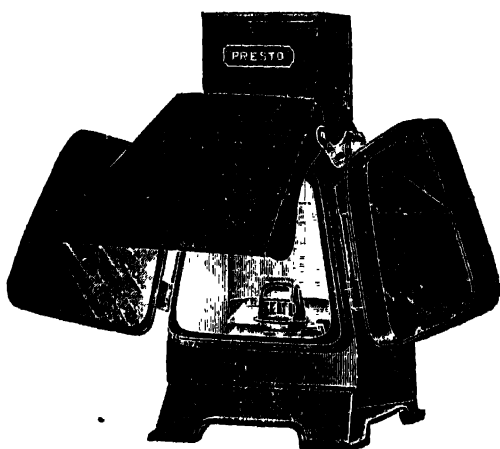
তৈলে জ্বলিবার রুবি ল্যাম্প;
ইহাতে হরিদ্রা ও লাল রঙের কাচ আছে।

এই অবস্থা দেখিলে পর লাল কাচটি বদলাইয়া দিতে হইবে। তবে কাচ দিয়া এই রশ্মি আসে কিনা তাহা দেখিতে হইলে ইল্‌ফোর্ডের এম্প্রেস প্লেট (Ilford Empress plate) বা সেইরূপ কোন প্লেট ব্যবহার করিতে হইবে।

ডার্করুমে অন্ততঃ দুইটি জানালা থাকিলে ভাল হয় ও এই জানালাতে লাল কাচ দিয়া দিতে হয়। প্রয়োজন মত জানালা খুলিলে যেন আলো ও বাতাস ঘরে আসিতে পারে। দরজার পাশ দিয়া আলো আসিলে তাহার উপর পেষ্টবোর্ড মারিয়া দিলে চলে। ঘরের মধ্যে বাতাস গমনাগমনের ভাল উপায় রাখা দরকার; কেননা অনেক সময়

ঘরের ভিতর বেশীক্ষণ থাকার প্রয়োজন হইতে পারে। সেজন্য ঘরের উপরের দিকে কতকগুলি ৩ ইঞ্চি পরিমাণে ছিদ্র করা প্রয়োজন ও ঘরের নিচের দিকেও কতকগুলি ছিদ্রের প্রয়োজন। উপরের ছিদ্র দিয়া দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে ও নিচের ছিদ্র দিয়া ভাল বায়ু আসিবে। কিন্তু ছিদ্র করিলে ঘরে সাদা আলো আসিবে, কাজেই তাহা বন্ধ করিবার জন্য টিনের তিনবার বেঁকান চোঙ্গ করা প্রয়োজন।

ইহার একটা দিক ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আঁটিয়া দিলেই হইবে। ইহার ভিতর দিকটাতে কাল রঙ্ লাগাইতে হইবে কিন্তু এই রঙ্ যেন চিক্‌চিকে না হয় তাহা হইলে ঘরে সাদা আলো যাইবে।

একখানি টেবিল দরকার ; পাছে কোন জিনিষ হঠাৎ টেবিল হইতে পড়িয়া যায়। সেজন্য তাহার চারিধারে উঁচু করিয়া পাতলা কাঠ মারিয়া দিতে হইবে, ইহার উপরটা দস্তার একখানা পাত দিয়া মুড়িয়া দিলে ভাল হয় কেননা নানারকম এসিড ও ঔষধাদি পড়িয়া টেবিলের কাঠ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। জল বাহিরে যাইবার জন্য একটা নল থাকা চাই। এই টেবিল খানি লাল কাচ দেওয়া জানালার সম্মুখে বসাইলে বেশ সুবিধা হয় ; কিন্তু প্লেট ডেভলপ্ করিবার সময় যেন প্লেটের উপর লাল আলো না পড়ে। টেবিলটি যেন সমভাবে বসান হয়, কোন দিক উঁচু নিচু না থাকে। তৎপরে ঘরের বাহিরে কিম্বা যায়গা থাকিলে ঘরের ভিতরে একটা জল রাখিবার বড় টব থাকা চাই ইহা উপরে বসাইয়া দিলে ঠিক টেবিলের উপর যেন নল দিয়া জল পড়িতে পারে।

রুবি ল্যাম্পটি যেন তেলে জলিবার বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। গ্যাস থাকিলে আরও ভাল হয়। রুবি ল্যাম্পের আলোর তেজ এরূপ হওয়া চাই যেন ল্যাম্প হইতে একফুট তফাতে সংবাদ পত্র পড়িতে পারা যায়।

ডার্করুমের সব বন্দোবস্ত ঠিক হইলে নিম্নলিখিত জিনিবগুলির প্রয়োজন।

মেজার গ্লাস—দশ আউন্সের একটা।
ঐ —তিন আউন্সের একটা।
মিনিম গ্লাস— একটা।
নিক্তি—একজোড়া।

চারিখানি পোর্সিলেন ডিস (পোর্সিলেন ডিস পরিষ্কার করা অতি সহজ।

বড় ডিস বা প্লেট ও পেপার ধুইবার সরঞ্জাম। প্রিন্টিং ফ্রেম একটা। প্রয়েজেনীয় ঔষধাদির কথা পরে লিখিব।

ড্রাই প্লেট।

রৌপ্যের ব্রোমাইড ও জিলাটিন নামক এক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া কাচের উপর সমান ভাবে লাগান থাকে ইহাকে ড্রাই প্লেট বলে। এই মিশ্রিত পদার্থে আলোক লাগিলে একটুতেই এক রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, সেজন্য প্লেট ডার্করুমে খুলিতে হয়। ড্রাই প্লেট নানাপ্রকারের আছে কোনটাতে ক্যামেরার লেন্স দ্বারা প্রতিফলিত আলো অল্প লাগিলেই ছবি উঠে এবং কোনটাতে আলো অনেকক্ষণ লাগিলে ছবি উঠে। দৃশ্য ও গৃহের ছবি তুলিতে স্লো প্লেট বা যে প্লেটে আলো বেশীক্ষণ লাগাইতে হয় তাহাই ব্যবহার করা উচিত। প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে র‍্যাপিড্ প্লেট বা যে প্লেটে কম আলো লাগিলে ছবি উঠে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। গতিশীল কোন জিনিষ বা ছোট ছেলে যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না তাহাদের ছবি তুলিতে খুব শীঘ্র ছবি তোলা যায় এরূপ প্লেট ব্যবহার করিতে হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে স্লো প্লেট ব্যবহার করাই ভাল কারণ এই প্লেটে কাজ করিবার খুব সুবিধা এবং প্রথমে অন্য প্লেট অপেক্ষা ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল দিবে। ক্রমে উন্নতি করিতে পারিলে ও সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলে

র‍্যাপিড্ প্লেট ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। ব্যবহার করিবার জন্ত প্লেট-গুলি ডার্কশ্লাইডে ভরিয়া লইতে হয় তজ্জন্য ডার্করুমে যাওয়া প্রয়োজন। ডার্করুমে গিয়া ডার্ক শ্লাইড খুলিয়া, প্লেটের বাক্স খুলিয়া প্লেট বাহির করিতে হয়। যে কোন প্রস্তুতকারকের হউক না কেন প্রায়ই দেখা যায় যে চারিখানা করিয়া প্লেট একসঙ্গে জড়ান আছে। দুইখানা, প্লেটের ফিল্‌মের দিক মুখামুখি করিয়া থাকে। যে কোন প্রস্তুত কারকের প্লেট হউক না সকলেরই প্লেটে ফিল্‌ম্ মুখামুখি করিয়া মোড়া থাকে। সেজন্য মোড়ক খুলিলে সকলের উপর প্লেটের ফিল্‌ম্ নিচের দিকে থাকিবে এবং ঠিক তাহার নিচের প্লেটের ফিলম্ উপরের দিকে থাকিবে। এজন্য রুবিল্যাম্প জ্বালিবার কোন প্রয়োজন নাই।
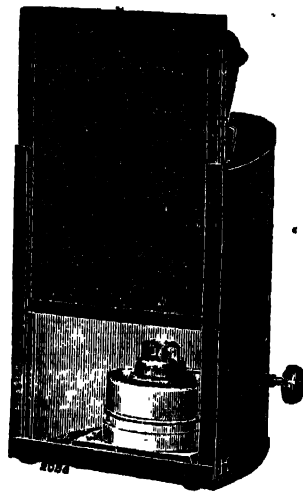
অন্য প্রকার রুবি ল্যাম্প।

ফিল্‌ম্ কোন দিকে আছে তাহা জানিবার আর এক উপায় আছে; যে দিকে কাচ আছে সে দিকে আঙুল দিলে কেমন তৈলাক্ত বোধ হয় কিন্তু যে দিকে ফিল্‌ম্ আছে সে দিকে আঙুল দিলে বেশ শুষ্ক বোধ হয় কিম্বা নখ দিয়া ঘষিলে কাচের দিকে পিছ্‌লাইয়া যায় কিন্তু ফিল্‌মের দিক পিছ্‌লায় না। যদি ইহাতেও ফিল্‌ম্ কোন দিকে তাহা

টের না পাওয়া যায় তাহা হইলে অগত্যা রুবি ল্যাম্পের আলোতে পরীক্ষা করিতে হইবে। কাচের দিকটাতে আলো পড়িলে চক্‌চক্‌ করে কিন্তু ফিলমের দিকে তত চক্‌চক্‌ করে না। কিন্তু ড্রাই প্লেট লাল আলোর কাছে যত না লইয়া যাওয়া যায় ততই ভাল কারণ ফগ্‌ড্‌ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ফিল্‌মেও হাত না দেওয়া ভাল কেননা আঙুলের দাগ লাগিতে পারে তাহাতে ছবি বড় বিশ্রী দেখায়। সে জন্য প্রথমোক্ত রূপে ফিল্‌ম্‌ কোন দিকে তাহা ঠিক করা ভাল।

কোন দিকে ফিল্‌ম্‌ আছে তাহা ঠিক করিয়া লইয়া, যেদিকে শ্লাইড টানিয়া উপরে উঠাইতে হয় সেই দিকে ফিল্‌মের দিক দিয়া প্লেট পরাইয়া দিতে হয় অর্থাৎ ডার্কশ্লাইড ক্যামেরাতে বসাইয়া দিলে ফিল্‌মের উপর যেন ছবি প্রতিফলিত হইয়া পড়ে'। যদি বইয়ের মতন ডার্কশ্লাইড থাকে তাহা হইলে দুইখানা প্লেটের মধ্যে একখানা কাল কার্ড লাগাইয়া দিতে হয় তাহা না দিলে এক প্লেটের প্রতিফলিত ছবি অন্য প্লেটে লাগিতে পারে। প্লেট ভরিবার পূর্ব্বে প্লেট খানি হইতে ধুলা ঝাড়িয়া লইতে হয়। ধুলা বুরুস দিয়া আস্তে ঝাড়িলেই ভাল হয় কারণ যদি রেশম বা পশমের কোন দ্রব্য দিয়া ঝাড়া যায় তাহা হইলে পশমের দ্রব্য ফিলমের গায়ে লাগিয়া তাড়িৎ উৎপন্ন হয়, সেজন্য ধুলা না গিয়া বরং আরও ধুলা লাগিয়া যায়। আর এক উপায়ে ধুলা ঝাড়া যায়,—টেবিলের উপর প্লেট খানি আস্তে ঘা দিলে ধুলা পড়িয়া যায়।

তাহার পর, ডার্কশ্লাইড বন্দ করিয়া কাল কাপড়ে মুড়িয়া লইতে হয়, কেননা যত সাবধান হওয়া যায় ততই ভাল। ডার্কশ্লাইড বন্ধ করিয়া বাকি প্লেটগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া তবে ডার্করুম হইতে বাহির হইতে হয়। প্লেট গুলি কোন কারণেই স্যাঁতসেঁতে যায়গা বা অবিশুদ্ধ বায়ু যেখানে সেস্থানে, কিম্বা খুব গরম যায়গাতে যেন না রাখা হয়। এরূপ করিলে প্লেট খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্লেট খুব সযত্নে, রাখিলেও বেশীদিন ভাল রাখা যায় না সেজন্য প্লেট ক্রয় করিবার সময় দেখিয়া লইতে হয় প্লেট নূতন কিনা।

বড় মাপের ক্যামেরা থাকিলে তাহাতে ক্যারিয়ার বা ছোট প্লেট লাগাইবার ব্যবস্থা পাওয়া যায় তাহা লাগাইয়া ছোট প্লেট ব্যবহার করিতে পারা যায়। যথা ½ বা ফুল সাইজের ক্যামেরা থাকিলে তাহাতে ক্যারিয়ার লাগাইয়া ½ প্লেট ও ¼ প্লেট ছবি ও তোলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ প্লেট ভাল বাসেন না কারণ হাত হইতে পড়িয়া গেলে ভাঙ্গিয়া যায় ও বিদেশে যাইতে হইলে অনেক সময় পাঁচ, দশ ডজন প্লেট লইয়া যাইতে হইলে বড় ভারী হইয়া পড়ে কিন্তু ফিল্‌ম্ হইলে এসব হয় না। কাচের পরিবর্ত্তে সেলুলয়েড নামক এক প্রকার পদার্থের উপর রোপা ব্রোমাইডও জিলাটিন মিশ্রিত পদার্থের সমভাবে প্রলেপ থাকে, সোজা কথায় ইহাকে ফিল্‌ম্ বলে। প্লেটের মতনই ফিল্‌ম্ ব্যবহার করা যায়।
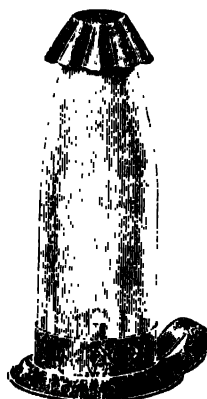
হক বটল রুবি ল্যাম্প; ইহা মোম বাতীতে জ্বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্থো-ক্রোম্যাটিক নামে এক প্রকার প্লেট হইয়াছে। ইহার গুণ এই যে সর্ব্বপ্রকার রঙের তারতম্য সাধারণ প্লেটে বুঝা যায় না কিন্তু এই প্লেটে তাহা টের পাওয়া যায়। বেগুণি কিম্বা নীল রঙের রশ্মিগুলি সাধারণ প্লেটে শীঘ্র কার্য্য করে সেজন্য এই দুই রঙ নিগেটিভে কাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং সবুজ রঙ ফিকা কাল

বা প্রায় সাদা ও লাল রঙের যায়গাতে সাদা বা খালি কাঁচ দেখা যায়। কিন্তু এই নূতন প্রকার প্লেটে নিল, হরিদ্রা, সবুজ ও লাল রঙের তারতম্য বেশ বুঝা যায় এবং সেই সেই স্থানে কাল রঙের গাড়তার তারতম্য হয় ও ছবি আরও সুন্দর দেখায়। দৃশ্য তুলিতে হইলে এই প্রকার প্লেট ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।

ডার্করুম থাকিলে যখন তখন ডার্কশ্লাইডে প্লেট ভরা যায় ও ডিভলপ্ করা যায় কিন্তু তাহা না থাকিলে রাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় ও তখন ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হয়। তবে দিনের বেলায় প্লেট ভরিবার জন্য চেঞ্জিং ব্যাগ বা প্লেট বদলাইবার থলিয়া পাওয়া যায় ইহার এক দিক দিয়া ডার্কশ্লাইড ঢুকাইয়া দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়, আর এক পার্শ্বে হাত ঢুকাইবার জন্য দুইটি ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া হাত দিয়া স্পর্শ দ্বারা ফিল্ম্ কোন দিকে আছে, তাহা ঠিক করিয়া ডার্কশ্লাইডে প্লেট পুরিতে হয়। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে। যদি কখন খুব দূরে গিয়া অনেকগুলি ছবি তুলিতে হয় তখন একস্পোজ্ড বা ব্যবহৃত প্লেট গুলি বদলাইয়া নূতন প্লেট ডার্ক শ্লাইডে ভরিয়া দেওয়া যায়। এ জন্য ডার্করুম না থাকিলে ও বিদেশ যাইতে হইলে ইহার একটি সঙ্গে রাখিলে বড় কাজে আসে।

ইংরাজির বাংলা ব্যাখ্যা।

ফগ্ড্—এক্স্পোজ্ না করা বা এক্স্পোজ্ করা প্লেটে যদি কখন সামান্য আলো লাগে বা খারাপ রুবিল্যাম্পের লাল কাচের ভিতর দিয়া কার্য্যকরী রশ্মি লাগিয়া যদি প্লেটে এক প্রকার অল্প কাল আবরণ হইয়া যায় এবং তদ্বারা ঝাপ্সা হইয়া যায় তাহাকে ফগ্ড্ বলে। অবশ্য ফগ্ড্ হইয়াছে কিনা তাহা ডিভলপ্ করিলে টের পাওয়া যায়। অন্যান্য কারণেও ফগ্ড্ হয় তাহা পরে বক্তব্য।

ডেভলপ্—এক্স্পোজ করা প্লেটে রাসায়ণিক ঔষধাদির দ্বারা ছবি পরিস্ফুট করিলে ডেভলপ্ করা হয়। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বোক্ত "Calcutta Journal of Medicine" নামক মাসিক পত্রিকায় "On the Desirability of a National Institution for the Cultivation of Physical Sciences by the Natives of India" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃঃ অঃ "Indian Association for the Cultivation of Science" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কয় বৎসর এই জ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎকালিক বিদ্যোৎসাহী এবং অশেষগুণসম্পন্ন প্রজারঞ্জন ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক্তার সরকারের অমানুষিক পরিশ্রম অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ কার্য্য কুশলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে ভারতের অশেষমঙ্গলকর এই শুভ উদ্দেশ্য বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। উক্ত খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে সভার কর্তৃপক্ষগণ যদি ১০০০ হাজার পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ৫০০০ হাজার পাউণ্ডের কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে পারেন এবং সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই বৎসর কাল মাসিক অন্ততঃ ১০ পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সভার নিমিত্ত কয়েক বৎসরের জন্য একখানা বাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারে। ডাক্তার সরকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম সহকারে চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ছোট লাট বাহাদুরের নির্দ্ধারিত অর্থ সঞ্চিত হইল এবং পরবর্ত্তী জুলাইমাসে বিজ্ঞানসভা "The Indian Asso-

* ভ্রম সংশোধন।—পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের ১২ পংক্তিতে "Homeopathy for the Indian Field" না হইয়া কেবল মাত্র "Homeopathy" হইবে; অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থের নাম "Philosophy of Homeopathy."

ciation for the Cultivation of Science" আখ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় টেম্পল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার উক্ত সভায় এক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিলেন এবং ছোটলাট সাহেবও এই বিজ্ঞান মন্দিরের ভাবি মঙ্গলের জন্য, কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষরূপে যত্ন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং এই মন্দির যে ভারতের নিশ্চিত মঙ্গল দায়ক হইবে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সরকারের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। ভগবান দীন হীন, নিপতিত ভারতবাসীর জ্ঞান দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য যে মহাপুরুষকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা আজ বিশ্বস্রষ্টার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বিজ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহার সে দিনের আনন্দ অতুল, সে আনন্দে স্বার্থ দ্বেষ হিংসার লেশ মাত্র ছিল না; সেরূপ পবিত্র আনন্দের অনুমান করিবার আমরা উপযুক্ত পাত্রও নহি। সেই দিন হইতে এই বিজ্ঞান সভা দেশে জ্ঞান বিস্তার করিয়া আসিতেছে, এবং আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার সরকারই সর্ব্ব প্রথমে দেশবাসীকে বিজ্ঞানের পথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং বোধ হয় ডাক্তার সরকারের ন্যায় লোক ব্যতীত কেহই এরূপ সভার কল্পনা করিতে পারিতেন না; এবং কল্পনা করিলেও এরূপে কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেন না। প্রায় ৪০ বৎসর পুর্ব্বে তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে বিজ্ঞানের সবিস্তার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। স্বদেশের হীনতায় তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইত, তাই তিনি বিজ্ঞান সভার জন্য তাঁহার অমূল্য সময় উৎসর্গ করিয়াছিলেন; বহুকাল দারিদ্র্যের ভীষণতা সহ্য করিয়া এখন সম্পদের সুবিস্তৃত পন্থা সম্মুখে পাইয়াও অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করিলেন; স্বাস্থ্য, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি সংসারে মানবের যাহা কিছু অভিপ্রেত সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া বিজ্ঞান সভার মঙ্গলের জন্য স্বদেশের সুখের জন্য, দৃঢ় অধ্য-

বসায়ে অহোর্নিশি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই সভার জন্য তাঁহার অধ্যবসায়, উদ্যমশীলতা, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কার্য্যকুশলতা চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাঁহার হৃদয় স্বদেশের প্রকৃত কল্যান-কামনায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত; কি উপায়ে স্বল্পব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিয়া দেশের লোক শিল্পবানিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে আমরণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা তাঁহার যত্নেব সমুচিত সহানুভূতি তিনি কি দেশবাসীর নিকট পাইয়াছিলেন? বোধ হয় পান নাই, তাই তিনি সর্ব্বদাই একটা গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। ১৯০৩ খৃঃ অঃ ২৬শে নভেম্বর এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন কালে তিনি পীড়ায় শয্যা-শায়ী ছিলেন। অধিবেশন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের মধ্যে তিনি এই প্রথমবার বিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিতির জন্য তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই তাঁহার হৃদয়েব বেদনা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে:।

I have very little to tell you about our Association, and that little, I am afraid, is likely to be the last. All that I had to say, I have said on every occasion I had the pleasure of meeting you. I have only now to reiterate my conviction that if our country is to advance at all and take rank and share her responsibilities with the civilised nations of the world, it can only be by means of Science or positive knowledge of Gods' works. To this end I have given the best portion of my life, but I am sorry to leave this world with the impression that my labours have not met with the success which the end aimed at deserves. However, I do not despair of our future. My faith in

an overruling Providence has not abated an iota on account of my own ill success. I fully believe that there is a deeper design in the events that are passing than what we see on the surface. I believe everything has been ordered for good and accordingly I believe that my removal from the scene of my labours is undoubtedly necessary for the good of the Association and of our Country. Younger men should come and step in to take my place and work with more energy than I have been able to put forth.

অধুনা বিজ্ঞান সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, যে ডাক্তার সরকারের নিরাশার কোন কারণ ছিল না। কাব্য যে দেশের অস্থি মজ্জা; দর্শন যে দেশের লোকের জ্ঞানের ভিত্তি, সে দেশে বিজ্ঞানের প্রচার নূতন পদার্থ। এরূপ নূতন পদার্থে জনসাধারণের বিশ্বাস স্থাপন বাস্তবিক সময় সাপেক্ষ। ডাক্তার সরকার যে মহৎ কার্য্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপকারিতা আমরা সকলেই দিন দিন হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। ক্রমে আমাদের দ্বারাই, এই বঙ্গবাসীর দ্বারাই ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ও পরিপুষ্টি সাধিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

বিবিধ।

কলার ক্ষার।—কলার ছালে ক্ষার অনেক পরিমাণে আছে। ইহার ভস্ম জল এবং পাম তৈলের (palm oil) সহিত মিশাইলে সাবানের কার্য্য করে।

কোন দ্রবে জিলাটিন মিশ্রিত রহিয়াছে কিনা বুঝিবার উপায়।—প্রথমে সম পরিমাণ নেসলার রিএজেন্ট এবং টারটারিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া সেই দ্রবটিকে ফুটাইতে হইবে। যদি দ্রবে জিলাটীন থাকে তাহা হইলে

শীসার বর্ণের ন্যায় বর্ণ যুক্ত প্রেসিপিটেট (lead-coloured preceipitate) অধস্থ হইবে। কিন্তু গাম আবেবিক, ডেক্সট্রিন, কেনসুগার, স্যাপো-নেরিয়া এক্সট্র্যাক্ট কিম্বা লাইকোরিস থাকিলে প্রেসিপিটেট পড়িবে না। কাজেই ঐ সকল পদার্থে জিলাটিন মিশ্রিত থাকিলে, উপরোক্ত এজেণ্ট ব্যবহার করিয়া জিলাটিনের সংমিশ্রণ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। পোটাসিয়াম আইওডাইড ও মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত করিয়া নেস্‌লার রিএজেণ্ট প্রস্তত করিতে হয়। কোন দ্রবে অতি অল্প পরিমাণ য়্যামোনিয়া থাকিলেও, এই রিএজেণ্ট সংযোগে সেই দ্রব তৎক্ষণাৎ কমলালেবুর বর্ণ (orange colour) ধারণ করে।

বৃক্ষাদির উপর আর্কল্যাম্পের ক্রিয়া।—আমেরিকার অন্তর্গত মিনে-পলিসে একজন লোক লিটুস জাতীয় সবজী পুঁতিয়াছিলেন। বাগানের এক পার্শ্বে ইলেক্‌ট্রিক আর্ক ল্যাম্প লাগাইয়া ছিলেন এবং অপর পার্শ্বে আলো-কের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন প্রত্যহ সন্ধ্যা হইলেই আলো জ্বালিয়া দিতেন। পরে দেখা গেল যে যেদিকে আলো জ্বলিত সে দিকের লেটুস ৮ ইঞ্চ ও অন্য দিকে ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কেবল সূর্য্যের আলোকে বর্দ্ধিত সবজী অপেক্ষা অনেক ভারীও হইয়াছে।

এমোনিয়া দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ।—একটি কারখানায় প্রায় ৬০ গ্যালন বেনজিনে আগুন লাগিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু অর্দ্ধ গ্যালন এমোনিয়া ঢালিয়া দিতেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, যে লৌহ পাত্রে বেনজিন ছিল তাহা নষ্ট হয় নাই। ফটকিরির জল (strong solution) দ্বারাও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

ইমিটেশন আইভরি, অর্থাৎ নকল হস্তি দন্ত প্রস্তত প্রণালী।—হস্তীর সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হস্তিদন্তের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় হস্তি-দন্তের অনুরূপ কোন পদার্থের আবিষ্কার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সম্প্রতি একজন রাসায়নিক নকল হস্তিদন্ত প্রস্তত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই উপায়ে প্রস্তত হস্তিদন্ত আসল হস্তিদন্তের এত অনুরূপ যে ইহা নকল বলিয়া অনেক অভিজ্ঞেও ধরিতে পারেন না।

তিনি প্রকৃত হস্তিদন্তে যে যে উপকরণ রহিয়াছে সেই সমস্ত উপকরণ লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কষ্টিক লাইমে জল মিশ্রিত করিয়া কষ্টিক লাইমকে হাইড্রেটে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু হাইড্রেটে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ফস্‌ফরিক এসিড জলে দ্রব করিয়া ঐ কষ্টিক লাইমে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই মিশ্রণ কালের মধ্যে অতি অল্পে অল্পে কারবনেট অফ লাইম এবং এলাম দিতে হইবে ও অবশেষে জেলাটিন এবং য়্যালবুমেন জলে দ্রব করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। এই মিশ্রণ যেন সম্পূর্ণ নমনীয় থাকে ও পদার্থগুলি যাহাতে অতি উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পরে সম্পূর্ণ এক দিন ঐ মিশ্রিত পদার্থ খোলা বাতাসে ফেলিয়া রাখা আবশ্যক; কেননা এই সময়ের মধ্যেই ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত কারবনেট অফ লাইমের রাসায়নিক ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে। তাহার পর সেই পদার্থকে ছুরির বাট, বিলিয়ার্ড বল, বা অন্য কোন ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া ৩১২ ডিগ্রি ফারন্‌হাইট অর্থাৎ ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। চারি সপ্তাহের পর উক্ত পদার্থ কঠিন হইয়া হস্তি দন্তের সমতুল্য হইবে। উপরোক্ত উপকরণ তিনি নিম্নলিখিত অনুপাতে লইয়াছেন :—

কারবনেট অফ লাইম		১০০
জল		৩০০
জলে দ্রব ফসফরিক এসিড (যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১-০৫)		৭৫
কারবনেট অফ ক্যালসিয়াম		১৬
ম্যাগনেসিয়া	১ হইতে	২
এলাম (alum)		৫
জেলাটিন		১৫

ইহাকে ইচ্ছানুরূপ বর্ণে রঞ্জিত করা যাইতে পারে।

নিয়মাবলী।

"বিজ্ঞান দর্পণ" বিজ্ঞান সভার অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত হারাধন রায় এম, এ, এফ্, সি, এস্ সম্পাদিত এবং ছাত্রগণ পরিচালিত বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্র।

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা।

বিজ্ঞান দর্পণে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা মাসের ২০সে তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিনিময় পত্র, চিঠি এবং মূল্য প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হারের নিমিত্ত পত্র লিখিতে হইবে।

২১০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ "বিজ্ঞান দর্পণ।

১ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, মে ১৯০৯। [৫ম সংখ্যা।

সৌর-শক্তি।

প্রাচীন জাতিগণ জাতীয়তাব হিসাবে কতটুকু উচ্চ ছিলেন, সে সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু কবিত্ব গৌরবে তথনকাব প্রায় প্রত্যেক জাতিই অধুনা সমস্ত সভ্য জাতি অপেক্ষা অনেক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও প্রকৃতিব অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা সমূহ সমস্তই কবিতায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তবে সেই সমস্ত ক্রিয়া বা ক্ষমতার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন নাই বলিয়াই হউক, অথবা গল্পচ্ছলে বিবৃত হইলে স্মবণ করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই হউক, তাঁহারা প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও ক্ষমতা গুলিকে উপাখ্যানের আবরণে ঢাকিয়া অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সূর্য্যেব ক্ষমতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া অথবা যে স্থানে সূর্য্য কিবণ লম্ব ভাবে পতিত হয়, সেই স্থানের অধিবাসীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিবরণ বলিতে যাইয়া এবং সূর্য্যের দৈনিক গতির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়া-

ছেন। এক মহীয়ণীশক্তিসম্পন্ন দেবতাই সূর্য্য। তিনি তেজঃপূর্ণ, তাঁহার মুকুটের জ্যোতিঃই কিরণ, তাঁহার কেশকলাপ সুবর্ণ উদ্ভূত। তিনি এক সুবর্ণ নির্ম্মিত অমূল্য রথে উপবেশন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব সাগর হইতে ভ্রমণ হেতু যাত্রা কবিতেন। এই পূর্ব্বসাগব তীবে ইথিওপিয়ানগণ বাস করিত; সমস্ত দিন আকাশ পবিভ্রমণ করতঃ সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সময় পশ্চিম সাগবে অবতরণ কবিতেন; এবং পশ্চিম সমুদ্র হইতে এক মনোহব তরণীযোগে পৃথিবীর উত্তব সমুদ্র দিয়া রজনীর মধ্যেই পুনরায় পূর্ব্ব সাগর তীরে উপনীত হইতেন; এবং পুনরায় গত দিনের ন্যায় কার্য্য আরম্ভ করিতেন। কোন সময়ে তাঁহাব প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র ফিটন তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার প্রার্থনা বিফল হইল না। ফিটন রথে বসিয়াই অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন, কিন্তু বালক সেই অগ্নিপুঞ্জসমপ্রভ অশ্বের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যের রথ দ্রুত নীচে নামিতে লাগিল। পর্ব্বতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; নদী, সমুদ্র বিশুষ্ক হইয়া গেল; সমস্ত লাইবিয়া প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইল, এবং সমস্ত ইথিওপিয়ানজাতিব চর্ম্ম সূর্য্যেব দারুণ উত্তাপে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। আজও পর্য্যন্ত ইথিওপিয়ান কৃষ্ণকায়, লাইবিয়া মরুভূমি।

বৈজ্ঞানিক ক্রমাগত যেরূপ উন্নতিমার্গে আবোহণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, এমন দিন আসিবে, যে দিনে বাস্তবিকই কেহ না কেহ সূর্য্যের রথযোজিত অগ্নিপ্রভ অশ্বেব গতি সংযত করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া লইবেন। বিজ্ঞান পৌরাণিক উপাখ্যানকে সত্য ইতিহাস করিয়া তুলিবে। আজ কাল ইঞ্জিনিয়াবগণ, কিরূপে সূর্য্যের শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিবেন তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। ইঞ্জিনিয়ার অশ্বের বল্গা ধারণ করিলে মানুষ কৃষ্ণকায় হইবে না, পাহাড় পুড়িয়া যাইবে না, সমুদ্রও শাহারায় পরিণত হইবে না। আমাদের সমস্ত ক্ষমতার আধার কি?—সূর্য্য। সূর্য্য ব্যতিরেকে আমাদের পৃথিবী নির্জীব নিশ্চল ছারখার হইয়া যাইত। ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরিভাগ প্রতি বর্গ গজ স্থানে দুই অশ্ব পরিমিত ক্ষমতা

প্রাপ্ত হইতেছে। তবে সেই ক্ষমতা অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া আসিতে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলেও অবশিষ্ট অংশ এক অশ্ব পরিমিত ক্ষমতা অপেক্ষা অল্প নহে। এক অশ্ব পরিমিত ক্ষমতার অর্থ কি?—যে ক্ষমতা ৩৩০০০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ চারিশত মনেরও বেশী ভার এক মিনিটে এক ফুট তুলিতে পারে তাহাই এক অশ্ব পরিমিত ক্ষমতা। যতক্ষণ সূর্য্যের কিরণ থাকে, পৃথিবীর উপরিভাগ ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু এই ক্ষমতার দ্বারা আমরা কোন কাজ করাইয়া লইতে পারিতেছিনা। এই অমীত শক্তি, ধরিতে গেলে একরূপ বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিরূপে এই স্বাভাবিক ক্ষমতার দ্বারা কল পরিচালিত হইতে পারে, মানবের কাজ সংসাধিত হইতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার কিরূপে এই শক্তি প্রভাবে এঞ্জিন, মোটর, চালাইয়া লইতে পারেন, কিরূপে এই শক্তি আমাদের শত শত আয়াসসাধ্য কার্য্য অনায়াসসাধ্য করিয়া তুলিতে পারে, তাহারই ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে। এই সূর্য্যের শক্তি কি? সূর্য্যের এই শক্তির নাম উত্তাপ। এই উত্তাপকে যন্ত্র পরিচালন ক্ষমতায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই যন্ত্র তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করিবে। সূর্য্যের উত্তাপে যেরূপ যন্ত্র পরিচালিত হইবে, তাহার একরূপ মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই উপায়ে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে অধুনা তত ফল হইবে না, কিন্তু যখন একবার এ সম্বন্ধে চেষ্টা হইতেছে, তখন আজ না হউক ৫০০ শত বৎসর পরেও সেই যন্ত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে। আমরা তখন জীবিত থাকিব না, আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের সময়ে পৃথিবীস্থ যাবতীয় কল কারখানা হয়ত সূর্য্যের শক্তিতেই পরিচালিত হইবে; এবং সেইদিন বাস্তবিকই মানব সূর্য্যের ক্ষমতা সংযত করিতে পারিবে।

শ্রীসত্য রঞ্জন সেন, বি, এ।

মানব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবনের প্রথম-মূল উপাদান হইতে ডিম্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে পক্ষীর পুরুষানুক্রমিক প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম এবং কার্য্যগুলি প্রচ্ছন্ন সন্নিবিষ্ট থাকে; এবং শাবকও সেই সমস্ত প্রবৃত্তি লাভ করিয়া এবং ঠিক যেন পূর্ব্ব-পুরুষের কার্য্যাবলীর স্মৃতি পরিচালিত হইয়া, নিজ জাতীয়তার গণ্ডী হইতে বাহির হইতে পারে না, কেননা জাতীয়তা হইতে পৃথক হইবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। অবশ্য এরূপ উক্তি বাস্তবিকই সমালোচনার যোগ্য এবং কোন কোন বিষয়ে যুক্তি পূর্ণ নাও হইতে পারে; বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। ডিম্বে পক্ষী জাতির প্রবৃত্তি বা ধর্ম্ম সন্নিবিষ্ট থাকে বটে কিন্তু শাবকে এবং শাবকের দৈহিক গঠন বিবর্ত্তনশীল কার্য্যপরম্পরা সম্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ডিম্বে পক্ষ, পদ, বা দৈহিক অন্য কিছুর কোন চিহ্ন থাকে না; কেবল জীবন গঠিত হইতে পারে এরূপ শক্তি বা কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই সন্নিবিষ্ট থাকে; তাহাই উপযুক্ত অবসরে, এবং উপযুক্ত অবস্থায় ডিম্বের পীত অংশকে পরিবর্ত্তন করিয়া, শাবকের পক্ষ, পদ, চক্ষু প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া ফেলে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে পক্ষীর দৈহিক উৎপত্তি কতকগুলি বিশেষ উপাদানের উপর বাহিক বা নৈসর্গিক ক্রিয়ার প্রভাব সম্ভূত।

প্রাকৃতিক অবস্থাই জড় পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ উদ্ভাবন করিয়াছে, বা নৈসর্গিক ক্রিয়ারই পরস্পর সংমিশ্রণে জীব সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অভিমতই যদি বিজ্ঞান সম্মত হয়, অথবা এইরূপ মতের উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা জন্তুর ধর্ম্ম পরীক্ষা করি, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সমস্ত গুণ মানবকে মানব পদ বাচ্য করিয়াছে, সেই সমস্ত গুণ মানবের আদি পুরুষে, অথবা পশু তুল্য অতি প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষে কখনই প্রচ্ছন্ন সন্নিবিষ্ট ছিল না। অধুনা পৃথিবীর মধ্যে

মানবই শ্রেষ্ঠ; আবার মানবও একবারে সৃষ্ট হয় নাই; প্রথম সৃষ্ট জীব ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিয়া মানব হইয়াছে; কাজেই মানব হীন তর জীবের বুদ্ধিরও অধিকারী হইয়াছে; এমন কি এখনও মানব হইতে অনেক পাশব প্রকৃতি নষ্ট হয় নাই; তবে বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্রমাগত পরি-মার্জ্জিত হইতেছে বলিয়া, এবং সু ও কুর ফলাফল দৃষ্টি করিয়া মানব ক্রমাগতই পশু প্রবৃত্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে শিখিতেছে। কিন্তু যতই উন্নতি করি না কেন, আমরা পশু প্রবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; এবং ইতর জীবের অবস্থা কালীন লব্ধ জ্ঞান হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।

মানবের বর্ত্তমান পরিমার্জ্জিত জ্ঞান বুদ্ধির মূল কি? মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিই মানবের পরিমার্জ্জিত জ্ঞান বুদ্ধির মূল; ভাষাই আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে। গুণ বাচক শব্দের জ্ঞান অথবা কোন গুণ বা ধর্ম্মের জ্ঞান ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; কেননা কোন গুণ সেই গুণ-বিশিষ্ট কোন পদার্থে সংযোগ করিয়া সেই গুণের ধারণা করিয়া লইতে পারি। কোন পদার্থের নাম করিলে সেই জাতীয় সমস্ত পদার্থ তৎক্ষণাৎ মনে উদয় হয়, কাজেই বিশেষ কোন পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ, অথবা এক জাতীয় কোন পদার্থের বিশেষ বা বিভিন্ন অংশ টুকু পৃথক করিয়া লইতে পারি। এইরূপ নাম করণে, এইরূপ বিভিন্ন করণে, আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধি উন্নতির অভিলাষ যাহা কিছু সমস্তই রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম গুলিই প্রকৃতির সমরূপতার বা একভাববত্তার কারণ। সেই নিয়ম গুলি সম্মিলিত হইয়া নৈসর্গিক ব্যাপার পরিচালন করিতেছে; সৃষ্টির যত কিছু বিস্ময়কর ঘটনা, আবহমান কাল সেই নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে। অথবা সেই নিয়মগুলিই বিশ্বকর্ত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইতেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদ্ভূত প্রকৃতির একভাববত্তার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টাই পরিমার্জ্জিতজ্ঞানবুদ্ধির কার্য্য স্থল; আমরা যখনই কোন প্রাকৃতিক নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করি, এবং সেই নিয়ম সমস্ত পদার্থেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে বুঝিতে পারি, তখন আমরা

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়ি, এবং আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে আমাদিগকে ক্রমাগতই উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টি কুশলতা আমাদের জ্ঞান চৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক অবস্থাতে জীবিত থাকিবার উপযোগিতাই পশু জগতের বিবর্ত্তন। মেরু দেশস্থ ভল্লুক চর্ম্মে, কার্য্যে, প্রবৃত্তিতে এবং আবাসের প্রণালীতে সেই দেশেরই উপযোগী; ম্যাডেরিয়ার কীট পতঙ্গাদি স্বাভাবিক অবস্থার জন্য, প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই, পক্ষহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শারীরিক ক্ষমতাবান অথবা যাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাই যে জীবিত থাকিবে তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই; যে পশু, সেই বিশেষ স্থানে জীবিত থাকিবার উপযোগী, তৎভিন্ন, সমস্তই নষ্ট হইবে। যে সমস্ত পক্ষী বা পতঙ্গ অনায়াসে উড়িতে পারে, অথবা যাহারা অন্যত্র বায়ুর বেগ সহ্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ধারণ করে, তাহারা কখনই কোন ক্ষুদ্র দ্বীপে জীবিত থাকিতে পারে না। সেখানকার প্রবল বায়ু বেগ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সমুদ্রগর্ভে পাতিত করিবে। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা বলহীন পতঙ্গ বা পক্ষীই দ্বীপের উপযুক্ত অধিকারী; তাহারা অন্য পক্ষী জাতি অপেক্ষা একটা গুণ হীন হইয়াও জীবিত থাকিবে।

ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়; যে কখন কখনও মানব সমাজ একবারে অধঃপতিত হইয়া নষ্ট হয়; পাপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; ব্যভিচারে, অত্যাচারে দেশ পূর্ণ হইয়া যায়; ধর্ম্ম-প্রাণ মানব একে একে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; তবুও দেশ মানব শূন্য হয় না। অবশ্য যে জাতি এরূপ অবস্থায় নীত হইয়াছে, সে জাতির জাতীয়তা নাশ অবশ্যম্ভাবী; ধর্ম্ম-প্রাণ অন্য জাতি আসিয়া সে দেশ অধিকার করে, এবং ক্রমে ক্রমে নিজ ধর্ম্ম বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত করিয়া অধঃপতিত জাতির উন্নতি সাধন করে। অনেক জাতির এরূপ সৌভাগ্য উদয় না হওয়ায় পৃথিবী হইতে তাহাদের নাম একবারে বিলুপ্ত

হইয়াছে। প্রকৃতিতে জীবিত থাকিবার জন্য পশু উপযোগী হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে বলিয়া তাহাদের অসামঞ্জস্য হেতু কখন কখনও মানব অধঃ পতনেরও উপযোগী হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বস্ত্রে আলোক চিত্র।

বস্ত্রে ফটো তুলিতে পারা যায়, ইহা বাস্তবিকই অনেকের নিকট নূতন। অবশ্য ফটো তোলা যায় বটে কিন্তু যে উপায়ে ফটো তুলিতে হয়, তাহা বড়ই কষ্ট সাধ্য। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বে যে উপায়ে ছবি তোলা হইত, তাহাতে খরচ বড় অল্প হইত না। সাটীন কাপড়েই অতি সুন্দর ছবি তোলা যায়। অবশ্য ভাল মসলিনেও ছবি মন্দ হয় না। মসলিনে ছবি তুলিতে হইলে প্রথমতঃ গরম জলে রীতিমত ধুইয়া লইতে হয়। একবার ধুইলে প্রায়ই ভাল হয় না বলিয়া অন্ততঃ ১০।১২ বার ধুইয়া লইতে হয়; দেখিতে হইবে মসলিনের গায়ে কোন রূপ মাড় অথবা মসলিন যেন প্রথমের ন্যায় শক্ত না থাকে। অবশেষে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইতে হইবে। ইস্ত্রিতে যেন ধুলা বা কাদা কিছু না লাগিয়া থাকে। ধোবারা যাহাতে ইস্ত্রি করে, তাহাতেই ইস্ত্রি খুব ভাল হয়। সাধারণ ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট যেমন করিয়া করিতে হয়, যে কোন কাপড়েও সেইরূপে ছবি এনলার্জমেণ্ট করা যায়। সুবিধা মত দিনের আলোক অথবা আর্ক ল্যাম্প লইলেই চলিতে পারে। অবশ্য আর্ক ল্যাম্পই ভাল, কেননা, আর্ক ল্যাম্প ব্যবহার করিলে আলোকের তীব্রতা কত টুকু, আলো কত জোরে জ্বলিতেছে, তাহা সহজেই পরিমাণ করা যয়; অথবা পুর্ব্ব হইতেই জানা থাকে।

কাপড় প্রথমে কি উপায়ে ছবি উঠাইবার উপযোগী করিয়া লইতে হয়।

আইওডাইড় অফ এমোনিয়াম	১ আউন্স
ব্রোমাইড অফ এমোনিয়াম	৩ ,,
,, ,, ক্যাডমিয়াম	১ ,,
ডিষ্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার	২৪০ ,,

একটি আলাদা কাঁচের চিনা মাটীর কিম্বা এনামেলের পাত্রে উপরোক্ত পদার্থ গুলি ঢালিয়া দিতে হয়। যখন পদার্থ গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে যে কাপড়ে ছবি তুলিতে হইবে, তাহা ফেলিয়া দিতে হয়। দুই এক মিনিট জোর তিন মিনিট কাল পরে কাপড়টি একটা কাঁচের রড দ্বারা তুলিয়া একটা কাঁচের রডের ছোট আনলায় মেলিয়া দিতে হয়। পরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে যে ঘরে আদৌ ধূলা নাই, এরূপ ঘরে শুকাইতে দিতে হয়, সেই ঘরের উত্তাপ যেন ৬০ ডিগ্রি ফারনহাইট হইতে ৮০ ডিগ্রি ফারনহাইটের মধ্যে থাকে। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইলে এই কাপড়কে সেন্সেটাইজড্‌ করিতে হইবে।

সেন্সেটাইজড্‌ করিবার পদার্থের তালিকা।

সিলভার নাইট্রেট	৫ আউন্স।
সাইট্রিক এসিড (দানাদার)	১ ,,
ডিষ্টিল্‌ড্‌ জল	১৪০ ,,

ইহার জন্য অন্য একটি পাত্র রাখিতে হইবে। সে পাত্র যেন বেশ পরিষ্কার হয় এবং কাচ, এনামেল, পোর্শিলেন বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। প্রথমে পাত্রটি ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় ডিষ্টিল্‌ড্‌ জল দিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। পরে উপরোক্ত তিনটি পদার্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক ফটোগ্রাফারাই জানেন যে, সেন্‌সেটাইজড্‌ করিতে হইলে অন্ধকার ঘরে রুবি ল্যাম্প জ্বালাইয়া কাজ করিতে হয়। কাজেই ঐ পদার্থ গুলি একত্রে মিশাইবার সময়েও অন্ধকার ঘরে রুবি আলো জ্বালিয়া করিতে হইবে। মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে সেন্‌সেটাইজিং সলিউসন বলে। পরে সেই কাপড়

খানি লইয়া এই সলিউসনে ফেলিয়া দিতে হইবে। সেই সলিউসনে একটি কাচের রড রাখিয়া তাহার উপর দিয়া কাপড়টি আস্তে আস্তে টানিলে কাপড় খানি সকল যায়গায় সমান পরিমাণে সেন্সেটাইজড্ হয়। দুই মিনিট পরে সেই কাপড় খানি চারিটি কাষ্ঠের চিমটা দ্বারা বেশ করিয়া টানিয়া শুকাইতে দিতে হয়, কাপড় যেন কোন যায়গায় গুটাইয়া না থাকে, কিম্বা কাপড়ে কোনরূপে ভাঁজ না পড়ে। সেই কাঠের চিমটা গুলিতে গালার বার্ণিশ লাগাইয়া দিতে হয়, এরূপ করিলে, যে যায়গা চিমটা ধরিবে, সেই যায়গা পূর্ব্বের ন্যায়ই সেন্সেটাইজড্ থাকিবে। শুকাইয়া যাইলে কাপড় ছবি তুলিবার উপযুক্ত হয়। সেন্সেটাইজিং সলিউসন প্রস্তুত করিবার প্রারম্ভ হইতে যতক্ষণ না কাপড়ে ছবি উঠে ততক্ষণ কাপড় অন্ধকার ঘরে রাখিতে হইবে। এই ঘরের ভিতর লোকে প্রবেশ করিতে পারিবে অথচ বস্ত্রে আলোক লাগিবে না এরূপ করিতে হইলে ঘরের দুই থাক দরজা করিতে হয়। অথবা একটা ঘরের ভিতর একটা ঘর করিয়া লইতে হয়। ভিতরের ঘরে কাপড় রাখিয়া বা শুকাইতে দিয়া ঘর বন্ধ করতঃ বাহিরের ঘর দিয়া ফাঁকে চলিয়া আসিতে হয়। কাপড়ে ছবি তুলিতে হইলে এক খানা শ্লাইডিং পর্দ্দা অতি প্রয়োজনীয়। এই পর্দ্দা ইচ্ছামত দূরে কিম্বা নিকটে আনা যায় অথবা উচ্চ কিম্বা নিম্ন করা যায়। সেই পর্দ্দায় প্রথমতঃ ছবি ফোকাস করিয়া লইয়া যেরূপ ভাবে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট করিতে হয় ঠিক সেইরূপ ভাবেই কাপড়ে এক্সপোজার দিতে হয়। আর্ক ল্যাম্পের দ্বারা ছবি তুলিতে হইলে একটা কণ্ডেন্সারের দরকার হয়। কাপড়ে ছবি তুলিতে সময়ে সময়ে ১০ মিনিট হইতে আধঘণ্টা এক্সপোজার দিতে হয়। এক্সপোজার দেওয়া হইলে পর নিম্নলিখিত ডেভলপারে কাপড় খানি ডেভলপ করিয়া লইতে হয় :—

ডেভলপার।

পাইরোগ্যালিক এসিড	১ আউন্স।
সাইট্রিক্ এসিড	১ ,,
ডিষ্টিল্ড্ জল	৬০ ,,

এই সলিউসনটিকেও একটি পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া দাও। পরে বস্ত্রখানি ইহাতে ডুবাইয়া লইবে। মাঝে মাঝে কাপড় খানি জলের মধ্য দিয়া টানিতে হইবে। এরূপ করিলে এই ডেভলপার কাপড়ের প্রত্যেক যায়গায় লাগিবে ও ছবিও পরিস্কার উঠিবে। পাত্রটি ক্রমাগত নাড়াইতে হইবে। ফটোগ্রাফার মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে ট্রেপাত্র এরূপ ভাবে না নাড়াইলে ছবি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারা যায় না। আট দশ মিনিট পরে ডেভলমেণ্ট সম্পূর্ণ হয়। পরে কাপড় খানি তুলিয়া লইয়া পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। একটা মাটীর টবের একটব জলের কম হইলে প্রায়ই ভাল হয় না। আট দশ মিনিট টবের জলে রাখিবার পর তোয়ালে নিংড়াইবার মত করিয়া কাপড় খানি নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। অবশেষে একটা চ্যাপ্টা কোন পাত্রের উপর কাপড় খানি বিছাইয়া দিয়া অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত ঘটীতে করিয়া অথবা কলের মুখে বসাইয়া দিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

এইবারে ছবির টোন (tone) করিতে হইবে।

টোনিং করিবার পদার্থের তালিকা।

বোরাক্সের গাঢ় সলিউসন	৬ আউন্স।
জল	৬০ ,,
গোল্ড ক্লোরাইড	২ গ্রেণ।

এই পদার্থ গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া যে সলিউসন প্রস্তুত হইবে, তাহাতে কাপড় খানি ২।৩ মিনিট রাখিলেই টোন করা হইয়া যাইবে।

পুনরায় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ক্ষীন হাইপোসালফাইট অফ সোডিয়ামের সলিউসনে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ইহাকে ফিক্সিংবাথ বলে; ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় রাখিতে হয়। ৫ মিনিট রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার পর অন্ধকার ঘর হইতে বাহির হইয়া রীতিমত ধৌত করিতে হইবে, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত ধুইতে হইবে ও নিংড়াইতে হইবে। এইরূপ করিবার পরে শুকাইয়া লইয়া ইস্ত্রি করিলেই কাপড় পরিষ্কার হইবে, কোন যায়গায় কুঞ্চিত হইয়া থাকিবে না। ইস্ত্রির যন্ত্র যেন খুব উত্তপ্ত না হয়। সামান্য গরম করিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে। ইস্ত্রি একবারে ঐ কাপড়ে না লাগাইয়া প্রথমে অন্য আর একখানি পরিষ্কৃত কাপড়ে উহাকে মুড়িয়া সেই মোড়া কাপড়ের উপর দিয়া ইস্ত্রি টানিলেই খুব ভাল হয়। এই উপায়ে ছবি প্রস্তুত করিলে ছবি অতি পরিষ্কার হয়। এবং ছবিকে ইচ্ছা মত বড় করা যাইতে পারে। বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিবার অতি উত্তম সামগ্রী। তদ্ভিন্ন ইহাকে কুশনের আবরণে এবং অন্যান্য সৌখিন কাজেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভূমিকম্প।

ভয়ঙ্কর ভূমি সঞ্চালনে সিসিলি দ্বীপের অন্তঃপাতী মেসিনা নগরী সম্প্রতি যে হতশ্রী হইয়াছে ইহা প্রায় অনেকেই জানেন। এই ভীষণ ভূমিকম্পে মেসিনাতে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ লোক কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে স্থানে শত শত নয়নানন্দ বৰ্দ্ধক সৌধরাজী এক কালে শিল্প বিদ্যায় মানবের অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচায়ক স্বরূপ ছিল আজ সেই সকল অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধি প্রভাবে মেসিনা পৃথিবীর মধ্যে প্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল, যে মেসিনাকে ইদানীন্তন অবস্থায় আসিতে কত অর্থ কত সামর্থ ব্যয়

হইয়াছিল, কিন্তু কি একটা অদ্ভুত ক্ষমতার বেগে মেসিনার সে গর্ব্ব সে ঐশ্বর্য্য, সে সমৃদ্ধি পলকে অন্তর্হিত হইল

ভূমিকম্পে মেসিনার ঈদৃশ দুরাবস্থা ঘটায় আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ কি নিমিত্ত ভূমিকম্প ঘটে সে তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। অবশ্য ভূমিকম্পের এক কারণ ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে যে এই অবনীর আভ্যন্তরিক উষ্ণতা প্রযুক্ত মাঝে মাঝে ভূগর্ভস্থ নানাপ্রকার ধাতু ও প্রস্তরাদি দ্রবীভূত হইয়া পরিশেষে বাস্পের আকার ধারণ করে ; সেই সকল পদার্থ ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার কালে এক প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয় ; সেই শক্তির প্রভাবে কখন কখন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কম্পিত হয়। সেই জন্য আগ্নেয়াদ্রি সন্নিহিত প্রদেশে প্রায় ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে।

ওয়ালটার ই কিভার (Walter E Keever) সম্প্রতি ভূমিকম্পের এক অভিনব কারণ নিরূপণ করিয়াছেন। যে কারণ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত কেহ কখন সে বিষয় একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন নাই। তিনি বলেন যে চন্দ্র, সূর্য্যের আকর্ষণি শক্তি এই পৃথিবীর সেণ্ট্রিফিউগ্যাল (Centrifugal) শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া যেরূপ জোয়ার ও ভাটার সৃষ্টি করে সেইরূপ তাহাদের সমবেত ক্রিয়া দ্বারা ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু সে শক্তিদিগের ক্রিয়া স্থানের উপর সকল সময় তত বুঝা যায় না যেহেতু স্থল স্বভাবত কঠিন। তবে স্থলদেশে সকল শক্তির সমবেত ক্রিয়া ক্রমাগত সম্পাদিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তাহাদের কাঠিণ্য দূর হয় এবং পরিশেষে সেই শক্তি সমূহের আতিশয্যবশতঃ স্থলদেশ শিথীল হইয়া কম্পিত হয়।

কিভার সাহেব বলিয়াছেন যে এই সমবেত আকর্ষণি শক্তির ক্রিয়া সাগরকুল সমীপস্থ স্থানে যত প্রখর স্থলদেশের মধ্যভাগে তত প্রখর নহে, তাহার কারণ এই যে স্থলদেশের মধ্যভাগ প্রত্যহ প্রচণ্ড উর্ম্মীঘাতে শৈথিল্য প্রাপ্ত হয় না।

তিনি আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটিয়া গিয়াছে প্রায়

সকলেরই centre of disturbance উত্তর latitude এর চত্বারিংশৎ parallelএর নিকট অবস্থিত। পিকীং, জাপান, সানফ্র্যানসিস্কো, মিসৌরি, চারনষ্টন, লিসবন, মেসিনা প্রভৃতি যে সকল দেশে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই উপর্য্যুক্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। পৃথিবীর এই স্থানে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণি শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর; এই কারণ বশতঃ কিভার সাহেব বলেন যে পৃথিবীর এই স্থান সন্নিহিত অপর যে সকল দেশে আজ পর্য্যন্ত তেমন ভূমিকম্প ঘটে নাই ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিতে পারে যে মেসিনা, পম্পিয়াই প্রভৃতি নগরে যেরূপ ভয়াবহ ভূকম্প ঘটিয়াছে এই সকল দেশেও সেইরূপ ভয়ঙ্কর ভূকম্প ঘটিতে পারে। তিনি পৃথিবীর উক্ত স্থান সমীপস্থ কতকগুলি দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যথায় ভূমিকম্প হইবার সম্ভাবনা অধিক।

পৃথিবীর উত্তর latitudeএ চত্বারিংশৎ parallelএর সমীপস্থ দেশে যেরূপ ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে সেইরূপ দক্ষিণ latitudeএ চত্বারিংশৎ parallelএর সমীপস্থ দেশ গুলিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে, যেহেতু পৃথিবীর এই স্থানেও চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণি শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর। কিন্তু এই সকল ভূমিকম্পের বৃত্তান্ত বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ অনেক; প্রথমতঃ দক্ষিণ latitudeএ সমুদ্রের অংশই অধিক, সুতরাং সমুদ্রের তটস্থ কোন স্থানে ভূমিকম্প ঘটিলে তাহা সহজে নিরূপণ হয় না; দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ latitudeএ উত্তর latitude অপেক্ষা লোক সংখ্যা অল্প; এবং তৃতীয়তঃ তথায় ভূমিকম্পে নষ্ট করিতে পারে এরূপ বৃহদাকার অট্টালিকার সংখ্যাও অতি অল্প। সেইজন্য তথাকার ভূমিকম্প বড় একটা কেহ ভয়াবহ বলিয়া মনে করে না। তবু উত্তর latitude অপেক্ষা দক্ষিণ latitudeএ ভূমিকম্পের সংখ্যাও অল্প এবং তাদৃশ ভয়াবহ নহে, যদি তাহা হইত তাহা হইলে নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি দেশ মেসিনার ন্যায় দুরাবস্থা প্রাপ্ত হইত।

কিভার সাহেব বলেন যে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ latitudeএ চত্বারিংশৎ parallelএর সন্নিহিত দেশের ভূমিকম্প কেবল মাত্র চন্দ্র সূর্য্যের

আকর্ষণি শক্তির দ্বারা ঘটিয়া থাকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যে সকল ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে তাহা আগ্নেয় গিরির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণি শক্তির প্রভাবে যে যে স্থানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আছে বলিয়া কিভার সাহেব মনে করেন তাহাদিগের নাম নিম্নে বর্ণিত হইল :—

পর্ত্তুগ্যালে	লিসবন।
স্পেনে	জিব্রল্টার, ভ্যালেন্সিয়া।
আফ্রিকাতে	ট্যান্ জিয়ারস্, ট্রিপোলি, আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া, কেরো।
ইতালীতে	রোম, নৈপলস্।
সার্ডিনিয়া।	
সিসিলিতে	প্যানারমো, ট্র্যাপানি।
গ্রীসে	পার্শ্ববর্ত্তী দীপপুঞ্জ।
তুরস্কদেশে	কনসট্যান্টিনোপল।
চীন দেশে	পিকীং, তিয়েনসিন, টাকু, এবং পোর্ট আর্থার।
কোরিয়াতে	সিউল।
জাপানে	নিউগাটা, আর্কিটা, মাটসুমাই, হাকোডেট, সেনডাই, টোকিও এবং ইয়াকোহামা।
আমেরিকায়	নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াসিংটন, বাল্টিমোর, রিচমণ্ড, সল্টলেকসিটি, ডেনভার, কানসাস সিটি, ইণ্ডিয়া নোপলিস, সিন সিনাটি এবং পিটস্বর্গ।

শ্রীমন্মথ লাল সরকার, বি, এ।

হীরক।

মহামূল্য পদার্থের মধ্যে হীরকই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থান কোন প্রদেশেরই নিজস্ব নহে, এবং সর্ব্বত্র একই

অবস্থায় পাওয়া যায় না। ভারতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাসিয়ান লাপলাণ্ডে, অথবা আরিজোনা সমতল ক্ষেত্রে, নানা বিভিন্ন অবস্থাপন্ন দেশে, নানারূপ অবস্থায় হীরক পাওয়া যায়। কখন কখনও নদীকুলের নুড়ীর মধ্যে, ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরীর গাত্রে, সুবর্ণরেণু স্বর্ণ বালুকা ক্ষেত্রে আকাশ নিপতিত লৌহমিশ্রিত উল্কাগর্ভে অথবা যদি আরব্য উপন্যাসের নাবিক সিন্ধবাদের উপন্যাস সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শকুনী গৃধিনী পরিবাহিত পশু অস্থিতেও হীরক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ওজনেও যেরূপ সকল সময়ে সমান নহে, সেইরূপ ইহার বর্ণও নানা প্রকার হইয়া থাকে। কখনও কখনও পরিষ্কার শ্বেত বর্ণও (প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞগণের মতে বর্ণ শূন্য হয়,) আবার কখনও কখনও পীত, লোহিত, হরিৎ ইত্যাদি বর্ণেরও আভা থাকে। মাঝে মাঝে কৃষ্ণবর্ণ হীরক খণ্ডও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে দিন হইতে গ্রীকগণ ইহার "adamas" বা অভেদ্য নাম করণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইওরোপের যাবতীয় লোক ইহার কি এক অবর্ণনীয় মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু ইওরোপ কেন, সমস্ত দেশের লোকে, কি সভ্য কি অসভ্য সমস্ত লোকেই হীরক কথাটি শুনিলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া পড়ে। কোন কোন পদার্থে এই সুদুর্লভ মনি সৃজিত হইয়াছে, ইহা নিরূপণের জন্য শত শত হীরক খণ্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা এক মাত্র মূল পদার্থের দ্বারা বিনির্ম্মিত সে মূল পদার্থের অভাব নাই, পথে পথে ঘরে ঘরে রাশি রাশি সে মূল পদার্থ পদ দলিত হইতেছে; অবজ্ঞায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তথাপি ইহার মূল্য অসীম, এবং সেই জনসাধারণের অবজ্ঞাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াও, ইহা নিজেই অন্যান্য মণি মুক্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এক অমূল্যতর পদার্থ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মানুষ কত রাশি রাশি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, ধর্ম্ম বুদ্ধি হারাইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সরলতা বিসর্জ্জন দিয়া কুটীল বৃত্তি অবলম্বন

করিয়া, “হীরক প্রস্তুত করিতে” পারি এই পরিচয়ে শত শত লোককে ঠকাইতেছে। মূল্যবান বলিয়া ইহার শত শত অনুকরণ হইতেছে।

কিন্তু প্রকৃতিতে হীরক কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়? তাহাই প্রকৃতির দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা; মানব কিছুতেই অপসৃত করিতে পারে না। বৃক্ষ রস হইতে উৎপন্ন এইরূপ অভিমত হইতে অঙ্গার গলিয়া শীতলীকৃ হইলে হীরক প্রস্তুত হয় এই অভিমত পর্য্যন্ত নানামত আবিষ্কৃত হইয়াছে বাঁশে সময়ে সময়ে একরূপ প্রস্তর পাওয়া যায় দেখিয়া সার ডেভিড ব্রুষ্টার মনে করিতেন, রজন জাতীয় কোনরূপ গাছের রস প্রাকৃতিক নিয়মে প্রস্তরে পরিণত হইলে হীরক উৎপন্ন হয়। প্রসিদ্ধ খনিজ তত্ত্বজ্ঞ জেমসন ইহাকেই সত্যমত মনে করিতেন, কারণ হীরক দগ্ধ করিলে একরূপ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে দেখিয়া, প্রসিদ্ধ পেট ঝোণ্টও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে অঙ্গার উচ্চ উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া পরে শীতল হইলে সেই অঙ্গার এইরূপে ফটিকত্ব প্রাপ্ত হয়। অনেক পণ্ডিতগণ বলিতেন যে কারবণিক এসিড গ্যাস তীব্র উত্তাপে ও অধিক পরিমাণ চাপে দ্রবীভূত হয় এবং এই বাষ্প শীতল হইতে আবস্ত হইলেই অঙ্গার দানা বাঁধিতে থাকে; এবং সেই দানাগুলিই হীরকখণ্ড। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে গলিত লৌহ দানা বাঁধিলেই হীরক উৎপন্ন হয়। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে এক অদ্ভুত আবিষ্কারই এইরূপ অভিমতের কারণ। আরিজোনার মৃত্তিকার উপরে ক্ষুদ্র বৃহৎ লৌহ চূর্ণপূ ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলির ভারও বিশেষ অল্প ছিল না। সেই জন্য লোকে অনুমান করিত আরিজোনা প্রদেশের স্তরে স্তরে পর্য্যাপ্ত লৌহ রহিয়াছে। এই লৌহ খণ্ড গুলিকে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করেন যে ইহারা উল্কাপিণ্ডেরই চূর্ণ। এই লৌহ খণ্ডের কোন একটিকে একবার কাটিবার চেষ্টা করায় বুঝিতে পারা যায়, যে ইহার অভ্যন্তরে লৌহ অপেক্ষা আরও একটি কঠিনতর পদার্থের কণিকা রহিয়াছে। এই কণিকা গুলি হীরক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহার ফলে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অনুমান করিলেন যে পৃথিবীতে নানা স্থানে

যে বিক্ষিপ্ত হীরকখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তেরই প্রথম উৎপত্তি স্থল উল্কাপিণ্ড। রসায়নজ্ঞেরা জানেন যে কোন এসিড ধাতুর সংস্পর্শে আসিলে ধাতু ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কাজেই যে লৌহপিণ্ডগর্ভে হীরক লুক্কায়িত থাকে, তাহাকে এসিডের সংস্পর্শে আনিলে লৌহ অদৃশ্য হইবে বটে, কিন্তু হীরকের ত কিছুই ক্ষতি হইবে না। সেইরূপ যদি লৌহও অনেকদিন ধরিয়া ক্রমাগত বায়ুর সম্পর্শে থাকে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে লৌহ মাটীতে বিলীন হইবে এবং হীরক বাহির হইয়া পড়িবে। যদি আরিজোনা প্রদেশের লৌহ পিণ্ডগুলি বায়ুর সংস্পর্শে পড়িয়া থাকিতে পাইত, তাহা হইল এক দিন না একদিন হীরক গুলি আপনিই বাহির পড়িত এবং জমীর উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইত। সেই জন্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে যদিও ভূপৃষ্টে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হীরকখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উৎপত্তি পৃথিবীর বহির্ভাগে অন্তরীক্ষের কোন প্রদেশে।

যাহাই হউক হীরক সমূহের উৎপত্তির কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আজকাল বিজ্ঞানবিৎগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথক পৃথক স্থানে হীরকের উৎপত্তির কারণ ও পৃথক পৃথক। ভারতবর্ষ, লাপল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রদেশে যে সমস্ত হীরক পাওয়া যায়, সে সমস্তই আগ্নেয় গিরির অত্যন্ত উত্তাপে প্রস্তর গলিয়া যাইবার পর, ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া কঠিন হইবার কালে, উৎপন্ন হইয়াছে কেননা অঙ্গার সাধারণতঃ পাহাড়ের প্রায় সকল অংশেই বর্ত্তমান থাকে, কিম্বা পাহাড়ে অঙ্গার না থাকিলেও বহির্ভাগের অন্য কোন স্থান হইতে অঙ্গার আনিয়া গলিত প্রস্তরে পতিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রেজিলে প্রস্তর স্ফটিকের সহিত হীরকখণ্ড পাওয়া যায়, সেই জন্য তাহার উৎপত্তির কারণ অন্যরূপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ প্রস্তর স্ফটিকের বৈজ্ঞানিক ইংরাজি নাম "itacolumite" এই ইটাকলিউমাইট যে সমস্ত প্রস্তর, প্রস্তর থাকিয়াও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত প্রস্তর শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সমস্ত প্রস্তরকে ইংরাজিতে metamorphic rock বলে। ইহা প্রথমতঃ জলে

দ্রবীভূত হইয়াছিল, পরে সম্ভবতঃ অল্প উত্তাপে, ও সেই সমস্ত প্রস্তর অধঃ-পতিত হইয়া প্রস্তর প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রেজিলে ব্যবসায়ীগণ প্রথমে হীরক অনুসন্ধান করিবার কালীন নদীর গর্ভ ক্রমাগত খনন করিয়া, সেই প্রস্তর ফটিকের স্তর পাইলে তাহার অভ্যন্তরে হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপ দেখিয়া স্থির করা হইয়াছে যে প্রস্তর স্ফটিক ও হীরক একই অবিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে! কিন্তু সেই দ্রবীভূত জলের ধর্ম্ম কি কিম্বা কিরূপেই বা ইহার গর্ভে হীরক সম্ভূত হইলে তাহার নির্ণয় হইয়া উঠিল না। কাজেই ইহার প্রাবৃতিক উৎপত্তির কারণ পূর্ব্বের ন্যায়ই অমীমাংসিত হইয়া রহিল।

হীরকের উৎপত্তির প্রাকৃতিক ইতিহাস যতই জটিল হউক না কেন, ইহা যে কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন তাহা অনেক দিন মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। যে মূল পদার্থ হইতে হীরক উৎপন্ন, প্রাচীন পণ্ডিতগণের তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁহারা জানিতেন ইহা একরূপ স্ফটিক। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দিরও মধ্যভাগে একজন প্রসিদ্ধ পদার্থ বিৎ বলিয়াছিলেন, যে ইহা বিশুদ্ধতম অথচ পরিষ্কার মৃত্তিকা, অত্যন্ত লঘু অগ্নি, অতি স্বচ্ছ জল সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রই এইরূপ সমস্ত অভিমতেরই পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। ফরাসি দেশে লাভই সিয়ার এবং ইংলণ্ডে ডেভি সাহেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে হীরক অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অঙ্গার উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া শীতলীকৃত হইবার সময় স্ফটিকত্ব প্রাপ্ত হইলেই হীরক হয়। ঐরূপ দুই জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ দ্বারা সপ্রমাণিত লইলেও লোকে হীরকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। আর বাস্তবিক এই অমূল্য রত্ন অপদার্থ কয়লা হইতে উৎপন্ন এরূপ মত সত্য হইলেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে বড়ই অনিচ্ছা হয়। কাজেই অন্য একজন পণ্ডিত গাইটন ডি মরভো আর এক উপায়ে পরীক্ষা করিলেন। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে লৌহে অঙ্গার মিশ্রিত করিলে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। কাজেই মরভো ভাবিলেন যে যদি হীরক অঙ্গার ভিন্ন অন্য

কোন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে লৌহের সহিত ইহার মিশ্রণে নিশ্চয়ই ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গলিত লৌহে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হীরক মিশ্রিত করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করিলেন। সেই ইস্পাতের সহিত সাধারণ উপায়ে প্রস্তুত ইস্পাতের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল না। এবং সেই দিন হইতে লোকে হীরকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একরূপ নিঃসন্দেহ হইল।

অন্য কোন রত্নই এরূপ একটি মূল পদার্থ সম্ভূত নহে, আবার এই মূল পদার্থও এরূপ অনায়াসলভ্য যে লোকে হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু এক বিষম বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাস্তবিক লোকে কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত ও করিতেছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে, হীরক প্রস্তুত করা অপেক্ষা না করাই ভাল। "কৃত্রিম" এই কথাটি বলিলেই যেন হঠাৎ মনে হয় বুঝি কাচ খণ্ড বা অন্য কিছু চাকচিক্যশালী পদার্থের নির্ম্মাণ করা হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, প্রকৃতই হীরক প্রস্তুত হইতেছে, রসায়ণ শাস্ত্র সম্ভূত শিল্প প্রণালী সাহায্যে মানুষ যে হীরক প্রস্তুত করিতেছে, তাহার সহিত স্বাভাবিক হীরকের বাস্তবিকই কোন প্রভেদ নাই, ধর্ম্মে, কার্য্যে, গুণে, এবং নির্ম্মাণ প্রণালীতে উভয়ই এক! তবে বিভিন্ন লোকে হীরক প্রস্তুত করিবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডেস্প্রে একটা প্রকাণ্ড "ভ্যাকুয়াম" টিউবে (যে টিউব হইতে বায়ু পর্য্যন্ত নিষ্কাষিত করা হইয়াছে) তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের ক্রিয়ার সাহায্যে প্লাটি নাম ধাতুর তারের উপর অঙ্গার স্ফটিকের চূর্ণ সংলগ্ন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সমস্ত স্ফটিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করায় প্রকৃত হীরকের ন্যায় অষ্টভুজ ক্ষেত্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি কৃষ্টবর্ণ। পদ্মরাগ মণি (ruby) এই চূর্ণ ঘর্ষণে মসৃণ হইয়া ছিল। জহুরীগণ অবগত আছেন যে রুবি মসৃণ করিতে হইলে হীরকের চূর্ণেরই প্রয়োজন হয়। কাজেই এই সমস্ত চূর্ণ হীরক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অঙ্গার কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। চিনি, লবণ ইত্যাদি জলে বেশী করিয়া গুলিয়া, জল উড়াইয়া দিলেই মিছরি কিম্বা লবণ দানা বাঁধিয়া যায়। সেইরূপে যদি কয়লা কিম্বা ভুসা গলাইয়া সেই দ্রব পদার্থকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে কয়লা দানা বাঁধিয়া হীরক উৎপন্ন হইতে পারে। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে গ্ল্যাসগো দেশস্থ প্রসিদ্ধ রসায়ণবিৎ হ্যান্নে এইরূপে হীরক প্রস্তুত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তিনিই প্রথমে সিলিকাকে একটি বাষ্পে দ্রবভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে লিথিয়াম ধাতু হাইড্রো কারবণ হইতে কারবণকে পৃথক করিতে পারে। সে সমস্ত পদার্থ হাইড্রোজেন ও কারবণ বা অঙ্গার সংযোগে সম্ভূত তাহাকেই হাইড্রো কারবণ বলে। কেরোসিন ঐরূপ একটি হাইড্রো কারবণ। তিনি লিথিয়াম, কেরোসিন এবং কিছু "sperm oil" একটি কঠিন ও দৃঢ় রট আয়রণের নলের মধ্যে রাখিয়া নলের দুইদিক একবারে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই লৌহ নলে, যত দূর মানবের পক্ষে সম্ভব সেইরূপ, উত্তাপ চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হ্যান্নের প্রক্রিয়ায় প্রধান বিঘ্ন এই যে, এরূপ একটি পাত্র স্থির করা আবশ্যক যাহা অনায়াসে প্রচুর চাপ ও উত্তাপের তেজ সহ্য করিতে সক্ষ্যম হয়। নলের লৌহ সার্দ্ধ তিন ইঞ্চি মোটা ছিল। কিন্তু তথাপি এই চাপ ও উত্তাপ প্রয়োগে কাগজের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক অনেকবার চেষ্টার পর হ্যান্নে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়া ছিলেন যে, লিথিয়ামের দ্বারা অঙ্গার পৃথকীকৃত হইয়া স্পারম্ অয়েলে দ্রবীভূত হইবে, এবং এই তৈল শীতল হইলে অঙ্গার দান বাঁধিয়া যাইবে। ইহার ফলে এক চাপ স্ফটিক প্রস্তুত হইল। তাহা সত্য হীরক কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বালীর ন্যায়।

ফরাসী দেশের মইসার প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসংশনীয়। তিনি অঙ্গারকে প্রথমতঃ একটি লৌহ নলে রাখিয়া ৩,৫০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে পূর্ব্ব হইতেই দ্রবীভূত হইতেছে এরূপ গলিত লৌহে অঙ্গার

পূরিত নলটি ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ অশ্রুত পূর্ব্ব উত্তাপের জন্য তড়িৎ চুল্লীর প্রয়োজন হইয়াছিল! এরূপ করায় সেই লৌহ নল অঙ্গারের সহিত একবারে মিশ্রিত হইয়া গেল। অবশেষে সেই গলিত লৌহকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। জল বরফ হইবার সময় যেরূপ আয়তনে বৃদ্ধি পায়, গলিত লৌহও পুনরায় শক্ত হইবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কাজেই যখন লৌহের ভিতরের অংস যতই ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, ততই স্তরে স্তরে তাহারও চাপও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এত অধিক চাপে অঙ্গার স্ফটিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িল। ইহাই হীরক। কিন্তু ইহাও বেশী বড় হইল না প্রত্যেকটি এক ইঞ্চির ১৫ ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র হইল।

ফ্রিডল্যাণ্ডার অলিভাইন নামক এক প্রকার সিলিকা বাঁক নলের সাহায্যে দ্রবীভূত করতঃ তাহাকে অঙ্গারের কোমল পেনসিল্ দিয়া নাড়িতে লাগিলেন। শীতল হইলে সেই সিলিকেটে অনেক অতি ক্ষুদ্র হীরক চূর্ণ পাওয়া গিয়াছিল।

মইমা এবং ফ্রীডলাণ্ডারের পরীক্ষা দ্বারা উল্কাপীণ্ডে এবং দক্ষিণ আফেরিকায় কিরূপে হীরক স্বভাবতঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল; একরূপ প্রমাণিত হইয়া গেল। যাহা হউক যখন মানুষ হীরক চূর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যে দিন লোকে ব্যবহারোপযোগী হীরক প্রস্তুক করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। আজ কাল বিজ্ঞান অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

শিল্প।

অম্লসংযুক্ত খাদ্য দ্রব্য পোরসিলেন পাত্রে রাখিলে খাদ্য বিষাক্ত হয় না বটে, কিন্তু পোরসিলেন অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া গৃহস্থেরা প্রায়ই ব্যবহার করিতে পারে না। নিম্নলিখিত ধাতু কয়েকটির সংমিশ্রণে একরূপ নূতন যৌগিক ধাতু প্রস্তুত হয়; তাহাতে অম্ল লাগিলে কিছুই হয় না এবং

পোরসিলেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে। যৌগিক ধাতুর উপাদান গুলি এইরূপ :—তাম্র ১৫ ভাগ; টিন ২·৩৪ ভাগ; শিসা ১৮২ ভাগ এবং এণ্টিমণি ১ ভাগ।

নিম্নলিখিত ভাগে কয়েকটি ধাতু মিশ্রিত করিলে উৎপন্ন যৌগিক ধাতু প্রায় রৌপ্যের স্বচ্ছতুল্য উজ্জ্বল হয়। তাম্র—৭০ ভাগ, নিকেল ২৩ ভাগ, এবং এলুমিনিয়াম ৭ ভাগ।

দ্বিতীয় প্রকার, টিন ৪০·৩৫, শিসা ৩·৫৪৪, তাম্র ৫৫·৭৮০, নিকেল ১৩·৪০৬, দস্তা ২৩·১৯৮, সামান্য মাত্র লৌহ।

ভুসা (Lamp black) ১০ ভাগ, গঁদ ১০ ভাগ, অক্সালিক এসিড (oxalic acid) ৫ ভাগ, এবং ২০০ ভাগ জল। প্রথমে অল্প জল লইয়া উক্ত দ্রব্য তিনটিকে মিশ্রিত করিতে হয়। পরে অবশিষ্ট জল ঢালিয়া দিয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া লইলেই অতি উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়।

গন্ধকের গুঁড়া ৮ ভাগ, পটাশ ৪ ভাগ মাটীর পাত্রে রাখিয়া জ্বাল দিতে হয়, বেশ উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঠাণ্ডা করতঃ গুঁড়াইয়া লইয়া পিপীলিকা আক্রান্ত স্থানে ছড়াইয়া দিলে, পিপীলিকা দূরীভূত হয়।

গ্রিণ্ডেলিয়া	৮	ড্রাম।
জ্যারোব্যাণ্ডি	৮	„
ইউক্যালিপ্টাস	৪	„
ডিজিট্যালিস্	৪	„
কাবাব চিনি	৪	„
ষ্ট্র্যামোনিয়াম	১৬	„
নাইট্রেট অফ পটাশ	১২	„
ক্যাসক্যারিলা বার্ক	১	„

নাইট্রেট অফ পটাশকে জলে দ্রবীভূত করতঃ অন্য পদার্থ গুলিকে একবাবে চূর্ণ করিয়া নাইট্রেট অফ পটাশের জলে ঢালিয়া দিতে হয়। পরে শুষ্ক করিয়া লইয়া অর্দ্ধ চামচের হিসাবে ভাগ করতঃ, প্রত্যেক ভাগ দগ্ধ করিয়া নিশ্বাসের সহিত ধূম গ্রহণ করিলে হ্যাজমা (asthma) রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

৪ পাইট জল, ২ আউন্স গ্লিসিরিণ, সামান্য গোলাপ জলের সহিত মিশাইয়া স্নানের পর গায়ে ঢালিয়া দিলে, চর্ম্মের কোমলত্ব ও মসৃণত্ব বৃদ্ধি পায়।

৫০০ শত ভাগ উত্তপ্ত জলে ঢালিয়া দাও, ইহাতে ২৫ ভাগ হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দাও। টিনকে গলাইয়া জলে ঢাসিয়া দাও, সেই টিনের চূর্ণ ২৫ ভাগ, এণ্টিমণি চূর্ণ ১৫ ভাগ পূর্ব্বোক্ত জলিয় পদার্থে ফেলিয়া ফুটাইতে থাক। কোন পিত্তলের পদার্থকে বেশ পরিষ্কার করতঃ শুষ্ক করিয়া উহাতে ফেলিয়া দাও। আধঘণ্টা ফুটাইয়া পিত্তল উঠাইয়া লইলে পিত্তলের গাত্রে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এক কঠিন আবরণ পড়িয়া যায়।

গ্লিসারিণ	১ ভাগ
খড়ি গুঁড়া	১ ভাগ
জল	৮ ভাগ

দ্রব্য তিনটি মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লও; উহা দ্বারা মুখ ধৌত করিলে মুখে তামাক, সিগারেটের গন্ধ দূরিভূত হয়, ও মুখ পরিষ্কার থাকে।

বিবিধ।

কলোম্বিয়া ইউনিভারসিটির পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এফ, এল, টাক্‌টুস্ গত ১৫ই এপ্রেল কোন ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ কালীন, তড়িত সংশ্লিষ্ট-তার স্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কলিকাতার অনেক গৃহ বৈদ্যুতিক আলোক ইত্যাদির তারে পূর্ণ। সেই সমস্ত তার স্পর্শে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক! অভিজ্ঞের তার স্পর্শ না করাই ভাল।

এডওয়ার্ড গ্রিণলি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন;. তিনি বলেন, যে যদি গ্রীস দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতগণ আজও পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভাষার পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের আলোচনাই অধিকতর মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। পাইথগোরাসের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা লক্ষ্য করিলে ও ঐ সমস্ত গবেষণা সত্য নির্দ্ধারণের শক্তির বিষয়

চিন্তা করিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভাষা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কষ্ট সাধ্য বটে; কিন্তু ভাষায় বিজ্ঞান জড়ীভূত না হইলে, ভাষা বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া এক না হইলে জাতীয় জীবন সম্যক উন্নতি লাভ করিতে প্রায় সক্ষম হয় না।

আর হে কেনটন, আবার্ডিন ইউনিভারসিটির দৃশ্যশালায় ৭০০০ পক্ষীডিম্ব উপহার দিয়াছেন। তিনি ২০ বৎসর ধরিয়া ডিম্ব গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি উক্ত দৃশ্য শালায় যাইয়া অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ঐ উপহার প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ কিরূপে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয় তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন। ঐ ডিম্ব গুলি ভবিষ্যত শিক্ষার্থীর যে কত উপকার হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক সঙ্গে এরূপ সংগ্রহ বোধ হয় আর কোথাও নাই, তাহার উপহারের মধ্যে কতকগুলি সুদুর্লভ পক্ষীর ডিম্বও রহিয়াছে; আমাদের দেশেও যে কোন লোক এইরূপ কোন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া অনেক শিক্ষার্থীর উপকার করিতে পারেন।

কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের এইচ, জি, জ্যাকসন্ সাহেব, যে সমস্ত মাল ষ্টীমার বা জাহাজে করিয়া স্থানান্তরিত করা হয়, তাহাতে লিখিবার নিমিত্ত একরূপ নূতন ষ্টেনশিল (Stencil) উদ্ভাবন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত প্রেসিডেন্সীতে একটি (Department of Industry) খুলিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে উক্ত Department ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত একটি অফিস খোলা হইবে। অধিকন্তু ইহাতে একটি শিল্প বাণিজ্যের দৃশ্য শালাও থাকিবে।

পাঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষ এবং সাধারণের সকলেই ক্ষেত্রে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য আর্টিজান (Artesian) কূপ খননের চেষ্টা করিতেছেন।

১ম বর্ষ।]　　আষাঢ় ১৩১৬, জুন ১৯০৯।　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তাপ।

একটি লৌহ শলাকা কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে রাখিয়া পরে তাহা স্পর্শ করিলে আমরা একটা বিশেষ রকমের ক্লেশ অনুভব করি। তখন আমরা বলি যে ঐ লৌহখণ্ড "তপ্ত," এবং যাহার জন্য উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে বলি "তাপ"। আমাদের শরীরের ত্বক এই তাপ অনুভব করিবার ইন্দ্রিয়, এবং জন্মাবধিই তাপ অনুভূতির এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। চঞ্চল শিশু যখন দীপশিখার উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে আকৃষ্ট হইয়া তাহা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, তখন সে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করে। তাহার পর, গরম দুগ্ধের বাটী, স্নান করিবার গরম জল, এবং রৌদ্রতপ্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ ইত্যাদির স্পর্শে শিশুর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে বুঝিতে পারে যে এই সকল দ্রব্য স্পর্শজনিত যে অনুভূতি তাহা একই শ্রেণীর অন্তর্গত। সে পরে জানিতে পারে যে উহার নাম তাপ।

তাপের বাহ্যপ্রকৃতি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কোনও পদার্থে তাপ প্রযুক্ত হইলে তাহার কিছু অবস্থান্তর ঘটে, এবং এই পরিবর্ত্তন আমরা স্পর্শদ্বারা অনুভব করিতে পারি। কোন পদার্থে তাপ অধিক এবং কোনটাতে অল্প আহা প্রায় স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই তাপের বাহ্য প্রকৃতি।

তাপের অন্তঃপ্রকৃতি। তাপ কি একটা পদার্থ (matter)? যদি তাহাই হয় তবে কোনও সামগ্রীতে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার ভার বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। যদি এক সের জলের সহিত এক ছটাক শর্করা মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে জলটুকু একটু মিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ভার বৃদ্ধি হইয়া একসের এক ছটাক হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ঐ মিষ্টত্বের কারণ শর্করা; এবং শর্করার নিজের একটা ভার আছে, তাই তাহার সংযোগে জলের ভারবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এক সের জল লইয়া তাহাতে তাপ সংযোগ করিলে দেখা যায় যে জলটুকু উষ্ণতর হইয়াছে মাত্র, তাহার গুরুত্বের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহা হইলে যে তাপের সংযোগে জল উষ্ণতর হইয়াছে তাহার নিজের কোন ভার নাই ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু ভারহীন পদার্থ হইতে পারে না, পদার্থ মাত্রেরই একটা গুরুত্ব আছে। তাহা হইলে তাপ যে পদার্থ (matter) নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ তাপ প্রয়োগ করা অর্থে একটা বাহ্যবস্তু আনিয়া মিশাইয়া দেওয়া নহে। জলে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার সহিত কোনও বাহ্য বস্তুর যোগ ঘটে না, তাহার ভিতরে কেবল একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। তাপ তেজের (energy) রূপান্তর মাত্র, সকল প্রকার তেজঃই তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। কোনও সামগ্রীতে তেজঃ প্রযুক্ত হইলে তাহার একটা আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন ঘটে, ভারের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন এক খণ্ড লোহতার দুই হস্তে ধরিয়া বাঁকাইলে তাহার অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন হয়, একটা ভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহার ভারবৃদ্ধি হয় না। এস্থলে দুই হস্তের শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায়

তারের আকারের এই পরিবর্ত্তন। তেমনি তাপ সংযোগ করিলে ঐ তারের আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু তাহাতেও উহার ভার বৃদ্ধি হইবে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে জগতের সমুদায় বস্তু যে অণু পরমাণুর দ্বারা গঠিত সেই অণুগুলি সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে নড়িয়া বেড়াইতেছে। যখন ইহাদের বেগ অধিক দ্রুত হয়, তখন সেই চাঞ্চল্য তাপরূপে বাহিরে প্রকাশিত হয়। জলের গ্লাশ বেশ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে জলও স্থির হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তখনও জলের অণুসমূহ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল এই চাঞ্চল্য আমাদের স্থূল চক্ষে লক্ষিত হয় না। তাহার পর সেই জলে তাপ সংযোগ করিলে জলের আণবিক চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অণুগুলির বেগ যত দ্রুত হইতে থাকে, জলও ততই উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়। তাহা হইলে আভ্যন্তরীন অণু-সমূহের চাঞ্চল্যই, তাপের অন্তঃপ্রকৃতি।

তাপের উৎপত্তি। (১) আমাদের পৃথিবীর পক্ষে সমুদায় তাপের আদি কারণ সূর্য্য। সূর্য্যই সমগ্র সৌরজগতের জীবনস্বরূপ, তিনিই পৃথিবী ও তাহার প্রতিবেশী গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলীর জীবনদাতা ও পালনকর্ত্তা। সূর্য্য কিরণে স্নাত হইয়াই আমাদের এই স্নেহময়ী বসুন্ধরা এত গৌরবান্বিতা, ও স্বচ্ছন্দে কোটি কোটি সন্তানকে বক্ষের উপরে পালন করিয়া আসিতেছেন। তপনের তপ্তরশ্মিমালায় সজ্জিত হইয়াই পৃথিবীর এত শোভা; এত স্নিগ্ধতা, এত শ্যামলতা, এত উর্ব্বরতা।

(২) কিন্তু সৌরতাপই পৃথিবীর একমাত্র সম্বল নহে, তাহার নিজস্বও কিছু আছে; পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রচুর তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে পৃথিবীর অন্তস্তল এত উষ্ণ যে তত্রত্য প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতি তরল অবস্থায় রহিয়াছে। পৃথিবীর আয়ুকাল সূর্য্যের তাপবিকীরণ-ক্ষমতা ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীন তাপের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেদিন এই দুটির মধ্যে একটির অভাব হইবে, সেই দিনই পৃথিবীর মৃত্যু।

এই সৌরজগতেই তাহার উদাহরণ রহিয়াছে। আমাদের উপগ্রহ চন্দ্র আর জীবিত নাই। সুদূর অতীতে কখনও সেখানে জীবের বাস ছিল কিনা, তাহা এখন বলা সুকঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যে চন্দ্র এত শোভার আধার, যাহাব স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, যাহার শুভ্র কিরণে স্নাত হইয়া ধরণী সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠে, এবং কবি ও ভাবুকের নয়নে স্বর্গের ছবি ভাসিয়া উঠে, সে চন্দ্র এখন প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, হীমশীতল জড়পিণ্ড মাত্র। প্রাণে সুখ নাই, আশা নাই, শুধু এক অলঙ্ঘ্য বিশ্বনিয়মের অনুরোধে অশ্রান্ত ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্র আজ মৃত, কারণ তাহার আভ্যন্তরীণ তাপ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, আজ তাহাব ভাণ্ডাব শূণ্য। কোন এক অতিদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীবও এই শোচনীয় পরিণাম হইবে, পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

(৩) উপরে যাহা বিবৃত হইল তদ্ব্যতীত তাপ উৎপাদনের আরও কয়েকটি উপায় আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তাপ তেজের (energy) একটা রূপান্তব, এবং এ সকল প্রকার তেজই তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। যে সকল উপায়ে তেজকে তাপে রূপান্তরিত করা যায় তন্মধ্যে ঘর্ষণ (friction) প্রধান। দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তাহারা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এমন কি দুই হস্তের তালুদ্বয়ের দ্বারা পরস্পরের ঘর্ষণ করিলে যথেষ্ট তাপ অনুভূত হয়। আবার ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রে শান দিবার সময় এত তাপ উৎপন্ন হয় যে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। যাহাকে অনেকে তারকার কক্ষচ্যুতি বলিয়া মনে করেন, তাহা তেমন ভয়াবহ কিছুই নহে। সমস্ত বিশ্বময় যে সকল প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া শূন্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের সহিত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ জনিত এত তাপ উৎপন্ন হয় যে, সেই প্রস্তর খণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং শেষে বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশাইয়া যায়।

(৪) সংঘট্টন (Percussion) দ্বারাও তাপ উৎপন্ন হয়। আমাদের

দেশে সেদিন পর্য্যন্ত "চকমকি" ঠুকিয়া আগুন জ্বালা হইত। ছেনী এবং হাতুড়ির দ্বারা পাথর কাটিতে কাটিতে যন্ত্র দুইটি এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া না লইলে উহা লইয়া কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

(৫) চাপ প্রয়োগের দ্বারা কোন পদার্থের আয়তন হ্রাস করিলে উহার তাপ বৃদ্ধি হয়। কোনও বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ প্রযুক্ত হইলেই তাপবৃদ্ধি বিশেষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ বাষ্পীয় পদার্থকেই অতি সহজে স্বল্পায়ত কবা যায়। বাইসাইকেল কিম্বা ফুটবলেব ভিতর বায়ু প্রবেশ কবাইবার সময় পিচকারিটি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কঠিন (solid) বা তরল পদার্থেব উপব চাপ প্রযুক্ত হইলেও তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা এত অল্প যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উহা অনুভব করা যায় না।

(৬) কোন কোন কঠিন পদার্থের উপর তরল বা বাষ্পীয় পদার্থ প্রযুক্ত হইলে তাহাকে শোষণ কবিয়া লয়। তখন অল্প মাত্রায় তাপবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। ময়দা বা স্পঞ্জ কর্ত্তৃক জল শোষিত হইলে সামান্য তাপ উৎপন্ন হয়। কঠিন পদার্থেব সহিত বাষ্পীয় পদার্থের মিলনে আরও অধিক তাপবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ডোব্রাইনরের ল্যাম্পের (Dobereiner's lamp) কার্য্য প্রণালী ইহাবই উপর নির্ভব করিতেছে। একটি কাচপাত্রে দস্তা ও সালফিউবিক এ্যাসিডের ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতব দিয়া এই গ্যাসের ধারা বহির্গত হইয়া অল্প পরিমাণ কৃষ্ণ প্ল্যাটিনমের (platiunm black) উপর পতিত হয়। এই কৃষ্ণ প্ল্যাটিনম সাধাবণ প্ল্যাটিনম ধাতুর রূপান্তর (allotropic modification) মাত্র। এই কৃষ্ণপ্ল্যাটিনম উক্ত গ্যাসকে শোষণ করিয়া লয়। সেই সময়ে এত অধিক তাপ উৎপন্ন হয় যে, ঐ গ্যাসের উপরাংশ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে,এবং সাধারণ প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

(৭) কোনও কোনও পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইবার সময় উহার তাপ

বৃদ্ধি হয়। জলে কোনও লবণ দ্রব হইবার সময় প্রায় ইহার বিপরীত ফলই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা যবক্ষার (Potassium Nitrate), নিশাদল (Ammonium chloride) ইত্যাদি জলে গুলিলে জল শীতল হয়। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে, বিশেষতঃ যখন দুটি তরল পদার্থ মিশ্রিত হয়, তখন তাপ উৎপন্ন হইতেও দেখা যায়।* জলের সহিত সালফিউরিক এসিড মিশাইলে এত অধিক তাপ উৎপন্ন হয় যে জল ফুটিতে আরম্ভ করে।

(৮) যখন কোনও পদার্থের অবস্থান্তর (change of state) ঘটে, অর্থাৎ বাষ্প হইতে তরল বা তরল হইতে কঠিন হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শিলীকারক মিশ্রণ (Freezing mixture) দ্বারা জল শীতল করিতে করিতে উহা ক্রমে o ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীতল হয়; এবং সেই সময়ে জল জমিয়া বরফে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। এই পরিবর্ত্তনের সময় উহার তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই তাপ নিবারণ করিবার জন্য আরও অধিক শৈত্য প্রয়োগ করিতে হয়। যে তাপ সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পদার্থের অবস্থান্তর ঘটিবার সময় প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রচ্ছন্ন তাপ (latent heat) বলা যায়।

(৯) কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিবার সময়েও, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সংখ্যক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন (combination) বা বিশ্লেষণ (decomposition) হয়, তখন প্রায় সর্ব্বদাই তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে জলে চুণ দিলে ফুটিতে থাকে। আমরা আজ কাল দীপশলাকা ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকি তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত উত্তাপ হইতেই উৎপন্ন। আমাদের শরীরে যে তাপ রহিয়াছে, যাহার অস্তিত্বই আমাদের জীবন, এবং যাহার অভাবই মৃত্যু, তাহাও রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত। আমরা যে অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু শ্বাস গ্রহণ করি এবং যে সকল খাদ্য আহার করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে নানা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া দিবানিশি চলিতেছে, ইহা হইতেই আমাদের শরীরে তাপের সঞ্চার হয়।

(১০) কোন পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহার তাপ বৃদ্ধি ঘটে। আজকাল কলিকাতার বৃহৎ সৌধরাজি যে তড়িতালোকে আলোকিত হয় তাহার উৎপত্তি এইরূপে :—কাচ গোলকের ভিতর অতি প্ল্যাটিনম ধাতুর সূক্ষ্ম তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ায় উহা অত্যুষ্ণ হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে আলোক বহির্গত হয়।

তাপ উৎপত্তির প্রধান দশটি কারণ উপরে বিবৃত হইল। অতঃপর তাপের প্রয়োগে কি কি ফল হয় তাহার আলোচনা করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, বি, এ।

মানব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উন্নতি বলিলে আমরা কি বুঝি? কোন একটা বিষয়ের বিশেষ অবস্থান্তরই উন্নতি। কোন পদার্থ অধিকতর মনোরম এবং সুখকর হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সেই পদার্থের পূর্ব্বাবস্থার উন্নতি হইয়াছে। মহামনা হারবার্ট স্পেনসার উন্নতির অন্যরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কোন পদার্থ সমতা হইতে অসমানতায় উপনীত হইলেই, বুঝিতে হইবে, যে সেই পদার্থের উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। কোন পদার্থের অংশ সমূহের এবং সেই অংশ অন্তর্নিবিষ্ট ধর্ম্ম সমূহের পরস্পরের প্রতি চিরবর্দ্ধনশীল অধীনতা, অথচ স্পষ্ট প্রতীয়মান পার্থক্য, ও পার্থক্য স্বত্বেও তাহাদের পূর্ণ সমুচ্চয়, এইরূপ হইয়া, যদি সমস্ত পদার্থের ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল অসমানতা পরিদৃষ্ট হয়, এবং যদি সেই পদার্থ সমুচ্চয়প্রাপ্ত-অংশসমূহের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর সহযোগোৎপন্ন স্থীরতা প্রবণ হয় তাহা হইলে সেই পদার্থের উন্নতি সংসাধিত হইতেছে বুঝিতে হইবে—"Progress

is a passage from a homogeneous to heterogeneous state. It is a continually increasing disintegration of the whole mass accompanied by an integration, a differentiation and a mutual, perpetually increasing dependence of parts as well as functions, and by a tendancy to equilibrium in the functions of the parts integrated." স্পেনসারের মতে জটীলতাই উচ্চতর প্রকৃতিবিশিষ্ট-ক্রমোন্নতিশীলতার পরিচায়ক। অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সামান্য, যাহা সহজসাধ্য, যাহা অনায়াসলভ্য, তাহা অসামান্য, ক্লেশসাধ্য, দুর্লভ পদার্থ হইতে নিকৃষ্টতর। পর্ণশালা নির্ম্মাণের জন্য উপাদান হীনতর হইলেও অট্টালিকা ও পর্ণশালার উদ্দেশ্য এক। উদ্দেশ্য অবিভিন্ন বলিয়া পর্ণশালা অপেক্ষা অট্টালিকাকে উন্নত আবাস বলি। কিন্তু এই উন্নত আবাস নির্ম্মাণ বাস্তবিকই পর্ণশালা হইতে কত জটীল, কত কষ্টসাধ্য, কত সময়সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই স্পেন-সারের উন্নতি সংজ্ঞা এইরূপ বিষয় সমূহে সম্যক প্রয়োজ্য। কিন্তু জটী-লতাই কি উন্নতির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার প্রধান সংজ্ঞা? যদি কোন বিষয়ের বাস্তবিক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে কিনা বুঝিতে হয়, অথবা কোন পদার্থের উন্নতি হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই পদার্থের বা বিষয়ের জটীলতাই কি উন্নতির প্রামাণ্য হইবে? উন্নতি শব্দের অর্থ বা উন্নতির সারবত্তা এবং প্রকৃতি কি জটীলতা সম্যক-রূপে বুঝাইয়া দিতে পারে?

সামান্য চিন্তা করিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে স্পেনসারের উন্নতি সংজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট নহে। কারণ অনেকস্থলে জটীলতাই অবনতির পরিচায়ক। আমি কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিলাম, এবং তাহাকে কার্য্যকর করিবার জন্য নানারূপ জটীল অংশ নির্ম্মাণ করিলাম। কিন্তু যদি সেই একরূপ কার্য্যের জন্য আমার যন্ত্র অপেক্ষা অন্য কোন লোক জটীল অংশকে সরল করিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই সরলতা বা জটীলতা

শূন্যতাই কি সেই যন্ত্রের উন্নতির প্রধান পরিচায়ক নহে? যন্ত্রাদি যতই সরল হইবে, পূর্ব্ব যন্ত্র অপেক্ষা নূতন যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী যত সহজে পরিচালিত হইবে, ততই সেই যন্ত্রের উন্নতি সংসাধিত হইবে। জটীলতা যন্ত্র সম্বন্ধে উন্নতির পরিচায়ক নহে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমোন্নতিশীলতার (evolution) প্রধান দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার বিবর্ত্তন বাদ বুঝাইতে যাইয়া প্রথম বা প্রধান সূত্রটিই পরিত্যাগ করিয়াছেন; কেননা, তিনি বিবর্ত্তনবাদের প্রধান ভিত্তি পদার্থ এবং পদার্থের গতির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক কোন একটা বিশেষ গতি অবলম্বন করিয়া, পদার্থের বা তাহার অন্তর্নিবিষ্ট কর্ম্মসমূহের ভিন্ন অবস্থায় বা ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তনই বিবর্ত্তনবাদের সংজ্ঞা; অথবা বিবর্ত্তন পদার্থের একটা অনির্ব্বচনীয় গতি। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন বা ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির একটা বিশেষ অর্থ রহিয়াছে। বিবর্ত্তন কেবল মাত্র দেহ সম্বন্ধীয় অথবা পদার্থের শক্তিসাধ্য স্থূল গতি নহে। কাজেই দেহাত্মবাদ বা পদার্থের শারীরিক উন্নতির রীতি অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা কখনই সফল হইবে না। কেননা সে চেষ্টার মূলই ভ্রম-সঙ্কুল। ইহা অতি সত্য যে হারবার্ট স্পেনসার বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে দৈহিক বা বাহ্যিক ক্রিয়াবলীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু তাঁহার "বৃদ্ধিশীল জটীলতা" শব্দের অর্থেই বাহ্য বা দৈহিক পরিবর্ত্তন সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র বাহ্য প্রকৃতি লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাহ্য প্রকৃতিই বিবর্ত্তনবাদের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। এই বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন যে সর্ব্বত্র পদার্থের বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতিশীলতা, তাহা নহে। তিনি পদার্থের এই পরিবর্ত্তনের বাস্তবিক এবং প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। সেই অর্থ তিনি অমীমাংসিত রাখিয়া তাহাকে জ্ঞানের অগোচর উল্লেখ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু পদার্থের শারীরিক পরিবর্ত্তনের সেই অমীমাংসিত অর্থই বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা স্থল।

সৌর জগতের বিবর্ত্তন, অর্থাৎ কোন্ আদি পদার্থ কি উপায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ সৌর জগতে পরিণত হইয়াছে, তৎসমুদাই ক্যাণ্ট ল্যাপলাসের অনুমান সম্মত মতানুসারেই সম্ভূত হইয়াছে। এই সমস্তই প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত পদার্থের দৈহিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু জীবজগতের বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতিশীলতা সৌরজগতের বিবর্ত্তন-অনুরূপ নহে। ইহাতে দৈহিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্ত্তনও পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে; সেই সঙ্গে মানসিক ভাব সমষ্টির রূপান্তর বা ক্রিয়ান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইলেই দৈহিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কি জীবজগত কি জড়জগত সর্ব্বত্রই আণবিক বা অণুসমষ্টির ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনই যে বিবর্ত্তন এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু মনের ভাবের বিবর্ত্তন কোন ক্রমেই আণবিক পরিবর্ত্তন নহে। ইহা আমাদের একটা অবস্থা, সে অবস্থায় উপনীত হওয়ায় আমাদের জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত হইতেছে, এবং আমাদের প্রবৃত্তিও সদা সচেতন ও জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থা অতি স্বচ্ছ এবং তাহাতে সমস্ত পদার্থের ক্রিয়া, ধর্ম্ম, বা যাহা কিছু সমস্তই প্রতিফলিত হইতেছে, এবং আমরাও প্রয়োজন অনুসারে এবং বিবর্ত্তন পথে অগ্রসর হইয়া যতটুকু শক্তির উপযুক্ত হইয়াছি, সেই উপযোগীতা অনুসারে সেই প্রতিফলিত পদার্থের ক্রিয়া বা ধর্ম্মসমূহের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। এই অবস্থার একটা বিশেষ অর্থ রহিয়াছে, এবং তাহাই এই অবস্থার অন্তর্নিহিত সার বস্তু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

দুষ্প্রাপ্য মূল পদার্থের তালিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

১ = সাঙ্কেতিক অক্ষর (Symbol)

২ = পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight)

৩ = আবিষ্কারক (Discoverer)

৪ = আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)

৫ = প্রধান প্রাপ্তিস্থান (Principal source)

৬ = দ্রব করিবার উত্তাপ (Melting point)

৭ = ধর্ম্ম (Properties)

(নির্দ্দেশকের সংখ্যার সহিত পদার্থের নিম্নস্থিত সংখ্যা মিলাইয়া লইতে হইবে।)

আরবিয়াম (Erbium)

১ = Er.

২ = ১৬৬

৩ = মোসাণ্ডার ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে।

৫ = গ্যাডোলিনাইট।

গ্যাডোলিনাম (Gadolinum)

১ = Gd.

২ = ১৫৬

৩ = ম্যারিগ্‌ন্যাক ১৮৮০ খৃঃ অব্দে।

৫ = স্যামারস্কাইট।

জারমানিয়াম (Germanium)

১ = Ge.

২ = ৭২.৩

৩ = উইনক্লার ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে।

৪ = ৫'৪৬৯

৫ = আরজিরোডাইট।

৬ = ৯০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্।

৭ = ধূসরবর্ণাভ শ্বেত বর্ণ ধাতু। জলসিক্ত অথবা শুষ্ক বাতাসে পরিবর্ত্তন হয় না।

গ্যালিয়াম (Gallium)

১ = Ga.

২ = ৬৯'৯

৩ = বয়বাড্রান ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে।

৪ = ৫'৯৫

৫ = জিঙ্ক ব্লেণ্ড।

৬ = ৩০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

৭ = কোমল, নমনীয় বায়ুসংস্পর্শে অক্সিডাইজ্ড হয় না।

গ্লকোডিমিয়াম (Glaukodymium)

৩ = ক্রুশকফ্ ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে।

৫ = দুষ্প্রাপ্য।

হলমিয়াম (Holmium)

১ = Ho.

২ = ১৬২

৩ = ক্লিভ ১৮৮০ খৃঃ অব্দে।

৫ = দুষ্প্রাপ্য।

ইণ্ডিয়াম (Indium)

১ = In.

২ = ১১৩ ৪

৩ = রিশার ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে।

৪ = ৭'৪

৫ = জিঙ্ক ব্লেণ্ড।

৬ = ১৭০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

৭ = রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র, কোমল, এবং টানিয়া তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; বায়ুসংস্পর্শে বিবর্ণ হয় না।

(ক্রমশঃ।)

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ডাক্তার সরকার ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট (Honorary Presidency Magistrate) নিযুক্ত হন। তাঁহার বিচারাসন চিরসমুজ্জল ছিল। ১৯০২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত তিনি অসীম একাগ্রতার সহিত সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন এবং নিরপরাধকে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিস্কৃত করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া অপরাধী বিনা বাক্য ব্যয়ে দোষ স্বীকার করিত, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিত। তাঁহার শাস্তি প্রদান কখনই করুণা বর্জ্জিত হয় নাই। অবশেষে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এবং পীড়ার যন্ত্রণায় তিনি বিচারাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্গে যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, যতদিন বঙ্গ উন্নতি অভিলাষী হইয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, সমস্ত জ্ঞান. বুদ্ধি নিয়োজিত করিবে, ততদিন ডাক্তার সরকার ও ফাদার লাফোঁর নাম সম্পূজিত হইবে ; এই দুই মহাত্মারই উদ্দেশ্য এক, এবং দুই জনেই সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবার জন্য আমরণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান সভার উৎপত্তি-মূল হইতে যাহা কিছু সমস্তই এই দুই মহাপুরুষ এক যোগে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। দুই জনেই বৈজ্ঞানিক, এবং দুই জনেই ভারতে বিজ্ঞান

প্রচারের জন্য অসুরের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এবং দেবতার ন্যায় লোকের হিতার্থে এবং ভারতবাসীকে জ্ঞানের পথে আনিবার জন্য নিঃস্বার্থতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই দুই মহাপুরুষ, এক সময়েই ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ভারতের স্মরণীয় বন্ধু লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। এই উপলক্ষে তৎকালে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ও কীর্ত্তিমান লেখক ডাক্তার শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে "এত দিনের মধ্যে কেবল এই বারেই গভর্ণমেণ্টের উপাধি প্রদান অপাত্রের পরিবর্ত্তে সুপাত্রেই ন্যস্ত হইল। এবং এই বিষয়ে, এত কালের মধ্যে যোগ্যতার মর্য্যাদা লর্ড রিপণই প্রথম রাখিলেন।"

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইলে যে সমস্ত লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হন, ডাক্তার সরকার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে প্রথম তিনি উক্ত রোগাক্রান্ত হন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই রোগীর চিকীৎসার্থে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে যাওয়ায় ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তদুপরি তাঁহার য়্যাজমাও ছিল। নানা কারণে তিনি ঐ সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত হইয়া এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থানান্তর গমন অনিবার্য্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। আমরা সকল কার্য্যের কারণ, অনুসন্ধান করিলেও, অনেক সময়ে খুঁজিয়া পাই না বলিয়া, অজ্ঞতা বশতঃ কার্য্যের নিয়ন্তার উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে পীড়ার আক্রমণে বা অন্য কোন কারণে বড়ই কষ্ট পাইয়া থাকি সত্য, কিন্তু ভগবান কোন পথে, কোন মঙ্গল ইচ্ছায় আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন বুঝিতে পারি না বলিয়াই কত অন্যায় অনুযোগ করিয়া থাকি। ডাক্তার সরকারের এই রূপে পুনঃ পুনঃ পীড়াক্রান্ত হইবারও বিশেষ কারণ ছিল। এইরূপে স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইলে, কর্ম্মময় জীবন ডাক্তার সরকার কর্ম্ম স্থান কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কখনও বৈদ্যনাথ দেওঘরে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গমন

করিতেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে তিনি বৈদ্যনাথে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করিলেন।

সেই সময়ে দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু, দেওঘর প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু ও বৈদ্যনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত গিরিজানন্দ দত্তঝার সহিত এক যোগে দেওঘরে একটি কুষ্ঠ্যাশ্রম সংস্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত অবলম্বনের অভাবে তাঁহারা তাঁহাদের এই শুভ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা তিন বৎসর নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে যোগীন্দ্র বাবু চাঁদা সংগ্রহের অভিলাষে ডাক্তার সরকারের সহিত বৈদ্যনাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি যোগীন্দ্র বাবুর নিকট কুষ্ঠরোগাক্রান্তগণের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া এতই কাতর হইয়া পড়িলেন, যে তিনি তাঁহাদের সহযোগী হইয়া কুষ্ঠ্যাশ্রম স্থাপনের জন্য পরিশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পড়িলেন।

এই কুষ্ঠ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা চেষ্টার প্রতি কার্য্যে তাঁহার অন্তঃকরণ-নিহিত পবিত্র করুণা এবং গভীর সমীচীনতার কতকটা অংশ প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধে তাঁহার নিজেরই দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"It is only since the time of Jesus Christ that they (Lepers) have begun to be looked upon as legitimate objects of charity and though very nearly nineteen hundred years have passed since that blessed life lived on our earth, the sympathy that has been accorded to these unfortunate beings, is very far from the full measure that ought to be accorded. The very loathsomeness of the disease which aught to have touched the hearts of those who are fortunately free from it, has served only to create abhorrence rather than pity.

...... And I would implore the educated, the benevolent, and the disinterested to second the most laudable efforts of Babu Jogendra nath, in order that the success may be more assured and complete ...... But ought we to rest contented when, with the housing, the feeding of the inmates has been secured? We must not forget that the inmates are sufferers from a disease. And because the disease is still opprobrium of medicine, because it has hitherto resisted all efforts at a radical cure, we ought not to stand aghast and do nothing."

যে স্থানে আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীব রমণীয়, পরন্তু লোকালয়ের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাজেই ব্যাধি, সংক্রামক হইলেও, রুগ্ন অন্যব্যক্তি সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইবে না। শ্রীমতী তিযোরের ঘাটোয়ালিনী আশ্রমের জন্য আবশ্যক মত স্থানের চিরস্থায়ী পাট্টা দিয়াছিলেন। বঙ্গের তৎকালীন প্রসিদ্ধ শাসন কর্ত্তা সার চার্লস ইলিয়ট বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৮৯২ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে এই আশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার ৫০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় সমস্তই সরকার মহাশয় নিজে বহন করিয়াছিলেন। আশ্রম সংস্থাপনের উদ্যোগিগণ ও চাঁদাদাতৃগণের অনুমতি লইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নামানুসারে আশ্রমের নাম "রাজকুমারী লেপার এসাইলাম" রাখা হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে স্ত্রীজাতিকে তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিনি স্ত্রীজাতিকে বিলাসিতার উপকরণ মনে করিতেন না, তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ ও ন্যায় সঙ্গত ছিল। আশ্রম ভিত্তি সংস্থাপন কালীন ছোটলাটের সম্মুখে বক্তৃতায় তাঁহার স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে ;—

As a general rule, throughout the world, but especially in my county, we are forgetful of woman....... That condition is deplorable indeed, and I have not, whenever occasion has presented itself, hesitated to bear my testmiony to the sad fact. I must say, however, that my devotion to woman as the guardian angel of infant humanity, my reverence for woman as our first preceptor, my love of woman as the sweetener of life, have not been derived from Western education, great as its influence has been in otherwise modelling my character, not from our Shastras. They are inherent in me, and the great wonder with me is, how any man can be void of them. I deplore the condition of woman not in my own country alone but all over the world more or less."

যাহা হউক তাঁহার জীবনের আর একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। যতকাল দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রমের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে, অথবা জগতে যত দিন কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থের একজনও বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সরকারের নাম চির গৌরবান্বিত থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

উদ্ভিদের জ্বর।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় চেতন পদার্থ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্তঃ—উদ্ভিদ ও জঙ্গম। আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত যতই বৈষম্য থাকুক না কেন, জীবনের কার্য্য পরিচালনে মূলতঃ উভয়েই এক অবিভিন্ন পথ অব-

লম্বন করিয়া চলিতেছে। উভয়েই অক্সিজেন নামক বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করতঃ জীবনধারণোপযোগী অঙ্গারমূলক পদার্থকে অথবা অঙ্গারকে গৃহীত অক্সিজেন দ্বারা দগ্ধ করিয়া, কারবন ডাইঅক্সাইড নামক বায়বীয় পদার্থ পরিত্যাগ করে। আমরা, জঙ্গম জীব, শুধু অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কারবন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করি, পরন্তু উদ্ভিদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা বায়ুস্থিত কারবন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করতঃ সূর্য্যালোক ও যে পদার্থের বলে উদ্ভিদ রাজ্য হরিৎবর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেই পদার্থ সাহায্যে গৃহীত কারবন ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লেষিত করিয়া অঙ্গার অংশটুকু নিজ পুষ্টিসাধনের জন্য গ্রহণ করে ও অক্সিজেনের অংশ টুকু পরিত্যাগ করে। তবে সমস্তটাই পরিত্যাগ করে না। প্রথমে বর্ণিত অক্সিজেন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইলে, অবশিষ্ট অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। জঙ্গম ও জীবের সকলেরই মানসিকবৃত্তি সম্যক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। অতি নিকৃষ্টতর প্রাণীর মানসিক বৃত্তি, ও দৈহিক সুখ দুঃখ অনুভূতির যতটুকু ক্ষমতা আছে, উদ্ভিদের মধ্যেও ততটুকু মানসিক বৃত্তি ও অনুভূতি-ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে। জীবের ন্যায় বৃক্ষলতাদিও নিদ্রিত হয়; নিদ্রা শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য-পরিচালন-শূন্যতা ও মনের জড়তা। বৃক্ষের পক্ষেও নিদ্রা তাহাই। ক্লোরোফরম ও ইথার সংস্পর্শে জীব জন্তু যেমন হত চৈতন্য হইয়া পড়ে, বৃক্ষাদিরও অবস্থা তদ্রূপ হয়। আমাদের ন্যায় বৃক্ষলতাদিও সংক্রামক রোগক্রান্ত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বৃক্ষাদি পশুপক্ষীর ন্যায় জ্বর রোগেও অভিভূত হয়। জ্বর বলিলে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, আমাদের শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিকতার অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃক্ষ লতাদিরও সেইরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ এতই অল্প যে অতি সামান্য উত্তাপ পরিমাপক এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট থারমোমিটার ভিন্ন ইহার তাপমান নিরূপণ অসম্ভব।

সামুদ্রিক কচ্ছপের শারীরিক উত্তাপ মাত্র ২ ডিগ্রি ফারণহাইট। জলের উত্তাপ ৩২ ডিগ্রি ফারণহাইট হইলেই জল জমিয়া বরফ হইয়া পড়ে। তাহা

হইলে এই সমস্ত কচ্ছপের উত্তাপ বরফের অপেক্ষাও অল্পতর। সাধারণতঃ জলচর প্রাণীর রক্তের উত্তাপ অত্যন্ত অল্প। সেইজন্য মৎস্যাদি অনেক জলচর জীবকে শীতল-শোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী বলে। এই সমস্ত প্রাণীর শারীরিক উত্তাপ চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থের প্রায় সমান বলিয়া ইহাদের উত্তাপ পরিমাণ করা বড়ই কষ্ট সাধ্য। সেইরূপ প্রায় সমস্ত বৃক্ষাদির জীবনের কার্য্য পরিচালন অতি মৃদু সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহাদের উত্তাপের পরিমাণ চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থের অর্থাৎ বায়ুর উত্তাপের এত অনুরূপ যে ইহাদের উত্তাপের পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যাঁহারা শীত প্রধান দেশে অথবা হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলে কখনও গিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, যে শীতের সময় বৃক্ষের কাণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ বরফ বৃক্ষের আভ্যন্তরিক উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি সময়ে সময়ে অতি কোমল লতা কিম্বা আগাছার ফুলের কুঁড়ি বরফ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সেই কুঁড়ির শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ প্রতিগ্রহণ কালীন যে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই বরফ গলিয়া যায়, এবং ফুলও বাহির হইয়া পড়িবার অবসর পায়। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষাদির উত্তাপ অধিকতর।

জীবজন্তুর ন্যায় বৃক্ষাদিও আহত হইলে, শোণিত (বৃক্ষ সম্বন্ধে কোন প্রকার রস বিশেষ) বহির্গত হইয়া পড়ে। সেই ক্ষত ও সময় ক্রমে আরাম হয় বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য ক্ষত স্থানে একটা দাগ পড়িয়া থাকে। এই ক্ষতজাত বা এই ক্ষতরসপিপাসু জীবাণুগণের সহিত সংগ্রামে বৃক্ষশরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্য প্রণালী এত দ্রুত সম্পাদিত হয়, যে বৃক্ষের স্বাভাবিক উত্তাপ বেশ বৃদ্ধি যইয়া পড়ে। এই উত্তাপের বৃদ্ধি প্রথমতঃ আহত স্থানেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের সমস্ত শরীরেই উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে একটা আলুর কোন স্থানে আঘাত করিলে উহার উত্তাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হয় এবং ক্রমশঃ কমিয়া স্বাভাবিকতায় উপস্থিত হইয়া থাকে। আলুর এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি প্রায় আহত

স্থানের সন্নিকটেই হইয়া থাকে ; কিন্তু পেয়াজের উত্তাপ সমস্ত অংশে পরিব্যাপ্ত হয় এবং উত্তাপের পরিমাণও অধিকতর হয়।

জীব জগতে এবং উদ্ভিদ জগতে ক্রমশঃই অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা বৃক্ষকে মনঃশূন্য ও বিকারশূন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি। হয়ত এমন একদিন আসিবে, যেদিন আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব যে বেদনা পাইলে, বা আহত হইলে, আমরা যেরূপ কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি, বৃক্ষ লতাদিও ঠিক সেইরূপ অনুভব করে।

শিল্প।

বস্ত্রের বর্ণ এসিড লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইলে, প্রথমতঃ সেই স্থানে এমোনিয়া দিয়া এসিডের ক্ষমতা নষ্ট করিতে হয়, পরে ক্লোরোফরম্ লাগাইলেই বস্ত্রের বর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠে। এবং সোডা সাবান ইত্যাদি ক্ষার পদার্থ দ্বারা কাপড়ে দাগ লাগিলে, দাগ লাগিবার অল্প পরেই অতি ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট এসেটিক এসিডে অর্থাৎ অতি সামান্য এসিড অধিক পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া সেই এসিডে দাগ লাগা স্থান ধৌত করিলে দাগ উঠিয়া যায়।

বিক্রেয় পদার্থে রক্তের দাগ লাগিলে প্রায়ই জিনিষটি বিবর্ণ বা কুৎসিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ত লাগা জিনিষে চালের গুঁড়, ময়দা, এরারুট বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থ রক্ত লাগিবার অব্যবহিত পরে লাগাইলে দাগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। অথবা যদি প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত পদার্থ লাগাইবার পরিবর্ত্তে, ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট পটাশ বা সোডা লাগাইয়া পরে ফটকিরি দ্বারা ধৌত করিলে আদৌ দাগ থাকে না।

তার্পিন তৈলে ডুবাইয়া ৩।৪ দিন রৌদ্রে রাখিলে অস্থি নির্ম্মিত পদার্থ হইতে দুর্গন্ধ বা চর্ব্বি দূরীভূত হয়; এবং জিনিষটি খুব শুভ্র হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে হস্তি দন্ত নির্ম্মিত জিনিষ হরিদ্রা বর্ণাভ হইয়া যায়; এরূপ হইলে, প্রথমতঃ সেই জিনিষটিকে বুরুশ দ্বারা উত্তমরূপে জল ও সাবান দিয়া ধৌত করিয়া ভিজা অবস্থাতেই রৌদ্রে রাখিতে হয়, এইরূপে ৩।৪ দিন প্রতিদিন ৩।৪ বার সাবান জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে রাখিবার পর এবং প্রতিবার রৌদ্রে দিবার সময় বুরুশ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিলে হস্তিদন্ত একেবারে পরিষ্কার শুভ্র হইয়া যায়।

পিত্তল নির্ম্মিত পদার্থ কোন কারণ বশতঃ অপরিষ্কৃত হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে বেশ পরিষ্কার করা যায়; ইহাতে সময় এবং পরিশ্রম অতি সামান্যই প্রয়োজন হয়। যদি পিত্তলে কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহাকে পটাশ এবং সোডার জলে ডুবাইয়া তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, পরে ২ ভাগ নাইট্রিক ও আধ ভাগ সালফিউরিক এসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী বড় মাটীর কিম্বা প্রস্তরের পাত্রে রাখিতে হয়। কতকগুলি করাতের গুড়া বা ঐরূপ কোন নরম পদার্থ এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন। প্রথমতঃ পদার্থটীকে এসিডের জলে ডুবাইয়া লইয়াই পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। অবশেষে করাতের গুঁড়া দ্বারা মাজিলেই পিত্তল খুব উজ্জ্বল হইয়া পড়ে।

হীরক বা মূল্যবান প্রস্তর, পরিষ্কার করিবার সময় অনেকে নানারূপ পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ করা উচিত নহে। কেননা অনেক প্রস্তর ইহাতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ সাবানের জলে ডুবাইয়া অত্যন্ত কোমল বুরুশ দ্বারা ধৌত করিলেই হীরকাদি বেশ পরিষ্কৃত হইয়া স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়।

পর্দ্দায় রং করিতে হইলে বা পর্দ্দায় কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমতঃ পর্দ্দা নিম্নলিখিত উপায়ে রং বা চিত্রের উপযোগী করিয়া

লইতে হয়। শ্বেতবর্ণের শিরিস বার ঘণ্টার অধিককাল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এই জলের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, ঐ শিরিস মিশ্রিত হইয়া বেশ একটা চটচটে পদার্থের মত হয়। পরে ইহাকে গরম জলে একবার গলাইয়া ফেলিয়া এই গলিত পদার্থে হোয়াইট (প্যারিস) ঢালিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থ গাঢ় দুগ্ধের মত না হয়, ততক্ষণ হোয়াইট্ ঢালিতে হইবে। অবশেষে ইহাকে ইচ্ছানুরূপ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পদ্দায় লাগাইলেই পদ্দা রঞ্জিত হয়।

একজন শিল্পী বলেন "আমি শত শত এনগ্রেভিং পরিস্কৃত করিয়াছি, যে উপায় অবলম্বনে পরিষ্কৃত করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রথমতঃ এনগ্রেভিংটি একটা চ্যাপটা পাত্রে রাখিয়া ক্রমাগত জল ঢালিতে থাকি। যখন জলে বেশ ভিজিয়া যায় তখন জল সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া দিয়া উহাতে ক্লোরাইড অফ লাইমের জল (তিন ভাগ জল ও এক ভাগ লাইকার ক্যালসিস ক্লোরেট) ঢালিয়া দিই। ইহাতেই এনগ্রেভিংগুলি বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে কোন স্থান হইতে বা সমস্ত এনগ্রেভিং হইতে দাগ উঠেনা। এরূপ হইলে তাহাতে লাইকার ক্যালসিস ক্লোরেট ঢালিয়া দিই। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে অতি ক্ষীণ নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড ঢালিয়া দিই। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন এনগ্রেভিং পাই নাই, যাহা এই উপায়ে পরিষ্কৃত হয় নাই। অবশেষে ক্রমাগত উহা জলে ধৌত করিতে হয়। ধৌত হইলে উহাকে ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট আইসিং গ্ল্যাস বা শিরিস দ্রবে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কেহ কেহ এই দ্রবকে কফি চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লয়। এরূপ করিলে অক্ষর গুলি হরিদ্রাবর্ণাভ হয়।"

লোহ হইতে মরিচা তুলিতে হইলে লেবুর রস নুনে ঢালিয়া যে দ্রব প্রস্তুত হয় তাহা মরিচা ধরা স্থানে লাগাইয়া সামান্য ঘসিলেই উঠিয়া যায়।

হস্তে নাইট্রিক এসিড লাগিলে প্রায় হরিদ্রাবর্ণের দাগ হইয়া যায়; এরূপ হইলে প্রথমতঃ পারম্যাঙ্গানেট অফ পোটাসিয়ামের দ্রবে হাত ডুবাইয়া ফেলিতে হয়। অবশেষে ক্ষাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ডুবাইয়া, হাত ধুইয়া ফেলিলেই দাগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যায়। পুরাতন দাগ হইলে প্রায়ই উঠেনা।

উদরাময়ের ঔষধ—

টিঞ্চার অফ ওপিয়াম	১ আউন্স।
ঐ ঐ ক্যাপসিক্যাম	১ ,,
স্পিরিট অফ ক্যাম্ফর	১ ,,
ক্লোরোফরম	১৮০ মিনিম।

ইহাতে এলকোহল ঢালিয়া ৫ আউন্স করিয়া লইতে হইবে।

বিবিধ।

স্বদেশী চশমা।—আগ্রা নিবাসী শ্রীযুক্ত বি, এন, বৈজাল মহাশয়ের কারখানায় সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে অতি উৎকৃষ্ট চশমা প্রস্তুত হইতেছে। বৈজাল মহাশয়ের এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

কাজের লোক।—কার্য্যকরী শিল্প, চিকিৎসা এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা, বহুবাজার, ১ নং অভয় হালদারের লেন হইতে প্রকাশিত। এরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ মাসিক পত্রিকা বঙ্গভাষায় অত্যন্ত বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" জন্য। সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি মূল্যের হ্রাস করেন, তাহা হইলে অনেক "বেকারের" উপকার করা হয়।

লেপ্টেন্যাণ্ট ক্যাপটেন বুকানন সাহেবের মতে বিড়ালের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও মন্দীভূত হইয়া পড়ে, কেননা বিড়াল ইন্দুরের সাক্ষাৎ যম। এই দুর্দান্ত শত্রুর তীক্ষ্ণ কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ইন্দুর [illegible]তেই প্লেগ বীজ ছড়াইতে পারে না। তিনি বলেন "The more attention we give to inocculation, the less we are certain to give to the only sound common sense method of preventing plague, viz, the keeping of the natural enemy of the animal, that is responsible for spreading the disease."

"Times of India" প্রেস হইতে বম্বে নিবাসী রয়াল বেলজিয়ান কন্সালেটের চ্যানসেলার মিষ্টার জে এস মুকাডামের নিমিত্ত "Belgium & her Commercial Development" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেলজিয়ানের ব্যবসা আজকাল কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং ভারতক্ষেত্রে ইহার প্রসার কত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতে বেলজিয়াম বাণিজ্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণে প্রতারণা নিবারণ কল্পে জেনেভার হোয়াইট ক্রস সোসাইটির অধীনে প্যারিস সহরে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা কি তাহারই সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এবারে সেই সংজ্ঞা যাহাতে বাস্তব কার্য্যে পরিণত হয়, তাহারই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। চিনি, মাখন, তৈল ময়দা, আচার ইত্যাদির বিশুদ্ধতার সংবাদ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইবে, এবং বিশুদ্ধতার নানারূপ প্রমাণ লওয়া হইবে। আগামী বৎসরে ব্রাসেলে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে; এবং কি উপায়ে সহজে এবং সর্ব্বস্থানে প্রতারণা নিবারিত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ আলোচনা হইবে।

১ম বর্ষ।] শ্রাবণ ১৩১৬, জুলাই ১৯০৯। [৭ম সংখ্যা।

তড়িৎ।

আবহমানকাল ধরিয়া সর্ব্বজনপ্রিয়তায় ও কৌতূহলোদ্দীপকতায় কোন বিজ্ঞানই তড়িৎবিজ্ঞানের সমকক্ষ নহে। ইহার নৈসর্গিক নিয়মসমূহ অতিশয় প্রীতিপ্রবণ এবং অন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তড়িতের নৈসর্গিক নিয়মানুবর্ত্তী ক্রিয়াসমূহ বহু বিভিন্নপদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয় বলিয়া, ইহা স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং সেই ক্রিয়াগুলি এরূপ হৃদয়গ্রাহী যে তাহাদের চিত্র আমাদের চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া যায়। যে শক্তিবলে শান্তপ্রকৃতির নগ্নমাধুরি পরিস্ফুট হইয়া পড়ে তাহাও তড়িৎ, আবার যে শক্তিবলে দানবী প্রকৃতি বিশ্ববিধ্বংশকারী সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাও তড়িৎ। প্রকৃতির কি ভীষণভাব, কি ভূমা মহান সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যে, সকল সময়েই, সকল বিষয়েই,—কি সাধারণ, কি অশ্রুতপূর্ব্ব সমস্ত ক্রিয়াতেই তড়িৎ সংশ্লিষ্ট। চির রহস্যময় ও চির অমীমাংসিত শক্তিতে তড়িৎই যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক পদার্থে, আবার সেই সমস্ত মৌলিক পদার্থকে সংশ্লিষ্ট করিয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারে। সঞ্চরণশীল অবস্থায় (Dynamical state) নীরবে, নিঃশব্দে জলকণাকে দ্বিধা বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক বায়বীয় পদার্থে, আবার স্থির-

অবস্থায় (Statical state) সেই বায়বীয় পদার্থদ্বয়কে বজ্রনিনাদে সংযুক্ত করিয়া জলে পরিণত করিতে তড়িৎই সক্ষম হয়। সঞ্চরণ-শীল অবস্থায় অথবা স্থির অবস্থায় তড়িৎ, কি জান্তব, কি উদ্ভিদ সমস্ত চেতন পদার্থের পেশী ও স্নায়ু সমূহে কত বিস্ময়কর, কখনও কখনও কত ভয়ঙ্কর ক্রিয়া প্রকাশ করে। সেই তড়িতই স্থির অবস্থায় এবং পর ও অপর তড়িতের (positive and negative electricity) ক্ষীপ্র পরিবর্ত্তনে (i.e in the state of high frequency) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে অচিন্তনীয়, কল্পনাব বহির্ভূত অতি তীব্র গতিতে সঞ্চালিত হইয়া, পেশীব ভয়ঙ্কর তীব্র আকুঞ্চন অথবা মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনীশক্তিধ্বংশের পবিবর্ত্তে জীবিতের শরীব দিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়; এবং তাহারই ধন্বন্তরীশক্তিতে মানব কত দুরারোগ্য ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবে। বিদ্যুত—গ্রীক পুরাণান্তর্গত প্রমিথিয়াসেব অগ্নি *—জলকণাপূর্ণ মেঘ রাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ কি অপরিমেয় গতিতে শূন্যমার্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে। এই বিদ্যুতই আমাদের বজ্র; তখন তড়িতের অসীম তেজে মুহূর্ত্তে বিশ্ব বিধ্বংশ হইতে পারে। আবার সেই বিদ্যুতই কুহেলিকাপূর্ণ-সূক্ষ্মচাতুর্য্যে এবং বিস্ময়জনক কার্য্য-তৎপরতায় জীবিত পদার্থে ও জড় পদার্থে যে সকল অচিন্তনীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দার্শনিক বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তড়িৎ বজ্ররূপে মুহূর্ত্তে মানব জীবন হরণ করে, আবাব সেই তড়িৎই প্রাণরক্ষার মূল হইয়া হৃদয় যন্ত্রকে ধীরে ধীরে স্পন্দিত করিতে থাকে। সুইডেনবাসী বিজ্ঞানবিৎ (Arrhenius) আরিনিয়াস সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষার এবং দ্রাবক সম্মিলিত হইবার সময়, তাহাদের অণুসমূহ বাহ্যতঃ তীব্রশক্তিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; এই শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে মানবোদ্ভাবিত

* প্রমিথিয়াস—টাইটন কুলসম্ভূত ইয়াপিটাস ও ক্লাইমেনের পুত্র। ইনি বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে সমস্ত মানব জাতিকে পরাভূত করতঃ মৃত্তিকাদ্বারা মানব সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা-মানবকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

কোন, শক্তিই এই শক্তিব সমকক্ষ নহে। ক্ষাব দ্রবীভূত কবিলে, ক্ষাব এবং দ্রাবকেব প্রতিপবমাণু অপবিমেয় তড়িৎশক্তিতে অণু-প্রাণিত হইয়াছে বলিযা মনে হয। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইবাব সময় কতক গুলি পবমাণু পব তডিৎ এবং কতকগুলি অপব তডিৎ শক্তি সম্পন্ন হয়। এই তড়িৎযুক্ত পবমাণু সমূহেব প্রকৃতি, ক্রিযা, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্যকরূপে অবগত হইবাব বহু পূর্ব্বে ফ্যাবাডে (Farady) তাহাদিগকে আযন (Ion) বলিযা অভিহিত কবিযা ছিলেন। এইরূপ অনুমানেই আধুনিক বসায়নশাস্ত্রে যুগান্তব উপস্থিত হইযাছে। আবিনিযাসেব মতে এই আয়ন গুলিই বাস্তবিক কার্য্যকব—"It is the ions, which act." এই আয়নবলেই জীবিত প্রাণীব পেশী ও হৃদয় কার্য্য কবিতে সক্ষম হয়, হৃদয তন্ত্রী তালে তালে নৃত্য কবে এবং জীবে জীবনী শক্তিব সঞ্চাব হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণেব মতে পেশী সমূহেব ক্রিয়াবলীব মূল কাবণ, এমন কি চৈতন্যশক্তিব অর্থাৎ জীবনেব মূলই তড়িৎ। কাজেই বজ্র মৃত্যুব কাবণ হইলেও, জীবনেব উৎপত্তি মূলেও তডিৎ প্রযোজন।

বিদ্যুতেব ক্রিযা সমূহ এমনই অনির্ব্বচনীয়, বহস্যপূর্ণ ও অবোধ্য যে তাহা ভাবিলে শবীব বোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কোন সমযে কোন গৃহে নিশাকালে বজ্র পতিত হইযা, গৃহ সংলগ্ন বৈঠকখানাব মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। বজ্র পতিত হইবামাত্র আলোকসমূহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পুনবায় আলোক জ্বালিলে দেখা গেল, যে গৃহপ্রাচীব সংলগ্ন ঘটিকা যন্ত্রেব স্বর্ণ, তড়িৎসহযোগে আনীত হইয়া টেবিলস্থিত বজতবর্ত্তিকাধাবেব স্থানে স্থানে লেপিত হইয়া গিয়াছে। কোন সময়ে প্রান্তবস্থিত কোন লোকের উপব বজ্র পতিত হইলে তাহাব শাবিবীক কোন ক্ষতি হইবাব পবিবর্ত্তে, তাহাব পাদুকা পদ হইতে অপসাবিত হইয়া প্রায় চাবিশত দূবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সমস্ত লৌহ কীলক গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদা কোন কৃষক বালিকাব উপর বজ্র পতিত হইলে, তাহাব বস্ত্র সমূহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং বালিকাও অজ্ঞান হইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভূতলে পতিত হইল। অনুসন্ধানেব পর দেখা গেল যে তাহাব বস্ত্র সমূহ নিকটবর্ত্তী কোন এক

বৃক্ষ শাখায় বিলম্বিত রহিয়াছে। কোন মজুর এক দিন তাহার প্রাতভোজনের কালে প্রথম গ্রাস হস্তে তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে বজ্রাহত হইয়া তদবস্থাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হইল ; দেখিলেই মনে হয় যেন খাদ্য মুখে দিবার উদ্যোগ করিতেছে। আহা, তাহার খাদ্য মুখ সন্নিকটেই রহিয়া গেল! অবশেষে কোন লোক তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটি নিজে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিহিত বস্ত্রে উত্তাপের দাগ পর্য্যন্ত লাগে নাই। এই সমস্তই তড়িতের অবোধ্য শক্তি সম্ভূত। পিটার্সবার্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচম্যান, ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কোন এক দিন ভীষণ বজ্রাঘাত সহ ঝড় বৃষ্টির সময় বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িতের ক্রিয়াবলী পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত নিজ আবাসে উত্তোলিত insulated তড়িৎ পরিচালক দণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সেই দণ্ড বিচ্ছুরিত, অগ্নি গোলকের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। যে বৈদ্যুতিক তেজে রিচম্যান নিহত হইয়াছিলেন, আজ কাল মানব বুদ্ধি বলে সেই বিদ্যুতকে নিজ আয়ত্বাধীন করিয়া, তাহাকে ব্যোমপথে নিজ অভিলাষমত তরঙ্গায়িত করতঃ স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছে। এখন বিদ্যুৎ মানবের ক্ষীপ্র সংবাদ বাহিকা, সুদূরস্তর সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালাব্যবহিত শত শত যোজনের কথা মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে। বিদ্যুৎ সুবিশাল বট বৃক্ষকে ধ্বংশ করে বটে, কিন্তু তেমনই আবার নক্ষত্রালোকিত কুঞ্জ বনে বিকশিত কোমল কুসুমদল হইতে আলোক ছটারূপে নিঃসৃত হইয়া প্রান্তর সুষমার আধার করিয়া তুলে।

প্রবল বাত্যাসংক্ষুব্ধ তড়িৎ সঞ্জাত ঘুর্ণী বায়ু এবং প্রকাণ্ড ও বিস্ময়কর জলস্তম্ভের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। তাহাদের শক্তি অপরিমেয় তাহাদের সঞ্চলন পথে যাহা কিছু পতিত হয়, সমস্তই মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের অস্তিত্বও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেখিলেই মনে হয় তাহাদের উৎপত্তি সৃষ্টি ধ্বংশের জন্য। তাহাদের বজ্র নিনাদ, সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকাময় ঘন ঘন

আলোক স্ফুলিঙ্গ যেন প্রলয়ের সূচনা করে। তাহাদের আকর্ষণী শক্তি অতি প্রচণ্ড; পৃথিবীর উপরিভাগে সুবিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া অতি তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। তখন তীব্র গতিতে ধুলিকণা ও অন্যান্য লঘু পদার্থ সমূহকে তাহাদের সহিত বায়ুমণ্ডলের মর্দ্দিত প্রদেশে উদ্গত করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্থানে পরিবদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাদের প্রচণ্ড ক্ষমতা পরিদর্শন করিলে মানবের মনে এক অপূর্ব্ব বিভীষিকার সঞ্চার হয়, এবং কি জানি ভবিষ্যতে কোন এক দৈব দুর্ব্বিপাকের সূচনা মনে করিয়া ভয়ে মানব আত্মহারা হইয়া পড়ে, লোকে অবসন্ন হয় এবং প্রলয় আসন্ন ভাবিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। আবার দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মেরু দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মাধুরিতে প্রোজ্জ্বল করিয়া, ভূধর ধবল মেরু প্রদেশ মহিমামণ্ডিত করিয়া অরুণ বরণ মেরুছটা (aurora) কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি প্রীতিপদ। উহার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। সমস্ত মেরু প্রদেশে প্রকৃতি দেবী যেন একটি আলোকময় চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। তাহার স্বর্গীয় বর্ণে বিচিত্র রামধনুর সর্ব্ব বর্ণ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তে শত শত রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই আলোকতোরণ কখনও গভীর কখনও মৃদু বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে। রশ্মীর পরিবর্ত্তনশীলতায়, ঘন-ক্ষেত্র-বিশিষ্ট-কাচ-খণ্ড (prism) নিভিন্ন আলোক রশ্মির পরস্পর সংমিশ্রণসম্ভূত প্রদীপ্ত সুষমায় সেই আলোকময়চন্দ্রাতপ মণ্ডিত হইয়া কি অসাধারণ, কি মহিমাপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া পড়ে। এই প্রাণোন্মদ ছবি, বিশ্বনিয়ন্তার এই মধুর লিপি-চাতুর্য্য, প্রকৃতির এই মনোরম আলেখ্য দর্শনে হৃদয় যুগপৎ আনন্দে ও ভক্তিতে স্বতঃই আপ্লুত হইয়া পড়ে। বিশ্বস্রষ্টার অপার সৃষ্টি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; সে দৃশ্য দর্শনে মনে হয় যেন, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইয়া কেবল মাত্র এক মেরু-ছটাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তখন দর্শকের সমস্ত ইন্দ্রিয় নয়নে পরিণত হইলেও তাহার দেখিবার আশা পূর্ণ হয় না। সে তখন সেই লোকাতীত শোভার সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চায়।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াবলী তড়িৎ সমুৎপন্ন। প্রকৃতির ভীষণতাও তড়িৎ, প্রকৃতির সুমঙ্গল সৌন্দর্য্যও তড়িৎ। কাজেই সমস্ত বিজ্ঞান অপেক্ষা তড়িৎ বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণা বাস্তবিক বড়ই আনন্দ জনক ও প্রীতিপদ। প্রকৃতিব সর্ব্বস্থানে, প্রকৃতির শিরায় শিরায়, প্রকৃতির সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে তড়িৎ বিজড়িত বহিয়াছে। তড়িৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইলে ইহার প্রধান এবং মূল অংশ গুলির পর্য্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সেই সমস্তই ইহার ভিত্তি স্বরূপ। তড়িতেব কোন ক্রিয়াব কারণ বুঝিতে হইলে, ইহার নৈসর্গিক নিয়মাবলী ও সেই নিয়ম সমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত বিষয় কল্পিত হইয়াছে, সেই কল্পিত বিষয় সমূহ এবং তড়িৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের নানারূপ অভিমত গুলির বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা ও ঐ সম্বন্ধে প্রগাঢ় অধ্যয়ন প্রয়োজন। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত যত কিছু অভিমত কল্পিত হইয়াছে, তাহাব মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তবে ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিতে পারে, যে দিনে এই সমস্ত কল্পিত অভিমত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া সত্যে পরিণত হইবে ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তড়িতের ভিত্তি প্রোজ্জ্বল ইথরের (Luminiferous Ether) উপর ন্যস্ত। ইথার একটি কল্পিত পদার্থ এবং প্রাকৃতিক তেজঃ সমূহ, অর্থাৎ আলোক, উত্তাপ, ইত্যাদি পরিবাহিত হইবার মার্গ স্বরূপ। ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পাতলা। ইথাব মহাকাশেব সমস্ত স্থানে এমন কি পদার্থেব পরমাণুদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানেও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আলোক ও উত্তাপ সঞ্জাত এবং electro-magnetic তরঙ্গ মালার স্বরূপতা ও একভাববত্তা পর্য্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সমূহের কারণ নির্ণয়ার্থ ইথারই প্রধান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক মতে ইথার সমুদ্ভূত যত কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা সমস্তই তড়িৎ; এমন কি ইথারই তড়িতের প্রতিরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইথারই তড়িৎ সমষ্টি; এবং আলোক, চুম্বক শক্তি, স্থির অথবা সঞ্চরণশীল উভয় তড়িৎ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই ইথারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। প্রবাহ, বিস্তার, বিকিরণ, সমাঘাত, ইত্যাদি বহুবিধ বৈদ্যুতিক বিষয়ের মীমাংসার

প্রধান পদার্থই ইথার। সেই জন্য ইহার ধর্ম্ম ও শক্তির আলোচনা বিশেষ আবশ্যক।

সার অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) কর্ত্তৃক অনুমিত প্রোজ্জ্বল বা ভাস্বর (lumininferous) ইথার বলবিজ্ঞানের ও আভাসিক বলবিজ্ঞানের (quasi mechanical) কতকগুলি ধর্ম্মসম্পন্ন। যথা চলিষ্ণুতা এবং অসঙ্কোচ্যতা, অর্থাৎ আয়তনের অসীম-স্থিতি-স্থাপকতার—সঙ্গে সঙ্গে গঠনেরও কতক পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপকতা। তিনি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, ইথার, দুইটি বিরুদ্ধভাব সম্পন্ন উপাদান সমুৎপন্ন,—একটি পর তড়িৎ এবং অন্যটি অপর তড়িৎ। এই দুইটি উপাদান এরূপে সম্পৃক্ত যে একটি যাহা কিছু করিবে, অন্যটি তৎক্ষণাৎ তাহার ঠিক বিপরীত এবং সম্পূর্ণ সমান-শক্তি-সম্পন্ন কার্য্য সম্পাদন করিবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ইথার গঠনে একরূপ বায়বীয় পদার্থের ন্যায়; কিন্তু বায়বীয় হইলেও ইহা কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা বিশিষ্ট, অথচ বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকধর্ম্মসম্পন্ন। ইহার ঘনত্ব বা নিবিড়ত্ব জলের নিবিড়তার ১০,০০,০০,০০,০০ অংশের ৯৩৬ অংশের সমান, এবং কাঠিন্য ইস্পাতের কাঠিন্যের ১০,০০,০০,০০,০০,০০ অংশের এক অংশের সমান। কেহ কেহ ইহাকে সমস্ত স্থান পরিব্যাপক জেলীর (jelly) ন্যায় মনে করেন; এবং ইহাতে আলোক, অন্যান্য দীপ্তিমান প্রাকৃতিক তেজঃসঞ্জাত ও electro-magnetic তরঙ্গমালা ক্রমাগত স্পন্দিত হইতেছে। সাধারণ পদার্থের কণিকা সকল অনায়াসে এবং নির্ব্বিঘ্নে ইথারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে; পদার্থের অণুমধ্যস্থিত স্থানেও ইথার বর্ত্তমান; কোন স্থান হইতে, কোন শূন্যগর্ভ স্থান হইতে, এমন কি যে স্থান হইতে বায়ু অপসারিত হইয়াছে, এরূপ স্থান হইতেও ইথার নিষ্কাশিত করা অসম্ভব।

অতি দূরস্থিত পদার্থ নিঃসৃত আলোক রশ্মি পরিবাহিত হইয়া আমাদের নয়ন গোচর হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই ইহার অনুমান উদ্ভুত হইয়াছিল। শূন্য মার্গে কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের আলোকরশ্মি পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে কতদিন,

কত মাস, কত বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যায়। কোন নক্ষত্র সৃষ্ট হইবার হয়ত এক সহস্র বৎসর পরে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। সেই নক্ষত্র হয়ত এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে এক শত বৎসর আবশ্যক হয়। কাজেই সেই নক্ষত্র ধ্বংশ হইবার পরেও আমরা এক শত বৎসর তাহার আলোক দেখিতে পাইব। কেন না পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে তাহার শেষ রশ্মির এক শত বৎসর প্রয়োজন হইবে। আমরা আকাশে অনেক আলোক রশ্মি দেখিয়া থাকি; কিন্তু সেই রশ্মির উৎপত্তি স্থল অনেক দিন—বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এরূপও সম্ভব, হয়ত শূন্যমার্গে আরও শত শত সূর্য্য রহিয়াছে, তাহাদের রশ্মি এখনও ব্যোম পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয় নাই, ভবিষ্যতে সেই সূর্য্য রশ্মি আমাদের নয়ন গোচর হইলে বুঝিব যে জ্যোতিষ্ক জগতে আর একটি ভাস্বর পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সূর্য্য আলোক প্রদানে বিরত হইবার অব্যবহিত পর হইতে ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত আমরা আলোক রশ্মি দেখিতে পাইয়া থাকি। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈজ্ঞানিক ক্যামিলি ফ্ল্যামেরিও (Camile Flamarion) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ইউরেনিয়ায় (Urania) এ সম্বন্ধে একটু সুন্দর আভাস দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইউরেনিয়া বলিতেছেন :—"আমরা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে পৃথিবীর আলোক এখানে উপস্থিত হইতে, জুলিয়াস সিজারের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যত সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তত সময় আবশ্যক হইবে। সেই বীরের সমসাময়িক যে সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, সেই রশ্মি এত দিনে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলো মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৮৬,৩৫৪ এক লক্ষ ছিয়াসি হাজার তিনশত চুয়ান্ন মাইল। আলোকের গতি ক্ষীপ্র, বাস্তবিকই অতি ক্ষীপ্র, কিন্তু মুহূর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিচালিত ও পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর নরনারী আমাদের সন্নিহিত নক্ষত্র সমূহের বর্ত্তমান আকৃতি দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু যে আলোক রশ্মি তাহাদের নয়ন গোচর হইতেছে, সেই রশ্মি এই সমস্ত নক্ষত্র হইতে যে

দিন নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে ইহাদের শারীরিক গঠন বা প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহাই দেখিতেছে, কাজেই তাহারা ইহাদের ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা অবলোকন করিতেছে। কেহই পৃথিবী হইতে বা ব্যোমপথের কোন স্থান হইতে কোন নক্ষত্রের দর্শনকালীন অবস্থা দেখিতে পায় না; তাহাদের অতীত অবস্থারই আভাস পায় মাত্র; যে যত দূরে অবস্থিত, সে ততই তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা আরও অতীত ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি দূরবিক্ষণযন্ত্রে বিলয় প্রাপ্ত বহু নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। আমাদের নয়ন পথে সাধারণতঃ যে সমস্ত নক্ষত্র পতিত হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা Spectroscope (আলোক-বিশ্লেষক-যন্ত্র বিশেষ) সাহায্যে কোন্ কোন্ নভঃস্তূপ (nebula) কি কি পদার্থে সংগঠিত, তাহা অতি সহজে বিশ্লেষিত করিতে পারি। কিন্তু যে নভঃস্তূপ বিশ্লেষিত করিতেছি, তাহা হয়ত বর্ত্তমানে আর নভঃস্তূপ নাই, কোন সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে। অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত সুন্দর মৃদুলোহিতালোকোজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাও, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যদি আমারা সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম না। মহাকাশনিবিষ্ট অনন্ত সূর্য্য নিঃসৃত আলোক, অথবা সেই সমস্ত সূর্য্যোদ্ভাসিত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পৃথিবী প্রতিবিম্বিত আলোক, সেই সমস্ত পৃথিবী উপরিস্থিত যত কিছু কার্য্যের, যত কিছু ঘটনার, মুহূর্ত্তে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারাও আলোকচিত্র লইয়া শূন্যে, মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত অপরিমেয় গতিতে প্রধাবিত হইতেছে। একটি নক্ষত্র দেখিতেছ,—যাহা দেখিতেছ, সেই পদার্থ বা সেই জ্যোতিঃ সেই নক্ষত্র হইতে বহির্গত হইবার সময়ের যে অবস্থা তাহাই দেখিতেছ। দূরে কামান গর্জ্জন করিল, তুমি আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলে, ধূম দেখিতে পাইলে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনিতে পাইলে না। একটু পরে কাণে আওয়াজ প্রবেশ করিল। ঐ শব্দটুকু আসিতে সময় লাগিয়াছে। কামান হইতে শব্দ বিনির্গত হইয়া, ও মধ্যপথের বায়ু টুকু তরঙ্গায়িত করিয়া তোমার কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আরও দূরে থাকিলে আরও বিলম্বে শব্দ

শুনিতে পাইত।' সেইরূপ আলোকও কোন পদার্থ হইতে বিনির্গত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সময় গ্রহণ করে, কাজেই তুমি আলোক নির্গত হইবার সময়ের অবস্থাই জানিতে পার।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সুদূর ইতিহাসের আলোক-চিত্র এখনও শূন্যপথে পরিবাহিত হইতেছে। হল্‌দিঘাটের মহাযুদ্ধের ছবি এখনও মহাশূন্যে ছুটিতেছে, চিরকাল ছুটিবে, কখনও বিনষ্ট হইবে না। অনন্তের সুবিশাল বক্ষঃস্থলের কোনও না কোন স্থানে আমাদের ক্রিয়া-বলীর ছবি চির সুদীপ্ত, ও চির অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত-কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, তবে আমাদের পৃথিবীর বা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণের পরমায়ু নিশ্চয়ই শেষ হইবে। কেবল তাহাদের স্মৃতির জন্য অনন্তের বক্ষঃস্থলে একটি সচঞ্চল উজ্জ্বলছবি চির বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু আবার নূতন তপন সৃষ্ট হইবে, তখন নূতন ধরণী নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়া, নূতন নির্ঝর, নব কিসলয়ে নূতন রূপে হাসিতে থাকিবে, এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নূতন জীবন সৃষ্ট হইয়া নূতন লাবণ্যে পরিস্ফুট হইবে।

যাহা হউক আমরা তড়িতের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, সমস্তই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, কাজেই ইহা সকলেরই প্রীতিপদ হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

আলোকের জন্য যে ইথারের প্রয়োজন, তড়িতের ক্রিয়াবলী বা নিয়মাবলীর পদ্ধতি স্থিরীকৃত করিতে হইলেও সেই ইথারেরই প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা তরঙ্গ ঠিক আলোক তরঙ্গেরই অনুরূপ। পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ, অন্য পদার্থ হইতে প্রতিফলন, পরিবর্ত্তন, বক্রীভবন, সমাঘাত, শোষণ ও বিপরীত প্রবাহ,—এই সমস্ত ব্যাপারে তড়িৎ আলো-কেরই ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। অপ্রতিবন্ধ মুক্ত ইথারে আলোক ও তড়িৎ বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে অবিভিন্ন। সার অলিভার লজ্ বলিয়াছেন, যে বিভিন্ন উপায়ে এবং যতদূর সম্ভব নির্দোষ এবং ভ্রমশূন্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে alternating machine উৎপন্ন তড়িৎবিক্ষোভ (disturbance) অর্থাৎ তড়িৎ সঞ্জাত প্রকাণ্ড, অতি দীর্ঘ ইথার তরঙ্গ

বায়ু মধ্য দিয়া, অর্থাৎ মুক্ত পথে আলোক তরঙ্গের সহিত সমবেগে প্রধাবিত হইয়া থাকে। আলোক তরঙ্গ এত ক্ষুদ্র যে সেরূপ এক সহস্র তরঙ্গমালা এক ইঞ্চ পরিমিত স্থানে অনায়াসে পরিবদ্ধ হইতে পারে। আবার তড়িৎ তরঙ্গ এত দীর্ঘ যে তাহাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য শত সহস্র মাইল। কিন্তু উভয় তরঙ্গেরই গতির বেগ বা দ্রুততার মধ্যে কোন পার্থক্য বোধগম্য হয় না। অপ্রতিহত বা উন্মুক্ত ইথারেই এরূপ সম্ভব। একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চের সহস্র ভাগের এক ভাগ এবং অপরটি শত সহস্র মাইল। অথচ উভয়েরই দ্রুততা সমান। ইহা বাস্তবিকই অশ্রুতপূর্ব্ব ও অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। এরূপ বলিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মানবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা ইথার গঠনে এবং প্রকৃতিতে অধিকতরজটিলতাশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন, এবং সর্ব্বত্র সম নিবিড়তাবিশিষ্ট। অথবা যদি ইথার গঠনে কুত্রাপি অসম-নিবড়িতাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেও ইহার কণাগুলি এত ক্ষুদ্র ও এত সূক্ষ্ম যে আলোকতরঙ্গ তড়িৎতরঙ্গের পক্ষে, অর্থাৎ শত সহস্র মাইল ও এক ইঞ্চির সহস্রাংশের এক অংশ এই উভয় তরঙ্গেরই পরিমাণ বস্তুতঃ এক শ্রেণীর আয়তনভুক্ত। কাজেই ইথার অতিদীর্ঘ ও অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নির্ব্বিবাদে একই ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তড়িৎ বিক্ষোভ, প্রসারণ বা অন্য যত কিছু সমস্ত বিষয়ে এই কাল্পনিক ইথারই সর্ব্বপ্রধান মার্গস্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

সংক্রমদোষশোধক দ্রব্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। ইহার ফল অবশ্য অনেক সময়েই বিষময় হইয়া পড়ে। কোন পল্লীতে সংক্রামক রোগ একবার প্রবেশ করিলে, তাহা এমনই ভীষণভাব ধারণ করিয়া ফেলে, যে তখন প্রতীকারের উপায় কল্পনা করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রতিদেশের লোকেই অল্পাধিক পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন। তবে আমাদের দেশের অবস্থা অন্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। কোন ব্রাহ্মণ কন্যা অতিশয় অপরিষ্কার, স্থানে স্থানে তৈলাক্ত এরূপ একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়াও, সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাঁহার অপেক্ষা অন্য নীচ জাতীয় কোন লোককে স্পর্শ করিলেই অশুচী হইয়া পড়েন। এই সমস্ত সংস্কার-দোষ তত শুভকর নহে। অবশ্য সুদূর অতীতে আমাদের দেশ পরিচ্ছন্নতার আদর্শ ছিল। সে আদর্শ এখন অপকৃষ্ট ও অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। রন্ধনশালার দিকে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। অত্যন্ত অপরিষ্কার, আদ্র, সেঁতা এবং অন্ধকার গৃহই আমাদের রন্ধনগৃহ। সেখানে শত শত তৈলপায়িক উড়িয়া বেড়ায়, এবং চারিদিকে ক্রমাগত পূতিগন্ধ নির্গত হয়। যে স্থানে আমাদের জীবন ধারণের উপাদান প্রস্তুত হইতেছে, সেই স্থানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এরূপ অবহেলা বাস্তবিকই বড় শোচনীয়। আবার যে স্থানে শিশু প্রথম ভূমিষ্ট হয়, সেই সূতিকা গৃহ যত দূর অপরিষ্কার এবং বাসের অযোগ্য হইতে পারে, আমরা তাহাই করিয়া থাকি। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সমস্ত অপরাধের মুল স্ত্রীজাতি। সূতিকা গৃহ আমরা ভাল করিতে চাহিলেও, স্ত্রীজাতিই কুসংস্কারবশতঃ আমাদের ইচ্ছার ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে অনেকে পূতিগন্ধ প্রতিশোধকের উপায় পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমরা যে সমস্ত প্রতিশোধক ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা সেই কার্য্যের জন্য কতটুকু উপযোগী তাহা একবারও ভাবি না। অনেক সময়ে ক্লোরিণ বা কারবলিক এসিডের ন্যায় কোনরূপ তীব্র গন্ধ

পাইলেই মনে করিয়া থাকি যে ইহা দুর্গন্ধ ও সংক্রমদোষপ্রতিশোধক; অথবা প্রতিশোধকরূপে ব্যবহারের জন্য দুর্ব্বোধ্য এবং প্রকাণ্ড-নাম-যুক্ত কোন একটা পদার্থ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিলেই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করি। এই সমস্ত বাস্তবিকই একবারে অপদার্থ, সেই সমস্ত পদার্থ ব্যবহারে কোন উপকার পাওয়া যায় না। কোন কোনটাতে উপকার পাওয়া যাইলেও তাহাদের মূল্য এত অধিক, যে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। প্রতিশোধক এরূপ হওয়া প্রয়োজনীয় যে তদ্দারা রোগের সংক্রামকত্ব এবং দুর্গন্ধের বিষ উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। তন্মধ্যে রোগের সংক্রামকত্ব নাশই প্রধান। দুর্গন্ধ নিবারক পদার্থ মাত্রেই সংক্রামকত্ব-দোষ-প্রতিশোধক নহে; এবং সংক্রামকত্ব-প্রতিশোধকের হয়ত কোনরূপ গন্ধও না থাকিতে পারে, ঐরূপ হইলেও সেই গুলি ব্যবহারে দুর্গন্ধ এবং সক্রামক জনিত উভয় বিষই নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু যতই দুর্গন্ধ নিবারক বা সংক্রামকত্ব-প্রতিশোধক ব্যবহার করি না কেন, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে, ঐ সমস্ত পদার্থের দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাইবে না। নিম্নে কয়েকটি সংক্রামক দোষ শোধক পদার্থ ও তাহাদের ব্যবহার প্রথা সন্নিবিষ্ট হইল।

গন্ধক ও আমলা সার (Brimstone) ধূম প্রদানার্থে (Fumigation) ব্যবহৃত হইতে পারে। জলপ্রণালী, নর্দ্দামা এবং মৃত্তিকায় তুঁতে কিম্বা হীরাকস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঢালিয়া দিলেই চলিতে পারে। ইহাতে জলের ভাগ এক গ্যালন এবং হীরাকস কিম্বা তুঁতের পরিমাণ ১॥ পাউণ্ড হইলেই ভাল হয়। ৪ আউন্স জিঙ্ক সালফেট, ২ আউন্স সাধারণ লবণ, ১ গ্যালন জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে বস্ত্রাদি রীতিমত ধৌত করিলে বস্ত্রের সংক্রামত্ব দূর হয়। অনেকে উপরোক্ত পদার্থ গুলির সহিত কারবলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া দেন। অভিজ্ঞগণ সে প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী নহে। কেন না সাধারণ-ব্যবহারের জন্য কিরূপ কারবলিক এসিড আবশ্যক হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন; অধিকন্তু প্রয়োজনানুরূপ শক্তি বিশিষ্ট এসিড ক্রয় করাও ক্রেতার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। ভাল বারবলিক এসিডের মূল্য অত্যন্ত অধিক,

এবং ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে কোন কাজে লাগে না। ইহার তীব্র গন্ধে সকলেই মনে করেন যে বুঝি সংক্রামক বীজ বিনষ্ট হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। সংক্রামক-রোগ-পীড়িতের গৃহে বায়ুর চলাচল ও আলোক প্রবেশের পথ থাকিলে সে গৃহে কোনরূপ প্রতি-শোধক পদার্থ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই গৃহ হইতে রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত জিঙ্ক সালফেটের দ্রাবণে রীতিমত ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। এই দ্রাবণ উত্তপ্ত করিয়া লইলে আরও ভাল হয়। রোগীর মল মূত্র, ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই তুঁতের দ্রাবণে তৎক্ষণাৎ ঢালিয়া দেওয়া উচিত। রোগীর ব্যবহৃত সমস্ত গ্ল্যাস ইত্যাদি উক্ত তুঁতের দ্রাবণে ডুবাইয়া অবশেষে রীতিমত মাজিয়া লইতে হয়। সংক্রামক-রোগ-পীড়িতের গৃহে, রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিষ ভিন্ন অন্য সমস্তই রোগীর গৃহ প্রবেশের পূর্ব্বেই অপসরিত করা উচিত। যদি কোন পদার্থ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে রোগী সুস্থ হইবার পর পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা রীতিমত বিশুদ্ধ করতঃ তবে গৃহের বাহির করা উচিত।

রোগী সুস্থ হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহে গন্ধকের ধূম প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয়। গদী খাট, ভারি কারপেট, ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বেই অপসারিত করা যাইতে পারে না, তৎসমুদায় পৃথক পৃথক বিছাইয়া তবে গৃহে ধূম প্রদান করা উচিত। কেন না ধূম লাগিয়া সে গুলিও বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইঁটের উপর একটা লৌহ পাত্রে গন্ধক রাখিয়া গন্ধকে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া ঘর অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করিয়া রাখিলে, ঘরের সংক্রামকত্ব বিদূরিত হইতে পারে। ধূম নিষ্ক্রান্ত হইবার সমস্ত পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা অত্যন্ত আবশ্যক। ১০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চাওড়া এরূপ গৃহের জন্য অন্ততঃ এক সের গন্ধক আবশ্যক হয়। ঘর যত বড় হইবে গন্ধকের পরিমাণও এই অনুপাতে তত বেশী হওয়া আবশ্যক। এক ব্যারেল জলে, একটা ঝুড়িতে করিয়া অর্দ্ধমন তুঁতে ঝুলাইয়া রাখিলে তুঁতে শীঘ্রই গলিয়া যায়। এই জল দিয়া নর্দ্দামা, পায়খানা ইত্যাদি প্রতিদিন দুইবার করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই ভাল হয়। রোগীর

ব্যবহৃত কাপড় চোপড় বা শয্যা ইত্যাদি একবারে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। জিনিষ গুলি মূল্যবান হইলে অনেক সময়ে দগ্ধ করিতে পারা যায় না। কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র, ফ্লানেল, কম্বল ইত্যাদি জিঙ্ক সলিউসনের জলে আধঘণ্টা ফুটাইয়া লইলেই ভাল হয়। প্রত্যেক কাপড় যাহাতে রীতিমত ভিজিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পশমী, রেশমী, কাপড় হইলে ধূম প্রদানের সময় সে গুলি টাঙ্গাইয়া দেওয়া উচিত। জামার পকেট পর্য্যন্ত উল্টাইয়া একবারে বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বালিশ, গদির তুলা বাহির করিয়া ধূম প্রদান করাই ভাল। এই ধূম প্রদানের পর সমস্ত পদার্থকেই রীতিমত রৌদ্রে রাখা উচিত। পায়খানা বা ঐরূপ কোন স্থানে পার্চমেণ্ট কাগজের নির্ম্মিত থলিতে ব্লিচিং পাউডার পূরিয়া রাখিয়া দিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হয়। আজকাল রাসায়নিকগণের মতে কোন পদার্থই একবারে সংক্রামকত্ব প্রতিশোধক নহে। ঐরূপে যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই রোগ বীজাণুর উৎপত্তি স্থগিত রাখিতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে-উৎপন্ন-রোগ-বীজাণুর কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। কলিকাতায় দুর্গন্ধের প্রধান কারণ নর্দ্দামা এবং পায়খানা; এবং দুইটিই রোগের আকর স্বরূপ। নর্দ্দামা প্রতিদিন পরিষ্কার না রাখিলে সে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেখানে যখনই কোন দুর্গন্ধ উদ্ভূত হইবে, তৎক্ষণাৎ তুঁতে কিম্বা হিরাকসের জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। কাপড় চোপড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। দরিদ্র বা অল্প-বিত্ত হইলেই যে ময়লা কাপড় পড়িতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সাবান দিয়া হউক, সাজি মাটী দিয়া হউক, যেমন করিয়া সম্ভব, সমস্ত কাপড় চোপড় সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কাচিয়া ফেলা উচিত।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

———

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার ১৭৮। খৃঃ অব্দে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন; তিনি চারিবার উক্ত সম্মানার্হ ও দায়ীত্ব পূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন; ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সদস্যের পদও পরিত্যাগ করেন।

আমরা আজ কাল "স্বদেশ ভক্ত" আখ্যা পাইবার জন্য দেশে বিদেশে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছি। সুবিধা এবং অবসর পাইলে "আমি স্বদেশ অনুরক্ত" এই ভাব টুকু কয়সঙ্গী বা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ে বুঝাইযা দিয়া তবে নিরস্ত হই। মুখে এবং বক্তৃতায় স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইযা পড়ি। আজ কাল যাঁহারা ঘোরতর স্বদেশী তাঁহারা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ কি তাহা বুঝিতেও পারিতেন না। আমি স্বদেশ অনুরক্ত না হইলেও পাঁচ জনের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া, বা নিন্দার ভয়েও আজ কাল স্বদেশী হইতে বাধ্য হইয়া পড়ি। কিন্তু যখন স্বদেশীর কথা লোকে জানিত না, যখন লোকে জাতীয়তায় জলাঞ্জলী দিয়া সাহেবী হ্যাট কোট পরিতে পাইলে বা পরিবার সুযোগ পাইলে ধন্য হইত, যখন সাহেবী পোষাক পরিহিত লোকেই ভদ্র বলিয়া অভিহিত ও গণ্য হইত, সেই সময়ে যাঁহারা জাতীয়তা রক্ষা করিয়া গিযাছেন, যাঁহারা জাতীয়তার জন্য স্বচ্ছন্দে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক স্বদেশ প্রেমিক। এত স্বদেশ সম্বন্ধে আন্দোলনের সময়েও অনেকে হ্যাট কোট পরিতে পাইলে সুখী হন এবং অসভ্যতার নিদর্শন মনে করিযা ধুতি পরিধানে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন। আজ কাল কত টুকু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইযাছে, স্বদেশপ্রেমিকতা ভারত বাসীর মনে কত টুকু উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান অত্যন্ত অল্প; কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালীর যাহা কিছু

স্বদেশের, যাহা কিছু স্বদেশজাত, এমনকি বাঙ্গালীত্বই ঘৃণার আস্পদ ছিল। ডাক্তার সরকার ইংরাজী শিক্ষিত। তাঁহার চরিত্র ইংরাজের সদ্‌গুণ সমূহে গঠিত, তাই তিনি সাহেবীয়ানার প্রবল বন্যার মধ্যে পড়িয়াও জাতীয়তা সংরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের তৎকালিক কোন প্রসিদ্ধ এবং উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার পারিবারিক চিকীৎসার্থে ডাক্তার সরকারকে নিযুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কোন লোকের দ্বারা অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইলে তাঁহার আবাসে যাইবার সময়, ধুতির পরিবর্ত্তে ডাক্তার সরকারকে হ্যাট কোট পরিধান করিয়া যাইতে হইবে, এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। অবশ্য উক্ত কর্ম্মচারীর আলয় রোগীর আবাসভূমি ছিল না। কাজেই ডাক্তার সরকারকে যে তাঁহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাও নহে। একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের পারিবারিক চিকীৎসক হওয়া বাস্তবিক সম্মানও বটে। যে ভদ্রলোকটি সাহেবের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, আপনি স্বীকৃত হইলে বাৎসরিক এক সহস্র মুদ্রা পাইবেন। ডাক্তার সরকারও অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই সজ্জা পরিবর্ত্তনের আভাস পাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অসংক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন "এরূপ অসঙ্গত নিয়মে বাধ্য হইয়া বাৎসরিক বিংশ সহস্র মুদ্রা পাইলেও আমি সম্মত হইব না।" বাঙ্গালীর যাহা কিছু জাতীয়তা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই ধুতি চাদরে। যে দিন বাঙ্গালী ধুতি চাদর পরিত্যাগ করিবে, সে দিন বাঙ্গালীর জাতীয়তাও অন্তর্হিত হইবে। ডাক্তার সরকারের অনুমান বোধ হয় এইরূপই ছিল। তাই তিনি স্বার্থের জন্য, সামান্য কয়েক শত মুদ্রার জন্য জাতীয়তার শেষচিহ্ন টুকু বিসর্জ্জন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তবে কি তিনি কখনও অন্যরূপ পোষাক পরিধান করিতেন না? যখন জন্মভূমির সেবার জন্য তিনি আহূত হইতেন, যখন স্বদেশবাসীর কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইতেন, তখন প্রয়োজন হইলে অনিচ্ছা সত্বেও পায়জামা, চোগা, চাপকান পরিধান করিতেন। বিচার বিভাগে, ব্যবস্থাপক সভায় এবং অন্যান্য নিঃস্বার্থ দেশের কার্য্যে বেশ-

পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। তিনি বুঝিতেন, সদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য, দেশের কার্য্যোদ্ধারের জন্য, স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য সমস্ত চেষ্টার শুভফল পাইবার ইহাই অলঙ্ঘনীয়, ও অপরিহার্য্য মার্গ স্বরূপ। কিন্তু জাতীয়তায় বলি দিয়া যখন স্বার্থসিদ্ধি হইবে, বা ক্ষণবিধ্বংসী ধনভাণ্ডার পরিপূরিত হইবে; 'এরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আসক্তিই বাঙ্গালীর স্বদেশ প্রীতি এবং স্বজাতি প্রীতি। ইউনিয়ান জ্যাক, বৃটিশ জাতীয় পতাকা, মূল্যে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র মাত্র। কিন্তু কোন্ ইংরাজ ইউনিয়ান জ্যাক দৃষ্টে উৎফুল্ল হইয়া না উঠে? কোন্ ইংরাজ জাতীয়পতাকা শত্রুর কবল হইতে রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয়? ডাক্তার সরকারের জীবনে এরূপ জাতীয়পতাকা রক্ষার অবসর হয় নাই, ভবিষ্যতে কোন বাঙ্গালীর হইবে কিনা তাহাই কে বলিতে পারে? কিন্তু সরকার মহাশয় জীবনে যে টুকু রক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি অতীব সম্মান সহকারে, এবং প্রাণপণ যত্নে, রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক বিষয়ে আধুনিক স্বদেশভক্ত বাঙ্গালীর অপেক্ষা অধিকতর স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ লাভয়সিয়র (Lavoisier) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি দেখাইয়াছিলেন, এবং ইনিও পরিমাণ সংক্রান্ত (Quantitative) রসায়ন শাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য পণ্ডিতেরা উক্ত বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু লাভয়সিয়রই সর্ব্ব প্রথম

পদার্থের অবিনশ্বরতা (Indestructibility of matter) সপ্রমাণ করেন। তাঁহার মতে দুইটি বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সময় উহাদের মধ্যে একের কোন একটি অংশ অপরের সহিত মিলিত হয় এবং অপরের কোন একটি অংশ পূর্ব্বের অবশিষ্ট অংশের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এবং উভয়েরই মোট ওজন সমান থাকিয়া যায়। এই সত্যটি পরীক্ষা করিতে হইলে অতি সূক্ষ্ম একটি তুলাদণ্ডের (Balance) প্রয়োজন হয়। ১৭৭০ খ্রীঃ অঃ লাভয়সিয়র ঐরূপ তুলাদণ্ডের সাহায্যে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করেন। পূর্ব্বে সকলে জানিতেন যে জল হইতে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক জল গরম হইলে উহা মৃত্তিকাতে পরিণত হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি একটি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ এবং ওজন করা কাচপাত্রে জল রাখিয়া উহাকে একশত এক দিন ধরিয়া ক্রমাগত গরম করিয়াছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে উহাকে পুনরায় ওজন করিয়া দেখিলেন যে উহার ভারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরে যখন পাত্র হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন যে ঐ পাত্রের ওজন প্রায় ১৭·৪ গ্রেণ হ্রাস হইয়াছে; এবং জলকে বাষ্পাকারে দূর করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে প্রায় ২০·৪ গ্রেন কঠিন দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়াছিল। ৩·০ গ্রেন বৃদ্ধির কারণ পরীক্ষামূলক ভ্রম (Experimental Error) বলা যাইতে পারে। কিছু পরে শীলও (Scheele) ঐ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে ঐ কঠিন দ্রব্যটি কাচের একটি অংশ ; বস্তুতঃ উহা Alkaline silicate ছিল।

ইহার পরে লাভয়সিয়র ফ্লজিষ্টন (Phlogiston) মতের সত্যাসত্য স্থির করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি এই মতটিকে একেবারে ভ্রমাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সেই অবধি কেহই আর এই মতের পোষকতা করেন না। ১৭৭২ খৃঃ অঃ তিনি ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, যখন গন্ধক এবং ফস্ফরাস বায়ুতে দগ্ধ করা যায়, তখন উহাদের ওজনের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে অনেক পরিমাণ বায়ু

একেবাবে উহাদেব মধ্যে মিলিয়া যায়। বাস্তবিক যখন কোন বস্তুকে বায়ুব মধ্যে দগ্ধ কবা যায় তখন তাহাব ওজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ সেই বস্তুব সহিত অপব কোন একটি বস্তু মিলিত হয়। এস্থলে শেষোক্ত বস্তুটি অক্সিজন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইটি প্রমাণ করিবাব নিমিত্ত তিনি কতকটা লিথার্জ Litharge (অর্থাৎ সীসক এবং অক্সিজনেব একটি যৌগিক পদার্থ) লইয়া উহাব সহিত কয়লা মিশ্রিত করতঃ অগ্নিব উত্তাপ প্রয়োগ কবেন, তাহাতে কয়লা ঐ অক্সিজনেব সহিত মিলিত হইয়া লিথার্জকে সীসকে পবিণত কবে। তিনি দেখিলেন যে ঐ সীসকেব ওজন এখন লিথার্জ হইতে অনেক কম হইয়া গিযাছে। কাবণ লিথার্জেব সহিত যেটুকু অক্সিজন মিলিত হইয়া ছিল, এক্ষণে তাহা কয়লার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সুতবাং সীসকটী ধাতু অবস্থায় পড়িয়া বহিল।

১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ তিনি আব একটি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি, (১) নিশ্বাস ত্যাগেব সময়ে যে বায়ু বহির্গত হয় (২) কতকগুলি বস্তুব দহন (Combustion) কালে যে বায়ু উৎপন্ন হয় এবং (৩) বস্তুব গাঁজন (Fermentation) সময়ে যে বায়ু নির্গত হয় এই কয়েকটি বায়ুব ধর্ম্ম ও প্রকৃতি বিশদ ভাবে বর্ণনা কবিযা ছিলেন। এইরূপ পবীক্ষা ব্ল্যাক (Black) বহু পূর্ব্বে কবিযা গিয়াছিলেন, কিন্তু লাভয়-সিয়ব তাঁহাব এই প্রবন্ধেব কোন স্থানে ব্ল্যাকেব নাম উল্লেখও পর্য্যন্ত কবেন নাই। ইহাব কাবণ আমবা কিছুই অনুমান কবিতে পাবি না। তবে লাভয়সিয়ব এব' ব্ল্যাকের সহিত যে সমস্ত পত্রাদি চলিত তাহাব এক স্থানে লাভয়সিয়ব ব্ল্যাককে শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকাব কবিয়াছিলেন।

ঐ বৎসব তিনি আবও কয়েকটী পবীক্ষা কবিযা ছিলেম। তন্মধ্যে একটি পবীক্ষা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে কবিয়াছিলেন। একটি বদ্ধ কাচেব গোলকেব মধ্যে খানিকটা সীসক বাখিয়া অগ্নি প্রয়োগ করেন। কিছুকাল এইরূপে অগ্নিতে দগ্ধ কবিয়া দেখিলেন ঐ সীসকসহ গোলক-টীব ওজন পূর্ব্বমত একই ভাবে বহিয়াছে ; কিন্তু যখন ঐ গোলকটীতে একটি ছিদ্র কবা হইল তখন উহাব মধ্যে সজোরে বায়ু প্রবেশ করিয়া

উহার ওজন বৃদ্ধি করিয়া দিল। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে কতকটা বায়ু সীসকের দ্বারা শোষিত হইয়া গিয়াছে; এবং অবশিষ্ট বায়ু যাহা সীসকের দ্বারা শোষিত হয় নাই তাহা স্বাভাবিক বায়ু হইতে বিভিন্ন এবং উহার ধর্ম্মও বিভিন্ন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, যে স্বাভাবিক বায়ুতে দুই প্রকারের বায়ু বর্ত্তমান আছে এবং উহাদের ধর্ম্মও বিভিন্ন। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রিষ্টলির (Priestley) নবাবিস্কৃত অক্সিজেনের বিষয় লাভয়সিয়র জ্ঞাত ছিলেন না।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রতিমূর্ত্তী।

সর্ব্বপ্রথমে কিসের ফটো তুলিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে কারণ প্রতিমূর্ত্তি তোলা ও দৃশ্য তোলার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। তবে, এখন ধরিয়া লওয়া গেল যেন প্রতিমূর্ত্তি তোলারই ইচ্ছা, তাহা হইলে কোন সুবিধামত আলোকিত স্থানে ক্যামেরা আনিয়া ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে লাগাইয়া খাটাইয়া লইতে হয়। এ বিষয় আমি ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার কথাই বলিতেছি। ক্যামেরা ঠিক করিয়া যদি ক্যাপ থাকে তাহা হইলে তাহা খুলিতে হইবে, শাটার থাকিলে তাহা টিপিয়া খুলিতে হইবে, খুলিয়া ফোকাস করিতে হইবে। ফটোগ্রাফ শিক্ষার্থী সর্ব্বপ্রথমে আত্মীয়স্বজনের প্রতিমূর্ত্তি তুলিতেই উৎসুক হয়। প্রতিমূর্ত্তি দুইরকম স্থানে তোলা যায় গৃহের বাহিরে ও তৈয়ারী করা ষ্টুডিওতে। কিন্তু শিক্ষার্থীর ষ্টুডিও থাকা সম্ভব নহে সেজন্য সে সম্বন্ধে বলিব না। এতদ্ভিন্ন সাধারণ গৃহের মধ্যেও ছবি তোলা যায়, তবে বেশী এক্সপোসার দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

প্রতিমূর্ত্তি তোলা প্রথম প্রথম খুব সহজ বোধ হইতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম।

সাধারণতঃ যে লেন্স ব্যবহৃত হয় তাহাতেই প্রতিমূর্ত্তি তোলা যাইতে পারে; অবশ্য তাহার ডায়াফ্রাম অন্ততঃ f৮ হওয়া আবশ্যক। যদি f১১ দেওয়া দৃশ্য তুলিবার লেন্স (landscape lens) থাকে তাহাতেও হইতে পারে, অবশ্য ইহাতে বেশীক্ষণ এক্স্পোসার লাগিবে। আজকাল f৪, f৫ প্রভৃতি ডায়াফ্রামওয়ালা লেন্স বিক্রয় হয়। ইহাতে প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যও হয়। প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য যে লেন্স বিশেষ করিয়া প্রস্তুত হয় তাহাকে পোর্ট্রেট লেন্স (portrait lens) বলে। শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা সুবিধাজনক নহে কারণ ইহা আজকালকার-প্রস্তুত ক্যামেরার পক্ষে খুব ভারী ও ইহা দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি তোলা ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় না।

প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে ফাষ্ট (fast) প্লেট ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহাতে খুব কম এক্স্পোসার দিতে হয় ও বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের ও নার্ভাস (nervous) রোগীদিগের ছবি তুলিতে ইহার প্রয়োজন হয়। আইসোক্রোমাটিক (isochromatic) প্লেট ব্যবহার করিলে মুখের দাগ ইত্যাদি বড় টের পাওয়া যায় না।

এখন গৃহের মধ্যেই ছবি তোলার কথা লিখিব। প্রথমে কোন প্রকার ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রয়োজন; গৃহের দেওয়ালেই চলিতে পারে কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকিলেই ভাল হয়। ইহা রং দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলেও চলে; কিম্বা সুবিধা হইলে একটা কিনিলেও হয়। নিজে প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক কম পড়ে। চাদর, শাল বা র‍্যাপার দিয়াও কাজ চলে।

ইহা ব্যতিত একটি রিফ্লেক্টর (reflector) প্রয়োজন। যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার মুখের একদিকে আলো আসিয়া পড়ে এবং অন্য দিকটা অন্ধকার থাকে, সেজন্য সেদিকে রিফ্লেক্টার দিলে অনেকটা আলোকিত হয়। কাহারও দ্বারা একখানা সাদা চাদর সেদিকে ধরিয়া রাখিলে হয় কিম্বা একটা কাঠের ফ্রেম করিয়া তাহাতে সাদা কাগজ

আঁটিয়া লইলে বেশ সুবিধা হয়। বাজারে যাহা বিক্রয় হয় তাহা অবশ্য খুবই ভাল ও তাহাতে নানারকম সুবিধা আছে।

যাহার ফটো তুলিতে হইবে তাহাকে ঠিক করিয়া বসান ও আলোর বন্দোবস্ত, এই দুইটিই প্রতিমূর্ত্তি তোলার মধ্যে প্রধান জিনিষ। যাঁহারা প্রথম ছবি তুলিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের পক্ষে বড় চিত্রকর কিম্বা ফটোগ্রাফের চিত্র ভাল করিয়া দেখিয়া চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হয়। কোন চিত্র পুস্তক দেখিয়া, কি প্রকার আলো পড়িলে ভাল চিত্র হয় ও কি ফল হয় ও কি প্রকারে লোককে বসাইলে ভাল ছবি হয় ও দেখিতে চিত্রোপযোগি হয় তাহা বেশ শিখিতে পারা যায়। সাধারণতঃ সকলের এক ভুল ধারণা আছে যে, যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার যে প্রকার সুবিধা হয় সেই প্রকারে বসাইয়া তুলিলেই ভাল ছবি হয়। আবার এই সকল ছবি দেখিয়া এই ভুল ধারণা দৃঢ় হইবে। কারণ যে সকল ফটোর মধ্যে এই প্রকার আয়াসে বসাইয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা সত্যই ঐরূপ করিয়া তোলা হয় নাই, বা হঠাৎ ঐরূপ হয় নাই অনেকদিন শিক্ষার ফলে ঐরূপ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

শিল্প ও বিবিধ।

কার্ব্বলিক টুথ পাউডার :—

কিসেলগর (খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ)	১ আউন্স
কার্ব্বলিক এসিড	১০ গ্রেন
সলুবল্ (soluble) স্যাকারিণ	১ ,,
আটা অফ্ রোজ	অতি সামান্য

গোলাপী রং করিতে হইলে যৎসামান্য কারমাইন রং মিশ্রিত করিতে হয়।

কোচের নিমিত্ত কাল ভার্ণিস্ ঃ—

আসফ্যাল্‌টাম	৭৷৷০	আউন্স
অম্বাব	৪০	আউন্স
বেজিন	৭৷৷০	আউন্স
লিনসিড্ তৈল	১৷০	পাঁইট

দুগ্ধ পরীক্ষা ঃ—

প্যাবিস প্ল্যাসটাব দুগ্ধে গুলিয়া কাঁদাব মত কবিতে হয়। উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইলে উক্ত প্লাসটাব শক্ত হইতে ১০ ঘণ্টা, সিকিভাগ জল মিশ্রিত হইলে ২ঘণ্টা, অৰ্দ্ধেক জল থাকিলে দেড ঘণ্টা, তিন ভাগ জল থাকিলে ৩০ মিনিট লাগে। জল যত বেশী হইবে, প্ল্যাসটাব তত শীঘ্র শক্ত হইয়া যাইবে।

বেলফাষ্ট নগবে লর্ডকেলভিনেব প্রতিমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে চাঁদা দাতৃ-গণেব এক সভায় স্থিব কৃত হইয়াছে, যে স্থানীয় সিটিহলেব প্রাঙ্গণে উক্ত মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে প্রতি বৎসব ২৩,০০০,০০০,০০০,০০০, ঘন আয়তন কাষ্ঠ ব্যয়িত হয়। উক্ত স্থানে উৎপন্ন কাষ্ঠেব পবিমাণ ৭,০০০ ০০০,০০০,০০০। আয় অপেক্ষা ব্যয তিন গুণেবও অধিকতব।

লিক অবসাবভেটবীব অধ্যক্ষ ক্যাম্পবেল সাহেব প্রমাণ কবিয়াছেন যে মঙ্গল গ্রহেব (Mars) বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পবিমাণে জলীয় বাষ্প নাই। পূৰ্ব্বে স্থিবীকৃত হইয়াছিল যে লোকেব জীবন ধাবণোপযোগী যথেষ্ট জলীয় বাষ্প বহিয়াছে।

লুই ব্রেবিথট এবং গেব্রিয়েল ভইসিন, ইনস্‌টিটিউট্-অফ ফ্রান্স হইতে আধুনিক ব্যোমযান সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন বিষয় উদ্ভাবন কবিয়াছেন বলিয়া ৪০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০,০০০ টাকা পুবস্কাব পাইয়াছেন। প্রতি তিন বৎসব অন্তব এই পাবিতোষিক প্রদান কবা হয়। যে ব্যক্তি মানবের প্রয়োজনীয় কোন নূতন বিষয় উদ্ভাবন বা আবিষ্কাব কবেন, তিনিই পাবিতোষিকেব উপযুক্ত গণ্য হন।

১ম বর্ষ।] ভাদ্র ১৩১৬, আগষ্ট ১৯০৯। [৮ম সংখ্যা।

মানব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মানব জীব জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল, প্রকাণ্ড হস্তী, আবার ক্ষুদ্র পিপীলিকা, এবং আরও ক্ষুদ্রতর প্রাণীসমূহ মানবের সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানবুদ্ধিজাত ক্ষমতার বশীভূত হইয়া তাহার চরণে প্রণিপাত করিতেছে। শত শত মহিষ সপ্তম বর্ষ বয়স্ক শিশুর যষ্টি সঙ্কেতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এরূপ ক্ষমতার বাস্তবিক কারণ কি? কোন জীবই মনোভাব শূন্য নহে। ছাগশিশুও মানব শিশুর ন্যায় নির্ভয়ে জননী সন্নিধানে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। বলদৃপ্ত সৈনিকের ন্যায় বলীবর্দ্দও ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। আবার বৃক্ষশাখায় কপোত কপোতীও প্রেমোদ্ভাসিত নয়নে মানব মানবীরই ন্যায় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করে। মনোভাব, সৃষ্টির চরমোৎকৃষ্ট জীব মানবেরই নিজস্ব নহে, অতি নিকৃষ্ট জীবেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মানসিক-ভাব-সমষ্টির পরিবর্ত্তনই ক্রমোন্নতিশীলতা। আবার এই মানসিক ভাব সমূহ বিভিন্ন জীবে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। মানবের মনের ভাব মানবেই সম্ভব, হস্তীর মনোভাব শার্দ্দূলে পরিলক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবস্থা অবিভিন্ন হইলেও, পরাজয় বিমর্ষ-বলীবর্দ্দের

মনোভাব তদবস্থাপন্ন সৈনিকের অনুরূপ হইতে পারে না। কুক্কুরের মনোভাব কেবল মাত্র সারমেয়-জাতিরই প্রকৃতি নির্দ্দেশক। যদি প্রত্যেক জীবই মনোভাব বিশিষ্ট হয়, তবে মানবই উৎকৃষ্ট জীব কেন?—ইতর প্রাণী পুরুষানুক্রমিক একই ভাব-বিশিষ্ট। সে তাহার মনের ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া, সেই বিশ্লিষ্ট অংশের প্রত্যেকটিরই ধর্ম্ম বা প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে জানে না। কিন্তু মানব তাহার কোন একটি মানসিক ভাবের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করে, এবং প্রত্যেক বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অর্থ সংযোজিত করিয়া তাহার ফলাফলের অবধারণ করিতে পারে। মানব তাহার এক একটি মনোভাবের কারণে ও ক্রিয়ায়, নানারূপ অর্থ সন্নিবিষ্ট করিয়া নানারূপ ফলাফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্যই মানব সৎকর্ম্মে প্রহৃষ্ট হয়, অসৎকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে। মনোভাব সকল জীবেরই রহিয়াছে, কিন্তু মানবের মনোভাব অন্য জীব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অর্থ-পরিপূরিত-মনোভাব হইতেই মানবের চিন্তাপূর্ণ বা পরমাত্মিক জীবন উদ্ভূত হইয়াছে। মানব চিন্তাশীল, ইতর প্রাণী চিন্তা-শূন্য। ইতর জীবের মনোভাব বাস্তবিক কেবল মাত্র সাময়িক স্নায়বিক বিক্ষোভ সঞ্জাত, এবং মানবের মনোভাব স্নায়বিক বিক্ষোভ সঞ্জাত হইলেও, সাময়িক নহে,—ইহা অর্থ এবং চিন্তা পরিপূর্ণ। অথবা মনো-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে স্নায়বিক বিক্ষোভের পরাকাষ্ঠাই চিন্তা। কি ইতর, কি মানব সমস্ত জীবেরই মনোভাব কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, বা জীবনের কোন একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিকৃতি মাত্র। তবে মানবের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা সঞ্জাত হয়। স্নায়বিক বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়া একই সময়ে মনোভাব এবং চিন্তা উভয়ই সৃষ্টি করিলেও বিক্ষোভ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যায়, চিন্তা অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সম্মুখে কালান্তক যম সদৃশ দস্যু শাণিত ছুরিকা হস্তে আক্রমণ করিলেই স্নায়বিক বিক্ষোভ ও সঙ্গে সঙ্গে তৎকাল উপযুক্ত বিশেষ একটা মনো ভাব সৃষ্ট হয়। সময়ে স্নায়বিক বিক্ষোভ নষ্ট হয়, মনোভাব বিদূরিত হয়; কিন্তু তৎপ্রসূত চিন্তা বহুদিন স্থায়ী হয়। মানবের স্নায়বিক বিক্ষোভ নষ্ট হইয়া চিন্তা অবশিষ্ট থাকে, পশুর বিক্ষোভ নষ্ট হইয়া

কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। স্নায়বিক বিক্ষোভই চিন্তার কারণ, এবং চিন্তাই উন্নতির মার্গ স্বরূপ। কাজেই উন্নতির সহিত স্নায়বিক ক্রিয়া দৃঢ়সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। একটি ছাগেব স্নায়ুমণ্ডলী হইতে মানবের স্নায়ু-মণ্ডলী অধিকতর জটিলতা বিশিষ্ট; নিকৃষ্ট প্রাণী যতই স্তরে স্তরে উন্নীত হইতেছে, ততই তাহার স্নায়ুমণ্ডলী জটীল হইতে জটীলতর হইয়া পড়িতেছে। বাস্তবিক ইহাই প্রকৃতিব নিয়ম হইলেও, ইহাই—এই জটীলতাই, সকল সময়ে বা সকল বিষয়ের উন্নতিতে প্রয়োজ্য হইতে পারে না। জীব জগতের উন্নতির ক্রম বিকাশ ব চিন্তার বিবর্ত্তন-বিজ্ঞান এই জটীলতা সঞ্জাত কখনই নহে। প্রত্যেক চিন্তাই কোনি এক বিশেষ অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ, অথবা চিন্তাই অভিজ্ঞতা প্রকাশ কবে। এই অভিজ্ঞতায় চিন্তিত-মানবের পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ চিত্রিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, মানবে অঙ্কিত বা তাহাব মনোভাবে প্রতিফলিত এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিরূপই মানবেব চিন্তার অবয়ব; এবং দ্বিতীয়তঃ, পারিপার্শ্বিক ব্যাপাব সমূহ দ্বারা আমাদের মনোভাব উদ্রিক্ত হইলে মনোমধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহাই চিন্তা। প্রথম প্রকারেব চিন্তা হইতে আমাদের বুদ্ধি এবং দ্বিতীয় হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়। বুদ্ধি পথ প্রদর্শক, জ্ঞান কর্ম্মকর্ত্তা। আমরা বুদ্ধি দ্বাবা পবিচালিত হই, এবং জ্ঞানবলে কোন বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পদার্থ কণিকা দ্বারা সংসৃষ্ট বটে, কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ নিচয় কখনই অসম্বদ্ধ, ব্যবস্থাহীন, অথবা অনিয়মবদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে জগতেব সর্ব্বত্র এক অনির্ব্বচনীয় সুনিয়ম বিরাজিত রহিয়াছে। পদার্থ কণিকার সুবিশাল সমষ্টি প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত এক সুশৃঙ্খল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সূর্য্য, আমাদের প্রকাণ্ড সৌর জগৎ, অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত আরও কোটী কোটী সৌরজগতের সহিত, একই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই সুনিয়ম, সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলা আধিপত্য করিতেছে। বিশ্ব অর্থহীন প্রহেলিকা নহে। অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র কণিকারও বিশেষ উদেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ব্যাপারে সান্ত এবং অদ্বিতীয় নিয়ম লক্ষ্য করতঃ, চিন্তাশক্তি বিশিষ্ট মানব ধর্ম্ম প্রণোদিত

হইয়া অথবা জাগতিক শৃঙ্খলতার অনির্ব্বচনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে। এত সুশৃঙ্খলতা, এত সৌন্দর্য্যসমাবেশ বাস্তবিকই ঐশ্বরিক। জীব জগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যতই চিন্তাশক্তি পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে, যতই, যে শক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সেই অদ্বিতীয় শক্তির ধারণা হইতে থাকে, ততই চিন্তাশক্তি উজ্জ্বল হইয়া তাহাতে জাগতিক নিয়মে ঐশ্বরীকত্বের ধারণা প্রতিফলিত হইতে থাকে; এবং যত অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়, জীব ততই অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জীবজগতেব মধ্যে মানবই এই ঐশ্বরীকত্বের অধিক উপলব্ধি করিয়াছে, কাজেই মানব শ্রেষ্ঠ। মানবের আদর্শ পুরুষ, নিষ্কলঙ্ক, গুণবান এবং সর্ব্বনীতিজ্ঞ মানবই আবার সর্ব্ব মানবের শ্রেষ্ঠ। (ক্রমশঃ)।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৮৭ খৃঃ অব্দেব ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতার শেরিফ (Sheriff) পদে অভিষিক্ত হন। বিশেষ গুণবান না হইলে জগতে কেহই কীর্ত্তিমান হইতে পারেন না। বিশেষ বিশেষ কার্য্য পরম্পরা লক্ষ্য করিয়া আমরা লোকের গুণ পরিচয় পাইয়া থাকি। ডাক্তার সরকার বহু গুণবান ছিলেন, স্পষ্টবাদিতা তাহাদেরই মধ্যে অন্যতম। যে মহানুভব এই মহৎ গুণ সম্পন্ন, তিনি কেবল মাত্র নিজের উন্নতি করেন তাহা নহে, তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার যিনি সুযোগ পান, তাঁহারও নৈতিক চরিত্র বিশিষ্টরূপে উন্নীত হয়। আমাদের দোষ দেখাইয়া দিবার কোন লোক থাকিলে, আমরা সহজেই সেই দোষ পরিহার করিতে পারি, অন্ততঃ সেই দোষ পরিহার কবিবার জন্য যত্নবান হই। ডাক্তার সরকার অতিশয় স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি শেরিফ হইবাব অল্প পরেই লর্ড ডফরিণ বর্ম্মাপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি

মাত্রেই অবগত আছেন যে, লর্ড ডফরিণ বর্ম্মা প্রদেশের শত্রুস্বরূপ ছিলেন। ডাক্তার সরকার কলিকাতার শেরিফ। কাজেই বর্ম্মা হইতে প্রত্যাগত লর্ড ডফরিণকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ও অভ্যর্থনা এবং প্রশংসা পত্র দিবার জন্য, এক সভা আহ্বানে তিনি আদিষ্ট হইলেন। এই আদেশের উত্তরে মহেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—"আমাকে আপনারা শেরিফ নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার ইচ্ছার উপর জন সাধারণের ইচ্ছার মিলন সম্ভবপর নহে; কাজেই আমি অনিচ্ছুক হইলেও আমাকে বাধ্য হইয়া সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইবে। কিন্তু আমি সাধারণকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ কার্য্যের জন্য লর্ড ডফরিণ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত? বর্ম্মায় ডাকাতি করার জন্যই কি লর্ড ডফরিণকে প্রশংসা পত্র দিতে হইবে?" এরূপ স্পষ্টবাদিতা কয়জন ব্যক্তিতে সম্ভব! বাঙ্গালীর দুঃখের কথা একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এরূপ স্পষ্টবাদিতা অনেক জাতির মধ্যেই বিরল।

১৮৯৩ খৃঃ হইতে ১৮৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ডাক্তার সরকার Faculty of Arts এর President ছিলেন। তিনি দশবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত থাকিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের সুশিক্ষা ও উন্নতিকল্পে সতত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন ভাইসচ্যানসেলারের অনুপস্থিতে তিনিই সিণ্ডিকেটের সভায় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিতেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা বলে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে বিশেষ যশলাভ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ স্বাস্থ্য বিভাগে তাঁহার অভিমত সাদরে গৃহীত হইত; এবং তিনি কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বোর্ডকে নানারূপ উপদেশ দিতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের বহুকাল যাবৎ মেম্বার ছিলেন; এবং প্রায়ই কাউন্সিলেরও মেম্বার নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহার জ্ঞাননৈপুণ্যে প্রীত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী ডি, এল, উপাধি প্রদান করে। সেই সময়ে লর্ড কার্জ্জন চ্যানসেলার ছিলেন। অন্য বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও লর্ড কার্জ্জনের পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা সম্বন্ধে কাহারও

মতভেদ নাই। লর্ড কার্জ্জন ডাক্তার সরকারের ডি, এল, উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—"I think that the University has chosen a very appropriate occasion for conferring on Dr. Mahendralal Sircar, the Honorary Degree of Doctor of Law in recognition of his eminent services in the cause of scientific enquiry. As you are aware, India has just been visited by a larger number of gentlemen of high distinction in science, whom I am sure the University would have been proud to welcome here to day, had that been possible. It is a concident, that in talking to one of the most distinguished of them, Sir Norman Lockyer the other day, he pointed out to me, the very great advantage, which obtained in India for an observer of Astronomical science. It has occurred to me since, that the event of the past year may show that there are other matters for scientific enquiry of which in India, we are peculiarly ignorant. Certainly during last year, we have been able to observe convulsions of nature on a scale which is almost without parallel. And we know that millions of our fellow subjects have been suffering from privation from causes of which we may say, the investigator has yet much to investigate and determine. I congratulate therefore, the University as well as Dr. Mahendra Lall Sircar on the occasion which has been selected for conferring upon him the Honorary Degree of Doctor of Law." ডাক্তার সরকারের নাম বৈজ্ঞানিক জগতে চির বিখ্যাত থাকিবে। যে বিজ্ঞানে তাঁহার

মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইযাছিল, যে শাস্ত্রের নিপুণতায তিনি কেবল মাত্র স্বদেশে নহে বিদেশেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যে চিকীৎসা বিজ্ঞানে তিনি অসাধারণ বুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিযাছিলেন, কযেকজনের এক দেশ দর্শিতার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিজ্ঞান নির্দ্ধারিত আসন গৌরবান্বিত করিতে পারে নাই। তাঁহাকে Faculty of Medicine এর সদস্য নির্ব্বাচনে সিনেট বাধা প্রদান করিযাছিলেন, অনুতপ্ত সিনেট তাই এখন তাঁহার বিশ্ব পূজিত নামে ডি, এল, উপাধি সংযোজিত করিযা তাঁহাদের দমের কতকটা সংশোধন করিযা লইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

খাদ্যে ভেজাল।

বিগত ১৩ই ভাদ্র রবিবার সাহিত্য সভা ভবনে (১০৬।১, গ্রে ষ্ট্রীট) শ্রীযুক্ত ডাক্তার রায চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, মহোদয় খাদ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্যের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন; তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

বক্তা প্রথমেই খাদ্যে "ভেজাল" দিবার ইতিহাস প্রদান করেন। তিনি বলেন, অতি পুরাকাল হইতেই খাদ্যে ভেজাল দিবার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে, যতদিন মানব নিজ বা নিজ সংসারের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি স্বীয কাযিক পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত করিত, ততদিন খাদ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি সংমিশ্রিত হইতে পাইত না। কেননা কে ইচ্ছা করিয়া আত্মীয় পরিবারবর্গকে অখাদ্য প্রদান করিতে চাহে। অবশেষে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যখন মানব নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজ পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিল না, যে দিন হইতে দ্রব্যাদির বিনিময় অর্থাৎ ব্যবসা প্রচলিত হইল, সেই দিন হইতেই ভেজালের সূত্রপাত হইল।

বক্তা দুগ্ধ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, কেননা দুগ্ধই ভারতবাসিগণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। দুগ্ধে ভেজালের মধ্যে জলই প্রধান। এতদ্ভিন্ন দুগ্ধ ভাল হইলেও, গাভীর অবস্থা ভাল না হইলে, সে দুগ্ধ ব্যবহার করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা রুগ্ন গাভীর দুগ্ধে রোগের বীজাণু আনীত হইয়া মানব শরীরে প্রবেশ করে, এবং আমাদিগকেও রুগ্ন করিয়া ফেলে। অনেক সময়ে এই কারণে আমরা অনেক সংক্রামক ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া পড়ি। বাঙ্গালী গোয়ালা গো পালনের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। গাভীসমূহ এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে সংরক্ষিত হয়, যে সুস্থ গাভীও অল্প দিনের মধ্যে রুগ্ন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থানে পালিত গাভীর দুগ্ধ বিশুদ্ধ হইবে, এরূপ প্রত্যাশা কখনই করা যায় না। সুদূর প্রত্যাগত মাড়োয়ারীরা আসিয়া আমাদিগকে গো-রক্ষণ বা গো-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছে। গো-পালনে আমাদের মনোযোগী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেননা ইহার সহিত আমাদের স্বার্থ বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দুগ্ধে ভেজালের মধ্যে জলই প্রধান। অনেকে মনে করেন ল্যাক্টোমিটার (lactometer)নামক দুগ্ধ পরীক্ষার যন্ত্রের ব্যবহারে অনায়াসে জলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেননা, আজ কাল দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ দুগ্ধে ইচ্ছানুরূপ জল মিশ্রিত করিয়া অবশেষে তাহাতে চিনি কিম্বা বাতাসা মিশ্রিত করিয়া দেয়। ইহার ফলে এই হয় যে ল্যাক্টোমিটার দ্বারা পরীক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে, কেননা চিনি মিশ্রিত হইলে দুগ্ধে জলের অংশ অত্যন্ত অধিক হইলেও ল্যাক্টোমিটার, খাঁটী-দুগ্ধ-অবধারিত-চিহ্ন পর্য্যন্ত ঐ জল মিশ্রিত দুগ্ধে ডুবিয়া যায়। কাজেই দুগ্ধ বিশুদ্ধ মনে করিয়া আমরা ভ্রান্ত হই। আজকাল সকল পরিবারেই শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত রহিয়াছে কিনা বুঝিতে পারেন। দুগ্ধ চিনি মিশ্রিত কি না পরীক্ষা করিবার দুইটি উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। দুগ্ধ—অল্প পরিমাণ

আমোনিয়াম মলিবডেট চূর্ণ (ammonium molybdate)—

অতি সামান্য পরিমাণ।

জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড—সামান্য পরিমাণ।

যদি চিনি মিশ্রিত থাকে এই তিনটি মিশাইয়া উত্তাপ দিলেই দুগ্ধ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করিবে।

২। দুগ্ধ—অল্প।

রিসর্সিন (resorcin)—সামান্য পরিমাণ।

জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড—সামান্য পরিমাণ।

চিনি মিশ্রিত থাকিলে এই তিনটি দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তাপ প্রদান করিলেই দুগ্ধ লাল বর্ণ ধারণ কবিবে।

গো-দুগ্ধে অনেক সময়ে মহিষ-দুগ্ধ মিশ্রিত থাকে। মহিষের দুগ্ধে মাখনের (fat) ভাগ অধিক। সেইজন্য অনেক সময়ে ইহা পবিপাক করিতে (বিশেষতঃ রোগী ও শিশুদিগের) কষ্ট হয়। ইহাতে পাকস্থলীব নানারূপ পীড়া হইয়া পড়ে। ল্যাকটোস্কোপ্ (Lactoscope) নামক আর একটি যন্ত্র আছে ; ইহার দ্বারা দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ অনায়াসে জানিতে পারা যায়। ল্যাক্টোস্কোপের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইহাতে প্রথমে ১ ড্রাম দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে হয়। যন্ত্রস্থিত গ ঘ, চিহ্নিত দণ্ডের গাত্রে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকে। দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে প্রথমতঃ দাগ গুলি নয়ন গোচর হইবে না। এক্ষণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই দণ্ডের দাগ গুলি দেখা যাইবে ততক্ষণ যন্ত্রের মধ্যস্থিত দুগ্ধে জল ঢালিতে হইবে ; এবং দুগ্ধ ও জল পুনঃপুনঃ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। দণ্ডের কাল দাগগুলি দুগ্ধের মধ্য দিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেই জল ঢালা বন্ধ করিতে হইবে। মনে কর দুগ্ধ ও জল মিশ্রিতহইয়া যখন ক, অর্থাৎ ৪ দাগ পর্য্যন্ত উঠিল, তথনই গ ঘএর কাল দাগ গুলি দেখা গেল। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে,
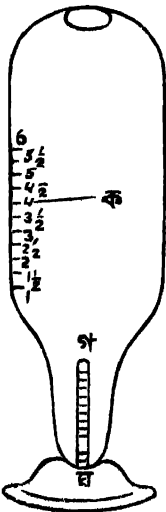
দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ শতকরা চারি ভাগ আছে মাত্র। খাঁটী গরুর

দুধে গড়ে শতকরা ৪ ভাগ মাখন থাকে। সুতরাং জল ঢালিয়া দুধ দুইএর দাগে উঠিলে যদি কাল দাগ গুলি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত দুগ্ধে শতকরা ২ ভাগ মাখন আছে, এবং এই দুগ্ধে অর্দ্ধেক জল মিশান আছে।

অতঃপর বক্তা ঘৃত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঘৃতে নানারূপ অখাদ্য চর্ব্বি, চিনের বাদামের তৈল, মহুয়ার তৈল, পোস্তেব তৈল ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। আজকাল বাঙ্গালীর অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়ার কারণ এই অখাদ্য ঘৃত ব্যবহার। এরূপ ঘৃতেব পবিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট সরিষাব তৈলের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ঘৃতের বিশুদ্ধতা স্থির করা সহজসাধ্য নহে; রীতিমত রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা না হইলে বিশেষ জানা যায় না। নিম্নে যে কয়েকটী উপায় বর্ণিত হইল, সেগুলি তত সহজ না হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এইরূপে পরীক্ষা করিতে পারেন।

(১) ৩ কিউবিক সেন্টিমিটার ঘৃতে তিন কিউবিক সেন্টিমিটাব গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড (Glacial Acetic Acid) ঢালিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুইটী পদার্থ সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া স্বচ্ছ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ জলের মধ্যে রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি ঘৃত বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত উত্তপ্ত দ্রব শীতল হইবার কালীন একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘোলা হইয়া যাইবে। চর্ব্বি মিশ্রিত থাকিলে এই উষ্ণতার আধিক্য হইবে। খাঁটী ঘৃত হইলে শতকরা ৬ ভাগ এসিটিক এসিডে দ্রব হইবে; যদি চর্ব্বি থাকে, তাহা হইলে চর্ব্বি অনুসারে ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ঘৃত এসিটিক এসিডে দ্রব হইবে।

(২) কার্ব্বলিক এসিড ৯ ভাগ ও জল ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া একটী দ্রাবণ প্রস্তুত কর। পরে ১ ভাগ ঘৃত, ও ২॥ ভাগ এই দ্রাবণ একটী টেষ্ট টিউবে লইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন কর। যদি ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে এই টেষ্ট টিউবটী কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে রাখিলে চর্ব্বি পৃথক হইয়া উপরে ভাসিতে থাকিবে। যদি বিশুদ্ধ ঘৃত হয়, তাহা হইলে দ্রাবণ স্বচ্ছ থাকিবে, কোন দ্রব্য পৃথক হইবে না।

ঘৃতে চীনের বাদাম বা অন্য তৈল মিশ্রিত থাকিলে এইরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে :—

(১) ১ ভাগ ঘৃত, ৫ ভাগ ক্লোরোফরম্ এবং অল্প পরিমাণ ফস্‌ফো-মলিবডিক্ এসিডের দ্রাবণ একত্রিত করিয়া আলোড়ন করিলে ঘৃতের অংশ সবুজ বর্ণ ধাবণ কবিবে। ঘৃতে তৈল না থাকিলে এরূপ রং হইবে না। মাখন হইতে টাট্‌কা ঘৃত প্রস্তুত কবিয়া এই পরীক্ষা করিলে ঈষৎ সবুজ বর্ণ হয় ; ঘৃত ২।৪ দিন থাকিলে আব সবুজ রং হয় না। টাট্‌কা ঘৃতে অতি সামান্য পরিমাণ সবুজ রং হইয়া থাকে মাত্র।

অবশেষে বক্তা সরিষাব তৈল সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করেন। সবিষার তৈলে সাধারণতঃ তিসি, তিল, হুড়হুড়ে, কোঁচড়া, চীনের বাদাম, সোরগোজা ইত্যাদির তৈল মিশ্রিত থাকে ; এমন কি শুনা যাইতেছে যে, ব্যবসাদারগণ আজকাল পেট্রোলিয়াম জাতীয় এক প্রকার তৈলও সরিষাব তৈলে ভেজাল দেয়। তৈলেরও বিশুদ্ধতা জানিতে হইলে, সুসজ্জিত রাসায়ণিক পবীক্ষাগারে রীতিমত পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। তবে পেট্রো-লিয়াম মিশ্রিত থাকিলে, সুরাসারে দ্রব পটাশ (alcoholic solution of Potass), এবং তৈল একত্র মিশ্রিত করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিতে করিতে স্বচ্ছ হইলেই উহাতে শীতল জল মিশ্রিত করিলে, ঘোলা হইবে ; খাঁটী সরিষার তৈল এইরূপে পরীক্ষিত হইলে ঘোলা হইবে না। পরিশেষে বক্তা মাখন, ময়দা, আটা, চাউল, দোকানের মিঠাই, রোগীদিগের এরারুট প্রভৃতি পদার্থে যেরূপ ভেজাল দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ভেজাল নিবারণের জন্য কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা এ সম্বন্ধে কতদুর উপযোগী এবং তাহার কোন্ কোন্ অংশের সংশোধন প্রয়োজন, তাহার নির্দ্দেশ করেন।

মিউনিসিপালিটীর আইনানুসারে এইরূপ অপকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রণ জন্য বিক্রেতাগণ প্রায়ই দণ্ডিত হইয়া থাকে। রায় বাহাদুর এ সম্বন্ধে একটি মামলার কথাও উত্থাপন করেন। কোন সময়ে কোন তৈলের কলের সত্বাধিকারীর নামে এইরূপ অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ জন্য অভিযোগ উপস্থিত হইলে, সে বলে যে সরিষায় উক্তরূপ ভেজাল না দিলে তৈল বাহির করা

অসম্ভব হইয়া পড়ে। হাকিম বাহাদুর প্রেসিডেন্সি জেল ও অন্যান্য স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করতঃ কলওয়ালার উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দণ্ডিত করেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আজকাল তৈল বিক্রেতাগণ তৈল বিক্রয় কালীন "মিশ্রিত সরিষা তৈল" এই বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কাজেই তাহারা আইনের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু লাভের জন্য ভেজাল দিয়া তৈল এরূপ নিকৃষ্ট করিয়া ফেলে যে তাহা খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। রায় বাহাদুর এই দোষ নিরাকরণ জন্য গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণকে আইন সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন।

খাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যত আলোচনা হইবে, ততই জনসাধারণের মঙ্গল হইবে। ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রমুখ দেশের কৃতবিদ্যগণ যদি এ সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে অচিরেই শুভ ফল সম্ভব। পরন্তু গভর্ণমেণ্ট আইন করুন আর নাই করুন আমরা এই সমস্ত জানিতে পারিলে সহজেই সাবধান হইতে পারিব, এবং চেষ্টা করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির আয়োজন ও সংগ্রহ করিতে পারিব।

শারীরিক তাপ।

পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত শারীরিক উত্তাপেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে জীব সকলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর জীবগণের শারীরিক তাপ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হয় না, অর্থাৎ সকলসময়েই তাহাদের শারীরিক উত্তাপ প্রায় সমভাবেই থাকে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত জীবগণকে উষ্ণশোণিতবিশিষ্টজীব বলা যাইতে পারে। মানব, পক্ষী এবং চতুষ্পদ জন্তু সকল এই শ্রেণীভুক্ত। অপর শ্রেণীর জীবগণের শারীরিক তাপ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ইহাদিগকে শীতলশোণিতবিশিষ্টজীব বলা যাইতে পারে। মৎস্য ও মেরুদণ্ডবিহীনজীব সকল এই শ্রেণীভুক্ত। এক

শ্রেণীর জীবের শোণিত উষ্ণ এবং অপর শ্রেণীর জীবের শোণিত শীতল,—ইহা বাস্তবিকই বিজ্ঞান সম্মত নহে, তবে প্রথম শ্রেণীর জীবগণের শোণিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণের শোণিত অপেক্ষা উষ্ণতর; এবং এই সমস্ত জীবসমূহের মধ্যে পার্থক্য সহজ বোধ্য করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর জীবগণকে উষ্ণশোণিতবিশিষ্টজীব, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণকে শীতলশোণিতবিশিষ্টজীব, এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উষ্ণ শোণিত বিশিষ্ট সুস্থকায় জীবগণের শারীরিক উত্তাপ, কি গ্রীষ্ম কি শীত সমস্ত ঋতুতেই, এবং কি শীত প্রধান মেরু প্রদেশ বা গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা সকল স্থানেই সমভাবে থাকে। কিন্তু শীতলশোণিতবিশিষ্টজীবগণের শারীরিক তাপ ঋতুভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে,—শীত ঋতুতে হ্রাস এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে অবস্থা ভেদে উষ্ণশোণিতবিশিষ্টজীবগণের শারীরিক তাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই পার্থক্যের পরিমাণ অতিশয় অল্প। বয়ঃক্রম অনুসারে শারীরিক উত্তাপের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থার শারীরিক তাপ, শৈশবাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থার শারীরিক তাপ অপেক্ষা অল্প। সদ্য প্রসূত শিশুদিগের উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা অধিক। ভক্ষ্য দ্রব্য ভেদেও শারীরিক তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যাহারা মাংস, ডিম্ব, সুরা, প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্য আহার বা পান করে তাহাদের শারীরিক তাপ স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কোন কারণ বশতঃ পেশী সকল সঙ্কুচিত হইলে, তাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রম হেতুও তাপের বৃদ্ধি হয়। এ নিমিত্ত যাঁহারা অধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। মানব দেহের স্বাভাবিক তাপের পরিমাণ প্রায় সার্দ্ধ অষ্টনবতি (৯৮) ডিগ্রি ফারনহাইট, অর্থাৎ শারীরিকতাপ-পরিমাণ-যন্ত্র (clinical thermometer) দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহার পারদ ৯৮.৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। সুস্থাবস্থায় শারীরিক তাপ সকল প্রদেশে এবং সর্ব্ব ঋতুতে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া উক্ত তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের সুস্থাসুস্থ অবস্থা নির্ণয় করা বিশেষ সুবিধা জনক। শরীর অসুস্থ হইলে শারীরিক তাপের

বৃদ্ধি হয়, আবার কোন কোন স্থলে উত্তাপের হ্রাসও হইয়া থাকে। ইউরিয়ামিয়া, কলেরা, প্রভৃতি বোগগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক তাপ স্বাভাবিক তাপাপেক্ষা অল্প, এবং সাধারণতঃ জ্বর রোগে শাবীরিক তাপ অধিক হয়।

মানব শরীবে উত্তাপ-সঞ্চরণ-প্রণালী এরূপ সুন্দর ভাবে সংসাধিত হইতেছে, যে তদ্বারা শরীরের সকল স্থানে সকল সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে তাপ স্বতঃই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শরীরের যে স্থানে অধিক উত্তাপ ব্যয়িত হয়, তথায় এই সঞ্চরণপ্রণালী দ্বারা অধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চারিত হয় এবং যে স্থানে অল্প পবিমাণ ব্যয়িত হয়, তথায় অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উষ্ণশোণিতবিশিষ্টজীবগণ সকল সময়ে সকল স্থানে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পাবে। তবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার অত্যধিক পবিবর্ত্তন হইলে জীবন ধাবণ বাস্তবিকই ক্লেশকব হইয়া উঠে। উত্তাপ সঞ্চরণ প্রণালীর কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে শারীরিক তাপ সমভাবে থাকে না; কাজেই তখন সহস্র চেষ্টা করিলেও তাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি নিবারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। শরীরের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়াই আমাদের শারীরিক উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান কারণ। উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে শবীর মধ্যে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে সমস্ত খাদ্য উদবস্থ হয়, তাহারই মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া উত্তাপ উৎপাদন করে; এবং এই উত্তাপ শোণিত প্রবাহের দ্বাবা শবীরের সর্ব্বস্থানে নিয়মিত রূপে সঞ্চারিত হয়। শরীরস্থ যাবতীয় গ্রন্থি-সমূহ আপন আপন কার্য্য সাধন সময়ে উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। মাংসপেশী সকলের কুঞ্চনেও তাপ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে রাসয়ানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়। নাড়ীব ভিতব দিয়া যখন শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন শোণিত এবং নাড়ীর ঘর্ষণেও কিঞ্চিৎ তাপ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ উক্ত কয়েক প্রকারেই আমাদের শরীর মধ্যে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লাভয়সিয়ার বলিয়াছেন যে, ফুসফুস শারীরিক উত্তাপ উৎপত্তির স্থান। কারণ এই যন্ত্রই অক্সিজেন শোষণ করে, আবার এই যন্ত্র বলেই শোষিত অক্সিজেন ভুক্ত খাদ্যের সংস্পর্শে আসিয়া ব্যয়িত হইয়া থাকে।

কিন্তু অনেকেই এ মতের পোষকতা করেন না। যাহা হউক শারীরিক তাপ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উৎপন্ন হইলেও সমস্ত শরীরে নিয়মিতরূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কোন কারণবশতঃ শরীরের কোন স্থানের উত্তাপ শীঘ্র ব্যয়িত হইলে, অন্যস্থান হইতে তাপ আসিয়া তথা সঞ্চারিত হয়। যাহারা শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তাহাদের শারীরিক তাপ, এই উভয়বিধ কারণে অর্থাৎ বিকীরণ পরিচালনে, অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয়, কেননা পরিবেষ্টিত বায়ু রাশির উত্তাপের পরিমাণ শারীরিক উত্তাপ অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং শীতপ্রধান দেশ বাসীকে প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ উৎপাদক ভক্ষ্য দ্রব্য (অর্থাৎ যে সমস্ত আহারীয় দ্রব্যে চর্ব্বি, তৈল, ঘৃত, প্রভৃতি পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে) ভোজন করিতে হয়, এবং তাহাদের পক্ষে ব্যায়াম কিম্বা অন্যবিধ অঙ্গ চালনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। শারীরিক তাপের হ্রাস অনেক প্রকারে ঘটিয়া থাকে। শারীরিক তাপের কতক অংশ শরীরস্থ বায়ু ও ভক্ষিত দ্রব্য সকলকে উত্তপ্ত রাখিবার নিমিত্ত, কতক অংশ রক্ত-সঞ্চলন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ, এবং কিঞ্চিৎ বিকীরণ দ্বারা ব্যয়িত হইয়া থাকে। আরও কয়েক প্রকারে শারীরিক তাপ ব্যয়িত হইয়া যায়। যথা,—সঞ্চলন, বিকীরণ, বহন, বাষ্পীকরণ। যে সমস্ত শীতল দ্রব্য আহার বা পান করা হয় তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত উত্তাপের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থি সমূহ হইতে যে জল নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে অত্যধিক তাপ ব্যয়িত হয়। শীতল বায়ু যাহা নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা গরম করিতেও তাপের প্রয়োজন হয়। ফুসফুস হইতে যে জল বাষ্পাকারে প্রশ্বাসের সহিত বাহির হয় সেই জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপের আবশ্যক হয়। গাত্র অনাবৃত রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে গাত্রের চর্ম্ম শীতল হইতে থাকে, কিন্তু শীতল হইবার পুর্ব্বেই অন্য স্থান হইতে তাপ আসিয়া তথায় সঞ্চারিত হয়। মল মূত্র প্রভৃতি ত্যাগের সময় কিঞ্চিৎ উত্তাপ নির্গত হয়। শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অসুস্থ অবস্থা ভিন্ন শারীরিক তাপের

বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শারীরিক উত্তাপের অধিক হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিলে যাহাতে তাহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা আবশ্যক। তাপ বৃদ্ধি পাইলে যাহাতে তাহা শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া বিধেয় এবং হ্রাস হইলে শারীরিক তাপ যাহাতে বাহির হইতে না পারে তাহা করা কর্ত্তব্য। শারীরিক তাপের বৃদ্ধি হইলে গাত্র চর্ম্মের ক্যাপিলারি (Capillaries) গুলি শিথিল হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তথায় রক্ত সঞ্চালন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সঞ্চালিত শোণিত প্রবাহ উষ্ণ, এবং উহা অপেক্ষাকৃত শীতল গাত্রচর্ম্ম সংস্পর্শে আসিয়া শীতল হয়। এই উপায়ে শারীরিক তাপের অনেক অংশ স্বতঃই ব্যয়িত হইয়া থাকে। আবার শারীরিক তাপের বৃদ্ধিসময়ে শরীরাভ্যন্তরে তাপ উৎপাদক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে সময়ে ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, সুতরাং আহার না করা প্রযুক্ত শরীরে উত্তাপের আধিক্য হইতে পারে না। শারীরিক তাপ বৃদ্ধি হইলে শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয়, এবং ফুসফুসে অধিক পরিমাণে শীতল বায়ু প্রবেশ করিয়া শারীরিক তাপের অনেক অংশ শোষণ করতঃ তাপের হ্রাস করিয়া থাকে। আবার শোণিতের জলভাগকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতেও তাপের অনেক অংশ ব্যয়িত হয়। শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হইলে গাত্রচর্ম্মস্থ Capillaries সঙ্কুচিত হয় তজ্জন্য শোণিত প্রবাহের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের উত্তাপ অধিক পরিমাণে বিকীরণ হইতে পারে না। এই অবস্থায় ক্ষুধা অধিক হইয়া থাকে, সুতরাং অধিক আহারের প্রয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্য সমূহ শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক তেজে পরিণত হয় এবং যথা সময়ে উক্ত রাসায়নিক তেজ শারীরিক উত্তাপে পরিণত হয়; সুতরাং শারীরিক তাপ পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া শরীরাভ্যন্তরে স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ের দ্বারা শারীরিক তাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। ঋতু বা কালভেদে যে সমস্ত বস্ত্র সচরাচর পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও শারীরিক তাপ বিকীরণ ও রক্ষণের সহায়তা করিয়া থাকে।

শীতকালে যে সমস্ত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণতঃ পুরু এবং এরূপ বর্ণবিশিষ্ট যে তাহা হইতে শরীরাভ্যন্তরীণ তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না, এবং বাহির হইতে, অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণ বা অগ্নি হইতে যে উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, গাত্রবস্ত্র তাহাকে শোষণ করিয়া গাত্রচর্ম্ম উত্তপ্ত করে। শীতকালের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রায় কালবর্ণের হইয়া থাকে, কারণ কালপদার্থের উপর যে তাপরশ্মি পতিত হয় তাহা প্রতিফলিত না হইয়া তাহার অধিকাংশই শোষিত হয়, অধিকন্তু কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ যে তাপ শোষণ করে তাহার অতি অল্প অংশই বিকীরণ করে। গ্রীষ্মকালে যে সমস্ত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা সচরাচর পাতলা এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। অনেক সময়ে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট না হইলেও চাকচিক্যশালী হয়। শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বা চাকচিক্যশালী বস্ত্র হইতে বাহিরের তাপরশ্মির অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অতি অল্প পরিমানই শোষিত হইয়া থাকে, এবং যাহা শোষিত হয় তাহারও কতক অংশ বিকীরণ ও বহন দ্বারা ব্যয়িত হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মকালে পাতলা, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অথবা চাকচিক্যশালী বস্ত্র এবং শীতকালে মোটা এবং কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারীরিক ক্রিয়া সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শারীরিক তাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই বাঞ্ছনীয়।

আহার এবং অঙ্গ সঞ্চালন আমাদিগের শারীরিক উত্তাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার প্রধান উপায়। আমরা যে সমস্ত সামগ্রী আহার করি তাহা রক্তস্থিত হেমনরগ্নি পরিবাহিত অক্সিজেন সংযোগে আসিলে রাসায়নিকতেজে পরিণত হয় এবং সেই সমস্ত রাসায়নিক তেজ যথা সময়ে শারীরিক উত্তাপে পরিণত হইয়া শরীরের সকল স্থানে সঞ্চারিত হয়। কোন কারণ বশতঃ কোন স্থানে তাপের ব্যয় হইলে অবিলম্বে অন্য স্থান হইতে তাপ আসিয়া তাহা পূর্ণ করে। এইরূপে শারীরিক তাপের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দে বি, এ,।

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আলোর দ্বারা চিত্রের কোমলত্ব (softness) ও অবয়বের সুগোলত্ব (roundness) যাহাতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য, এবং কাহাতে সমালোকিত (flatness) বা অন্য পক্ষে আলোকের কর্কশতা (hardness) না হয় তাহা দেখিতে হইবে। মুখের মধ্যে কোন যায়গায় সমানরূপ আলোকে আলোকিত হওয়া বা মুখের মধ্যে ছায়া ও আলোকের সুন্দর সমাবেশ না হওয়াকে ফ্লাটনেশ (flatness) বা সমালোকিত বলা হইল, এবং মুখের একদিকে খুব আলো ও অপরদিকে খুব অন্ধকার থাকে তাহাকে কর্কশতা (hardness) বলা হইল।

এখন সাধারণ ঘরে কি প্রকার ছবি তোলা যায় তাহার কথা লিখিব। ঘরের মধ্যে চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে যেমন ভাল ছবি তোলা যায় তেমনি ছবি উঠান যাইবে। পয়সা খরচ করিয়া ষ্টুডিও প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বলেন যে তিনি ষ্টুডিও নাই বলিয়া ভাল ছবি তুলিতে পারেন না, তাঁহার ছবি তুলিয়া কাজ নাই, কারণ তাঁহার ষ্টুডিও হইলেও ভাল ছবি তোলা হইবেনা।
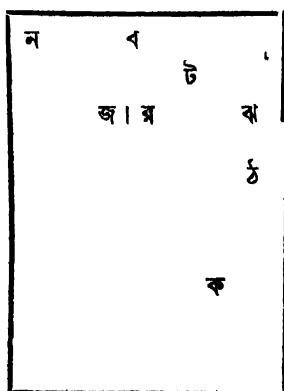
ধরিয়া লওয়া গেল যেন একটি ২০ ফিট লম্বা ও ১৫ ফিট চওড়া ঘরে কাহারও প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতে একটি জানালা

আছে; তাহা তিন ফিট আট ইঞ্চি চওড়া। এই ঘরের মধ্যে নানা যায়গায় যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে তাহাকে বসাইয়া ঠিক করিয়া দেখিতে হইবে তাহার মুখে কি ভাবে আলো পড়িতেছে। পূর্ব্বলিখিত চিত্রে অনেকটা বুঝা যাইবে।

এখন ক চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া জ চিহ্নিত স্থানে যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে তাহাকে বসান গেল ও তাহার দক্ষিণ হস্তের দিকে রিফ্লেক্টার বসান গেল। এই অবস্থায় খুব সুন্দর ও মনোমতরূপ আলোক দ্বারা আলোকিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আলোর তেজ খুব কম হয় সে জন্য বেশী এক্‌স্‌পোসার দিতে হয়। তৎপরে সে ব্যক্তিকে ঝ চিহ্নিত স্থানে বসাও। এখানে বসাইবার কারণ এই যে এ স্থানে বসিলে আলোকের খুব নিকট হইবে সে জন্য কম এক্‌স্‌পোসার লাগিবে, কিন্তু এ স্থানে মুখের এক দিকে খুব বেশী আলো হয় ও অপর দিকে অন্ধকার থাকে, রিফ্লেক্টর লাগাইলেও সে অন্ধকার কমে না। এই দোষ ফটোগ্রাফ তুলিলেই বেশী টের পাওয়া যায়, ছবি তুলিবার সময় চক্ষে দেখিয়া টের পাওয়া যায় না। সে জন্য অনেকটা অভ্যাসের পর এ দোষ টের পাওয়া যায়। এখন যদি ট স্থানে বসান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যেরূপ আলো হইয়াছে তাহা খুবই সন্তোষ জনক হইয়াছে এবং এক্‌স্‌পোসারও বেশী দিতে হইবে না।

কোন স্থানে বসিলে প্রতিমূর্ত্তি বেশ কোমল ও (harmonious) আলোকিত, তাহা ঠিক হইয়াছে, এখন কোন দিক হইতে ছবি তুলিতে হইবে তাহা ঠিক করা উচিত। মুখের তিন ভাগে আলো এক ভাগে ছায়া কিম্বা এক ভাগে আলো ও তিন ভাগে ছায়া হইলে সুন্দর ও মনোমত ফল হয়। শেষোক্ত রূপে ছবি তুলিলে তাহাকে ইংরাজীতে rembrandt বলে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দাঁড়ান ছবি তুলিতে হইলে ঘরের এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বুক পর্য্যন্ত ছবি তুলিতে হইলে ঠ ও ন চিহ্নিত স্থানের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ছবি তোলা যাইতে পারে, বোধ হয় ঠ চিহ্নিত স্থান হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছবি উঠে। কিন্তু যদি rembrandt ছবি তুলিবার ইচ্ছা থাকে তাহা

হইলে ন চিহ্নিত স্থানের দিকে সরিয়া যাইতে হয়। তবে এই সময় যাহাতে জানালার আলো লেন্সের উপর না পতিত হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য ও সেজন্য সে দিকে কোন প্রকারে ছায়া করিতে হয়। ব্যাক-গ্রাউণ্ড ব চিহ্নিত স্থানে ও রিফ্লেক্টব র চিহ্নিত স্থানে ও যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে তাহাকে ট চিহ্নিত স্থানে বসাইয়া, প্রায় ঠ চিহ্নিত স্থানে ক্যামেরা বসাইলে বেশ চলিতে পারে। যাহাতে রিফ্লেক্টর ছবিতে না উঠে সে জন্য ইহাকে সে ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়, অবশ্য যতটা কাছে রাখিলে ইহার কার্য্য হয় ততটা কাছে রাখিতে হইবে।

তাহার পর যে প্রকাবে বসাইলে ভাল দেখায় সেইরূপ করিয়া বসা-ইতে হইবে। কোন লোককে কি প্রকারে বসাইলে ভাল ও ঠিক দেখায় তাহা ঠিক করা অভ্যাসেব কাজ। কেহ কেহ head-rest বা মাথা রাখিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহাব প্রয়োজন বড় নাই, ইহা কেবল মাথা হেলান দিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

যদি ঘরে বেশী জানালা থাকে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, কেন না দুই তিন দিক হইতে আলো আসিয়া মুখে লাগিলে বড় খারাপ হয় ও চক্ষুতে কেমন এক প্রকার আলো আসিয়া পড়ে।

প্রত্যেক লোকের ছবিতে বিভিন্ন প্রকারে আলোকিত করা প্রয়োজন হইতে পাবে। (১) তাহার মুখের বিশেষ ভাব বা সৌন্দ-র্য্যকে পরিস্ফুট করা কিন্তু যাহাতে ছবিতে কর্কশতা (harshness) না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (২) যাহাতে মুখখানা আলো ও ছায়ার যথা বিহিত সমন্বয়ে বেশ সুগোল দেখায়; যাহাতে কেবল সম্মুখ হইতে মুখের উপর আলোক পড়িয়া চেপ্টা না দেখায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (৩) যাহাতে ব্যাকগ্রাউণ্ডের সহিত ছবি না মিলিয়া যায় অর্থাৎ যাহাতে বা প্রতিমূর্ত্তি হইতে ব্যাকগ্রাউণ্ডের দূরত্ব প্রকাশ পায় তাহা দেখা উচিত। এই কয় প্রকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ক্রমে ছবি তুলিবার উৎকর্ষ হইতে পারে।

অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই আণ্ডার এক্‌স্‌পোসার বা কম সময় এক্‌স্‌পোস

করার দরুণ খারাপ হইয়া যায়। তজ্জন্য ছবি কর্কশ (harsh) হয় ও কোমলত্ব থাকে না, সুগোলত্ব থাকেনা, নাক, চোখ ও কাণের দূরত্ব বুঝা যায় না। কোন কোন ছবির স্থানে স্থানে আলো লাগার জন্য খারাপ হয়, কোন কোনটির উপর দিক হইতে খুব বেশী আলো লাগিয়া খারাপ হয়, আবার কোনটির বা কাঁধে হাতে ও কাপড়ে বেশী আলো লাগে বলিয়া আগেই সেই সকল স্থানেই চক্ষু পড়ে ও সেজন্য ভাল দেখায় না।

প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যাকগ্রাউণ্ড একটি প্রধান জিনিষ এবং ইহা যত সাজ সজ্জা বিহীন ও সাদাসিদা হয় ততই ভাল। ছবি তুলিতে মানুষের মুখ ও সমস্ত অবয়বই প্রধান ও অন্যান্য জিনিষ গুলির স্থান ইহার পরে। যখন কোন মাথা ও কাঁধ বা বুক পর্য্যন্ত ছবি তুলিবে হইবে তখন সমানু-ক্রমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড (gradated background) ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মুখের যে দিকটায় ছায়া পড়ে তাহার পশ্চাৎ দিকের ব্যাকগ্রাউণ্ডে যেন ফিকা হয় ও যেদিকে আলো পড়ে তাহার পশ্চাৎ-দিকের ব্যাকগ্রাউণ্ড যেন গভীর বর্ণ হয়। এ ব্যবস্থা এই gradated background করিলে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসুকুমার মিত্র।

প্রশ্নোত্তর।

বিগত চৈত্র মাসের "বিজ্ঞান দর্পণে" নিম্নলিখিত প্রশ্নটি প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

"জনৈক রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার রেল রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময় অনুমান ৪০০ শত পাউণ্ড ওজনের ৩০ ফুট লম্বা একটি রেল ওজন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার নিকট ২৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন করা যাইতে পারে এরূপ একটি স্থির আলম্ব বিন্দু বিশিষ্ট দাঁড়ী পাল্লা (balance of fixed fulcrum) ছিল। তিনি ঐ রেল কি প্রকারে ওজন করিতে পারেন ?"

এই প্রশ্নেব দুইটি উত্তব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)
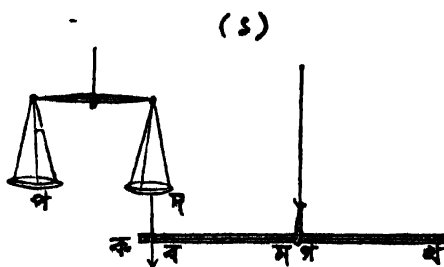
(১) বেলটিব সকল অংশ সমান স্থূল (uniform) কিনা প্রথমে তাহা জানিযা লইতে হইবে, কাবণ উহাব কোনও কোনও অংশেব স্থূলভাব ইতব বিশেষ হইলে ঐ সকল অংশেব ভাবেবও ন্যূনাধিক্য হইবে তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়টি খাটিবে না। বেলটিব এইরূপ পবীক্ষা কবিবাব জন্য উহাব মধ্যবিন্দু ম এব নিকট একগাছি দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হইবে যদি বেলেব ভাব সকল স্থানে সমান হয তবে উহাব মধ্যবিন্দুই উহাব ভাবকেন্দ্র হইবে, সুতবাং বেলটি horizontal ভাবে ঝুলিতে থাকিবে। মনে কবা যাউক যে বেলটি বাস্তবিকই সমান ভাব বিশিষ্ট। এক্ষণে এইরূপে উহাব ভাব বাহিব কবা যাইতে পাবে। রেলটিকে একটু সবাইযা ঠিক অর্দ্ধফুট দূববর্ত্তী গ বিন্দুর নিকট দড়ি স্থাপিত হইল। এখন খ গ এব অপেক্ষা ক গ এই অংশেব ভার অধিক। খ গ = ১৪.৫ ফুট, এবং কগ = ১৫.৫ ফুট, অর্থাৎ ক গ এব দৈর্ঘ্য খ গ এব অপেক্ষা এক ফুট অধিক। মনে কবা যাউক যে ব গ ১৪.৫ ফুট দীর্ঘ অর্থাৎ খ গ এব সমান। তাহা হইলে ক গ এব ভাব খ গ এব অপেক্ষা কত অধিক? ক ব এব যতটুকু ভাব ততটুকু অধিক, কাবণ ব গ = গ খ। সুতবাং ক হইতে অর্দ্ধফুট দূববর্ত্তী একটি বিন্দুব নিকট আব একটি দড়ি বাঁধিযা একটি দাড়িব পাল্লাব সহিত যোগ করিয়া দিযা ওজন বাহিব কবিলে, ঐ ওজন ক ব এই অংশেব ভাব, কাবণ ব গ ও খ গ পবস্পরকে সামঞ্জস্য (balance) করিতেছে,—উহাদেব ভার নাই মনে করিলেও চলে। মনে কবা যাউক যে ক ব এব ভার ভ, এবং

উহার দৈর্ঘ্য একফুট। সুতরাং ত্রিশফুট দীর্ঘ রেলটির ভার ক ব এর ত্রিশ গুণ। এইরূপে এক ফুট রেলের ভার বাহির করিয়া লইয়া সমস্ত রেলের ভার হিসাব করিয়া লওয়া যায়। রেলের ভার যদি অনুমাণ ৪০০ পাউণ্ড হয় তবে এক ফুটের ভার ১৮ পাউণ্ডের ন্যূন, সুতরাং উপরোক্ত দাঁড়ি পাল্লার দ্বারা অনায়াসে ওজন করা যাইতে পারে।
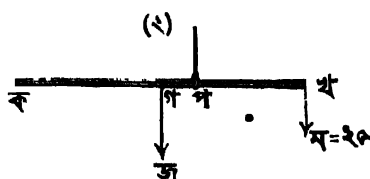
(২) আর একটি উপায়ে রেলের ওজন বাহির করা যায়, তাহাতে দাঁড়ি পাল্লার কোনও প্রয়োজন হয় না। রেলের মধ্যবিন্দু গ উহার ভার কেন্দ্র, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে, সুতরাং গ এর নিকট ৪০০ পাউণ্ডের ভার কার্য্য করিতেছে এরূপ মনে করা যায়। এক্ষণে খ এর নিকট ২৫ পাউণ্ডের বাটখারাটি ঝুলাইয়া দেওয়া যাউক। খ, গ এর ভার বৃদ্ধি হওয়ায় রেলটিকে সরাইয়া এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে উপরোক্ত দুইটি ভারের সাম্যাবস্থা (equilbiium) হয়। মনে করা যাউক প বিন্দুর নিকট দড়ি সরিয়া আসিল।

এক্ষণে —জ × গ প = ২৫ × প খ

সুতরাং জ = $\frac{২৫ \times প খ}{গ প}$.

এইরূপে জ অর্থাৎ রেলের ভার বাহির করা যায়।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি, এ।

বিবিধ।

কাচ।—ফরাসী দেশে অধুনা একরূপ কাচ উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণ কাচ এতই ভঙ্গুর, যে অল্প আঘাতেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কাজেই মণি মাণিক্যের দোকানে এই কাচ সুদৃশ্য হইলেও নিরাপদ আবরণ

নহে। এই নব উদ্ভাবিত কাচ এত কঠিন হইয়াছে, যে উহাতে সজোরে একটি লৌহমুদ্গর আঘাত করায়, মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি গর্ত্ত হইয়াছিল। পিস্তলের গুলির আঘাতে ইহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। উপর্য্যুপরি গুলির আঘাতে এক ইঞ্চির অতি সামান্য পরিমাণ গভীর গর্ত্ত হইয়াছিল। এই কাচ সাধারণতঃ ১ ইঞ্চি মোটা হয়। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি অনায়াসে ইহা অপেক্ষাও মোটা কাচ প্রস্তুত করাইতে পারেন। তাহাতে কাচের সচ্ছতার পরিমাণ বিশেষ হ্রাস হয় না।

খর্জ্জুর।—আলজিবিয়ার হরটিকালচারাল সোসাইটির কোন অধিবেশনে তৎপ্রদেশ সম্ভূত এক প্রকার খর্জ্জুর প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই খর্জ্জুর বীজশূন্য। অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে, এবং নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা কৃষকগণ এইরূপ খর্জ্জুর উৎপাদন করিয়াছে। আজকাল এইরূপ খর্জ্জুর অল্প উৎপাদিত হইতেছে বটে, তবে ভবিষ্যতে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে এইরূপ খর্জ্জুর হইতে পারে তাহার চেষ্টা হইতেছে।

গঁদ।—গাম আরেবিকের দ্রাবণ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে শুষ্ক হইয়া কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ইহাতে অল্প পরিমাণ কর্পূর ফেলিয়া দিলে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাতে গামের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেহ কেহ সামান্য পরিমাণ গ্লিসরিণ ও ঢালিয়া দিয়া থাকেন।

মৃত্যু।—প্রফেসর সাইমন নিউকোম্ব বিগত ১১ই জুলাই তারিখে ওয়াশিংটন নগরে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। আধুনিক জগতে তাঁহার ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ অত্যন্ত বিরল। তিনি যে কেবল মাত্র আমেরিকার রত্ন স্বরূপ তাহা নহে, তিনি সমস্ত জগতেরই অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্কার ছিলেন।

রেলওয়ে।—যাহাতে এক খানা রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া মাল ও আরোহী যাতায়াত করিতে পারে, তজ্জন্য মিঃ ব্রেনান এক নূতন ধরণের গাড়ী প্রস্তুত করিতেছেন। কালকা সিমলা রেল পথের কামারহাটী এবং ধরমপুরের মধ্যস্থিত স্থানে এই সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। কার্য্য ও পরীক্ষা সমাধা হইলে, উহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

১ম বর্ষ।] আশ্বিন ১৩১৬, সেপ্টেম্বর ১৯০৯। [৯ম সংখ্যা।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা আজ পর্য্যন্ত ইথার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, ইথার গঠনে এবং প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ জটিলতাশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র সমনিবিড়তাবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অধিক চাপ প্রয়োগ করিলেও আদৌ সঙ্কুচিত হয় না। সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও, ইহাকে বিভিন্ন করা যাইতে পারে না, কিম্বা ইহা অন্য কোনরূপ মৌলিক পদার্থেও বিশ্লিষ্ট হয় না। বাস্তবিকই ইহা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অবিভিন্ন এবং অদ্বিতীয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থই অণুপরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু ইথার অণুপরমাণুর সমষ্টি নহে; কাজেই আমাদের পরিচিত কোন পদার্থই ইহার সদৃশ নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত সাধারণ পদার্থ হইতে ইথারের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই সমস্ত কারণে ইথার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া বড়ই কষ্টকর। পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই অণু-পরমাণুর সমষ্টি, কাজেই সূক্ষ্ম-রন্ধ্র সমাকুল (porous); আমাদের সুপরিচিত এই সমস্ত পদার্থ যে রন্ধ্র-সমাকুল এরূপ, ধারণা করাই কষ্টকর, পরন্তু সমস্ত স্থান-ব্যাপক, নিরবচ্ছিন্ন, অথচ ছিদ্রশূন্য ইথারের ধারণা করা যে

অধিকতর কষ্টকর, তাহার আর সন্দেহ কি? ইথারের কাঠিন্য বা দৃঢ়তার পরিমাণ করিতে যাইয়া, ইহাকে পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কখনও বায়বীয় পদার্থের ন্যায়, কখন তরল পদার্থের ন্যায়, কখনও বা কঠিন পদার্থের ন্যায়, কখনও বা আবার জেলীর ন্যায় কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মানবের ভাষায় কোন কথাই ইথারের প্রকৃত প্রকৃতি বা ধর্ম্ম নির্দ্দেশক নহে। এই সমস্ত বিভিন্ন মতের জন্য ইথারের প্রকৃতি অনুমান করা আরও কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তবে ইথারের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হইলে, ইহাই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ইহা নিরবচ্ছিন্ন এবং অবন্ধুর; এবং কোন রকমে বুঝিয়া ফেলিতে হইবে যে, ইহা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন, অতিশয় সূক্ষ্ম এবং অনমনীয়, ও সমস্ত ব্যোমপথ, এমন কি পদার্থের অনুদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানেও পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পদার্থসমূহ ইথারে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; কাজেই সমস্ত পদার্থই ইহার দ্বারা সংযুক্ত। পদার্থের ক্রিয়া বা ধর্ম্মসমূহ ইথার মধ্য দিয়াই পরিচালিত হয়; এবং ইথারই পদার্থের গতি বা প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ পরিবাহিত হইবার মার্গ। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আলোক ইথার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়।

পদার্থের পরমাণু সমূহ শব্দ তরঙ্গ পরিবাহিত হইবার পথ, এবং এই পরমাণু সমূহের ঘন-সন্নিবেশই শব্দ তরঙ্গ ব্যাপ্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু আলোক তরঙ্গ অণু পরমাণুর সহযোগে ব্যাপ্ত হয় না; কেননা ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০,০০০ কিলোমিটার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের কণিকা-সমূহ-সহযোগে যতরূপ গতি বা তরঙ্গের পরিব্যাপ্তি সম্ভব, সেই সমস্ত অপেক্ষা আলোকের গতি অত্যধিক ক্ষীপ্রতর। শব্দ তরঙ্গ অতি স্থূল, কাজেই স্থূল পদার্থ-কণিকার ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ পরিব্যাপ্ত হয়। আলোক তরঙ্গ, তড়িৎবিক্ষোভসঞ্জাত তরঙ্গ সমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম, কাজেই ইহাদের পরিব্যাপ্তির জন্য অতি সূক্ষ্ম ইথারের প্রয়োজন। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, যদি বায়ু-মণ্ডলকে অত্যন্ত বিরলীকৃত করা হয়, অথবা যে স্থানের বায়ু স্বভাবতঃই অত্যন্ত লঘু, সেই স্থানের বায়ুর মধ্য দিয়া তড়িৎ ও আলোক তরঙ্গ পরিবাহিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে।

এই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ পরিবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য ইথারের প্রয়োজন। কাজেই ইথার বায়ু হইতে পৃথক্ পদার্থ। গ্রহ উপগ্রহ বা সৌর জগত সমূহের মধ্যবর্ত্তী মহাকাশেও বায়ুর অস্তিত্ব সম্ভব। যদি সেই মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব আছে বলিযা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ইথারের তুলনায় সেই বায়ুর ঘনতা অতি সামান্য। ইহা পরিমিত হইয়াছে যে, পৃথিবী হইতে ৪০০০ মাইল উর্দ্ধদেশে বায়ু মণ্ডলের ঘনতার পরিমাণ এত সামান্য যে দশমিক বিন্দুর পর ১২৭টি শূন্য বসিলে তবে ১, ২, ৩ ইত্যাদির কোন সংখ্যা পড়ে। পক্ষান্তরে সূর্য্য কিরণের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য পুইলের (Pouillet) প্রদত্ত বিষয় সহায়তায় ও আলোক-তরঙ্গ-কম্পনের বিস্তারের ন্যায়-সঙ্গত অনুমান দ্বারা সার উইলিয়াম টম্‌সন্ (Sir William Thomson) ইথারের ঘনতার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইথারের ঘনতা দশমিক বিন্দুর পর ১৭টি শূন্য বসিলে তবে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা পড়ে। কাজেই মহাকাশের বায়ু এত সামান্য ঘন, যে তাহাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে; এবং তথাকার বায়ুর তুলনায় ইথারের ঘনতা অত্যন্ত অধিক। যাহা হউক, পণ্ডিতগণের এই অভিমত স্বচ্ছন্দে পরিপোষিত হইতে পারে যে, ইথার সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং ইহা সর্ব্বত্র সমনিবিড়তা বিশিষ্ট। এইরূপ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, প্রাচীন কালের দার্শনিকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোন স্থানই একবারে পদার্থ-শূন্য হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বৈব যুক্তিযুক্ত। এই ব্যোম-জড়-জগৎ (mat-etherial world) বাস্তবিকই পদার্থ ও ইথারেরই সমষ্টি। জগতে ইথারই শক্তি, এবং কেহই পদার্থ হইতে শক্তির পৃথক্ কল্পনা করিতে পারে না। কেননা শক্তির অভাবে পদার্থ অসম্ভব, ও পদার্থ না থাকিলে শক্তির বিকাশ বা উৎপত্তি কোথায়? সার অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) এ সম্বন্ধে একটী অত্যুৎকৃষ্ট অভিমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত এই পদার্থগত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা সম্বন্ধে মানবোদ্ভাবিত যত কিছু অভিমত কল্পিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সরল এবং অনায়াস বোধ্য সেইটিই বুঝাইবার জন্য সার অলিভার লজ চেষ্টা করিয়াছেন। সে অভিমতটি

এইরূপ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ মাত্রেই, সর্ব্বত্র সমনিবিড়তা-বশিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ জটীলতাবিহীন কেবল একটি মাত্র পদার্থ-সঞ্জাত। এই পদার্থ মানবের জ্ঞানগম্য মহাকাশের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অদ্বিতীয় পদার্থের কোন অংশ নিস্কম্প বা সুস্থির রহিয়াছে, অথবা কোন অংশ কম্পিত হইতেছে। এই শেষোক্ত অংশও আবার দুই বিভিন্ন প্রথায় কম্পিত হইতেছে। প্রথমতঃ কোন অংশের কম্পন একেবারে আবর্ত্তন শূন্য অর্থাৎ হয় লম্বভাবে, অথবা শাম্বিত সরলরেখাক্রমে কম্পিত হইতেছে। এই কম্পন দ্বারাই আলোক বা তড়িৎ তরঙ্গ পরিবাহিত বা পরিব্যাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন অংশের কম্পন সম্পূর্ণ আবর্ত্তনপূর্ণ, অর্থাৎ এই কম্পিত অংশ একই স্থানে ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে, কাজেই এই অংশ, এই আবর্ত্তন জন্য, অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই আবর্ত্তিত বা বিঘূর্ণিত অংশেরই অপর নাম মানবের "ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ"। এই কম্পনই কম্পিত বা বিক্ষুব্ধ অংশকে কাঠিন্য প্রদান করে, এবং তাহা হইতেই পদার্থ সমূহ সংগঠিত। এইরূপ কল্পনায় কি অসীম সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এই অনন্ত বিশ্ব, সৃষ্টির অনন্ত ঘটনা, প্রকৃতির অনন্ত শক্তি, এক অদ্বিতীয়, অবিভক্ত পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত। এই অদ্বিতীয় পদার্থই ইথার। প্রকৃত পক্ষে এই অচিন্তনীয় ধারণার মূলে একেশ্বরত্বের (monism) ধারণা নিহিত রহিয়াছে। ফ্ল্যামেরিয়োও (Flamarion) এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন যে, অননুভবনীয়, অপরিদৃশ্য, পরমাণু সমূহ, পদার্থের বাহ্যাবয়ব-উপলব্ধি-শক্তি সম্পন্ন মনের পক্ষে অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় হইলেও, এই পরমাণু সমূহ হইতেই বাস্তবিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে পদার্থ এই সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই আর কিছুই নহে, কেবল পরমাণু সমূহের তীব্র গতি জনিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে একটা ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়া বা ফলমাত্র।

এই সমস্ত উক্তি ও অভিমত সম্যক আলোচনা করিলে এই টুকু মাত্র ধারণা হয় যে, পদার্থের শক্তি যেরূপ একরূপ গতি দ্বারা প্রকটিত হয়, সেইরূপ পদার্থ গুলি নিজেও একটা বিভিন্নরূপ অনির্ব্বচনীয় গতি ভিন্ন আর

কিছুই নহে। যদি এই গতি নিবারিত হয়, যদি শক্তি বিধ্বংশ হয়, যদি উত্তাপ সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হয়, তাহা হইলে আমরা যাহাকে পদার্থ বলি, অথবা যাহারা আমাদের নিকট "পদার্থ" এইরূপ সংজ্ঞা পাইতে পারে, তৎসমুদায়ের অস্তিত্বও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

এইরূপ কল্পনা বাস্তবিকই অর্থ সঙ্গত; অথবা এই ব্যোম জড়-ব্রহ্মাণ্ড (mat-etherial world) যে কেবল মাত্র অপরিদৃশ্য ও অচিন্তনীয় পরমাণু সংসৃষ্ট এরূপ কল্পনা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায় সঙ্গত বা যুক্তি সঙ্গত কল্পনা উপলব্ধ হইতে পারে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা বিশিষ্ট গতির ফলস্বরূপ। ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা স্বরূপ। আমার মনে হয়, সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সেই একই অদ্বিতীয় তপন আলোকে সেই একই পৃথিবী আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হইবে, সেই একই নির্ঝরের পীযূস ধারায়, শান্তি সুষমায়, ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া হাসিবে, এবং সেই একই হইতে অনন্ত বিশ্ব মুকুলিত হইবে; তখন একই দেহে একই প্রাণ, একই বিশ্বে একই গান একই তানে জগৎ মোহিত করিয়া এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভাসিত করিবে। পরিশেষে ইথার সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইথার একটি নিরবচ্ছিন্ন পদার্থ এবং ইহা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই স্পন্দিত হইয়া আলোক উৎপন্ন করে এবং ইহার স্পন্দনই বিভিন্নরূপে সম ও বিসম তড়িৎ উৎপাদন করে। ইথারই আবর্ত্তিত ও স্পন্দিত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থে পরিণত হয়, এবং এই পদার্থ সঞ্জাত বিভিন্ন রূপ শক্তি, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্তই ইথার দ্বারা পরিবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। এই পরি-ব্যাপ্তির সময় ইথার বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ ইহার অবিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয় না; অথবা শব্দ তরঙ্গ যেরূপ পরমাণু সমূহের ঘাত প্রতিঘাতে পরিবাহিত হয়, ইথারে সেরূপ ঘাত প্রতিঘাত সহযোগে তরঙ্গ পরিবাহিত বা পরি-ব্যাপ্ত হয় না। ইহাই ইথারের প্রকৃত ধর্ম্ম ও অবয়ব নির্দ্দেশক এবং এই অভিমতই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার রাসায়নিক বিভাগে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটির উপাদান-পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঁকতুলসী আতপ চাউল :—

আদ্র্তা (moisture)	.	শতকরা	১২·৫	ভাগ
ভস্ম (ash) ...	...	,,	০·৭৬	,,
তৈলাক্ত পদার্থ (fat)	...	,,	০·৭	,,
শ্বেতসার (starch)	...	,,	৭৯·২	,,
নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ	...	,,	৬·৮৩	,,

বাঁকতুলসী সিদ্ধ চাউল :—

আদ্র্তা	...	...	শতকরা	১১·০৬	ভাগ
ভস্ম	...	...	,,	০·৮৪	,,
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	,,	০·৯	,,
শ্বেতসার	...	...	,,	৮০·১	,,
নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ		...	,,	৬·৭১	,,

চাউল, শ্বেতসার ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের আধিক্যানুসারে উৎকৃষ্ট ও হীনতর হয়। বিশেষতঃ শেষোক্ত পদার্থ যত অধিক হইবে চাউল, দাইল ইত্যাদির পুষ্টিকরত্ব ও তত বৃদ্ধি পাইবে। শ্বেতসারের অধিকাংশই "ফেনের" সহিত মিশ্রিত হয়।

খাঁড়ি মসুরীর দাইল :—

আদ্র্তা	...	...	শতকরা	৯·৬৬	ভাগ
ভস্ম	...	...	,,	১·৯২	,,
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	,,	১·৩০	,,
শ্বেতসার	...	...	,,	৬১·৩২	,,
নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ		...	,,	২৫·৮০	,,

ছোলার দাইল :—

আর্দ্রতা	... ...	শতকরা	৯.৫৮	ভাগ
ভস্ম	... ...	,,	২.৪৪	,,
তৈলাক্ত পদার্থ	... ...	,,	৪.৩০	,,
শ্বেতসার	... ...	,,	৬০.০২	,,
নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ	...	,,	২৩.৬৬	,,

দাইলের মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থই প্রধান এবং পুষ্টিকর।

সাধারণ ময়দা :—

রোলাম (glutin)	শতকরা	১১.২০	ভাগ।
ভস্ম (ash) ...	,,	০.৭	,,
আর্দ্রতা (moisture)...	,,	১৭.৮	,,
শীতল জলে দ্রবণীয় পদার্থ	,,	৪.৯	,,
তৈলাক্ত পদার্থ (fat) ...	,,	১.০৬	,,
শ্বেতসার (starch) ...	,,	৬৭.৫	,,

রোলাম ও শ্বেতসার পুষ্টিকর অংশ।

কাশীর চিনি :—

দ্রাক্ষা শর্করা	... ...	শতকরা	৮.৬৯০	ভাগ
ইক্ষু শর্করা	... ...	,,	৮৫.৭৯০	,,
আর্দ্রতা	... ...	,,	৩.২৬০	,,
ভস্ম	... ...	,,	০.০২৫	,,
চিনি ভিন্ন অন্য অঙ্গার মূলক পদার্থ		,,	২২৩৫	,,

দোবরা চিনি :—

দ্রাক্ষা শর্করা	... ...		অতি সামান্য	
ইক্ষু শর্করা	... ...	শতকরা	৯৭.০০০	ভাগ
আর্দ্রতা	... ...	,,	০.১০০	,,
ভস্ম	... ...	,,	০.১০০	,,
চিনি ভিন্ন অন্য অঙ্গার মূলক পদার্থ		,,	২.৮০০	,,

অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধ :—

আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে			১০.৩২	
কঠিন অংশ (solid)	.. ...	শতকরা	১৫.৫	ভাগ
দুগ্ধ শর্করা	... ...	,,	৫.৬১	,,
মাথন (fat)	... ..	,,	৭.২৬	,,
জলীয় অংশ	... ...	,,	৮৪.৫	,,
মাথন ভিন্ন অন্য কঠিন অংশ ..		,,	৮.২৪	,,

কলিকাতার বাজারের দুগ্ধ :—

আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্বোক্ত উত্তাপে			১০-১৭	
কঠিন অংশ	... ...	শতকরা	৭.৮৩	ভাগ
দুগ্ধ শর্করা	... ...	,,	২.৬	,,
মাথন (fat)	.. ...	,,	২.২৭	,,
জলীয় অংশ	... ...	,,	৯২ ১৭	,,
মাথন ভিন্ন অন্য কঠিন অংশ		,,	০.৩৯	,,

জলীয় অংশ ভিন্ন অন্য সমস্ত অংশই উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইতে কলিকাতার বাজারের দুগ্ধে অল্পতর। এই নিকৃষ্ট দুগ্ধে পুষ্টিকর অংশ এতই অল্প যে দুগ্ধ ও জল পানে প্রায় সমানই ফল হয়।

সাধারণ চা :—

আর্দ্রতা	... ...	শতকরা	৯.৯৫	ভাগ
ভস্ম	... ...	,,	৪.৯	,,
ট্যানিন (tanin)	... ...	,,	১৫.৯	,,
জলীয় নির্য্যাস	... ...	,,	৩৭.০	,,
টিইন (theine)	... ...	,,	০.৮৪	,,

ট্যানিন বিষাক্ত পদার্থ। অধিকক্ষণ গরম জলে রাখিলে চা হইতে ট্যানিন অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া পড়ে। সেই নিমিত্ত চা অল্প সময় জলে রাখা উচিত। টিইন চায় উত্তেজক অংশ।

ভ্রমণ করে। এই কক্ষ পথে একবার পরিভ্রমণ করিতে এই ধূমকেতুর ৭৫ কিম্বা ৭৬ বৎসর আবশ্যক হয়। আকাশ পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইহা যখন সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহা পৃথিবীর কক্ষাভ্যন্তর দিয়া গমন করে। গ্রহ কক্ষের যেস্থান বা বিন্দু সূর্য্যের নিকটতম থাকে, সেই স্থানকে ইংরাজিতে পেরিহিলিঅন (perihelion) বলে ; এবং যে স্থান বা বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকে তাহাকে য্যাপহেলিঅন (aphelion) বলে। কাজেই এই ধূমকেতু পেরিহেলিঅনে পৃথিবীর কক্ষ ভেদ করিয়া গমন করে ; এবং য্যাপহেলিঅনে সৌর জগতের সীমা অতিক্রম করে। সেই জন্যই, একবার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৭৫ কিম্বা ৭৬ বৎসর লাগিলেও সম্পূর্ণ ৭৩ বৎসর ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগেও দেখা যায় না। এই দুই তিন বৎসর মধ্যে ইহা বৃহস্পতির কক্ষের পরপারে চলিয়া যায়। বৃহস্পতির কক্ষের অভ্যন্তরে আসিলেই ইহা পৃথিবী হইতে সান্ধ্য বা ঊষা নক্ষত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করিলে তবে ইহাকে বুঝিতে পারা যায়, যে ইহা ধূমকেতু ; পরে যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়, এবং অবশেষে বিনা যন্ত্র সাহায্যে কয়েকমাস ধরিয়া ইহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এতই সমুজ্জল দীপ্তি সম্পন্ন, যে ইহা অনাসক্ত দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার উজ্জলতম কলা (phase) শেষ হইলে ইহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া একবারে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে। এই বারের প্রদক্ষিণ কালে ইহার উজ্জ্বলতম কলা ১৯১০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে শেষ হইবে। ১৮৩৬ সালের মে মাসে ইহাকে কেপের মান মন্দিরে (Cape Observatory) শেষবার দেখা হইয়াছিল। তাহার পর পৃথিবী হইতে আর ইহাকে দেখা যায় নাই। ইহা লোক চক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও, নাবিক যেরূপ গৃহে বসিয়া পথহীন অনন্ত সাগরে অর্ণবপোতের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ গণিত শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ অনন্ত আকাশে ইহারও পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা পৃথিবী হইতে ১৫,০০,০০,০০০, প্রায় পনের কোটী ক্রোশ পথ দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু

মানব জ্ঞানবলে প্রতিদিন পৃথিবী হইতে ইহা কতটুকু দূরে গমন করে তাহারও নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ; এবং এই ৭৩ বৎসর কাল দৃষ্টি পথের বহির্ভাগে অনন্ত আকাশের কোন অপরিচিত স্থানে পরিভ্রমণ করিলেও, পণ্ডিতের নয়নে ইহার সমুজ্জল দীপ্তি প্রতি রজনীতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সাধারণ মানবে জ্ঞাত নহে, তাহার বুঝিবারও শক্তি নাই, কিন্তু পণ্ডিতগণ বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন যে, ইহা এক অপবিবর্ত্তনীয় ও দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ক্রমাগত পবিভ্রমণ করিতেছে। নিয়মের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা কেবল ক্ষুদ্র ধূমকেতুর কেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। পত্রিকাব প্রথমেই যে চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ১৮৩৫ হইতে ১৯১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা আকাশেব যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছে, তাহারই মানচিত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহাকে ১৮৩৬ সালের মে মাসে শেষবাব দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে ইহা মঙ্গলের কক্ষ হইতে বৃহস্পতির কক্ষ অভিমুখে দ্রুত বেগে প্রধাবিত হইতেছিল। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দেই ইহা বৃহস্পতির কক্ষ অতিক্রম করিতে ছিল, সেই সময়ে বৃহস্পতি অতি অল্প দূরে অবস্থিত ছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে শনির কক্ষ, ইহার ৬ বৎসর পরে ইউরেনাসেব কক্ষ, এবং ২০ বৎসর পরে সৌর জগতের শেষ গ্রহ নেপচুনের কক্ষ অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল। অনন্ত আকাশ সীমাহীন, পথহীন ; আর এই ধূমকেতুগুলি যেন অনন্ত সমুদ্রের মধ্য স্থলে অসীম সুন্দর অর্ণবযানের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় মহিমা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, সৌন্দর্য্য চিন্তা কবিলে পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। ১৮৭২ খ্রীঃঅব্দে হেলির ধূমকেতু ইহার কক্ষেব শেষ প্রান্তে (appalion) উপনীত হইয়া, বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়া, যেন পরিশ্রান্ত নাবিকের ন্যায় আবার গৃহ অভিমুখে, সূর্য্য অভিমুখে ধীরে ধীরে, অগ্রসর হইতে আবন্ত করিয়াছিল। এই বিংশ শতাব্দিব প্রারম্ভেই ইহা ইউরেনিয়াসের কক্ষের এ পারে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে শনির এবং এই বৎসরের প্রারম্ভেই বৃহস্পতির কক্ষের অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছিল। গত জুন মাসে ইহা পৃথিবী হইতে ৫,০০,০০,০০,০০ মাইল

হেলির ধূমকেতু।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ধূমকেতুর আগমন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কেননা ১৯০৯ এবং ১৯১০ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঞ্চার সম্বন্ধে ইহাই প্রধানতম ঘটনা। ধূমকেতু সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই ইহার উদয় দেখিবার জন্য লোক মাত্রেই উৎসুক হইয়া পড়ে। সমস্ত ধূমকেতুর কক্ষ পথ, হয় বৃত্তাবাস আকারের (elleptical), অথবা ইহার কক্ষপথের প্রান্তদ্বয়, ক্রমশঃ বিপ্রকৃষ্ট হইয়া যায় (parabola or hyperbola)। যে সমস্ত ধূমকেতুর কক্ষপথ বৃত্তাবাস আকারের, তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, এবং অন্য প্রকারের ধূমকেতু পৃথিবী হইতে কেবলমাত্র একবার দেখা যায়। কোন একটী আদর্শ ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহা একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ইহাকে ইংরাজিতে nucleus বলে। এই নিউক্লিয়াস্ একটা অপ-রিষ্কার আলোকে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহাকে কোমা (coma) বলে, এই কোমাই বহুদূর বিস্তৃত হইয়া ধূমকেতুর পুচ্ছে পরিণত হয়। অনেক ধূমকেতুতে নিউক্লিয়াস্, কোমা এবং পুচ্ছের কোন না কোনটির অভাব হইয়া থাকে। পৃথিবী যে সমতলে কক্ষ প্রদক্ষিণ করে সমস্ত গ্রহই সেই সমতলে আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু ধূমকেতু ঠিক সেই সমতলে পরিভ্রমণ করে না, গ্রহাদির সমতল ও ধূমকেতুর কক্ষ উভয়ে মিলিত হইয়া একটা কোণে অবনত হয়। ধূমকেতু কোন্ কোন্ উপাদানে সংগঠিত তাহা আজ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই; কিন্তু এই সমস্ত উপাদান এত স্বচ্ছ, যে তাহাদের মধ্য দিয়া দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে নক্ষত্রের জ্যোতিঃর কোনরূপ হ্রাস হয় না। আজ পর্য্যন্ত এইরূপ নির্দ্দিষ্টকালে আবর্ত্তিত বহু ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে হেলির ধূমকেতু প্রধান, এবং অনেক কাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন করে বলিয়া ইহা হইতে ধূমকেতু ও গ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ধূমকেতুর কক্ষ প্যারাবোলা কিম্বা হাইপারবোলা, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অন্য গ্রহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট

হইয়া, সেই গ্রহ কক্ষ পার্শ্বেই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বৃহস্পতির আকর্ষণ শক্তি অন্য সমস্ত গ্রহের অপেক্ষা অধিকতর। কাজেই বৃহস্পতির কক্ষ সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক ধূমকেতু পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৮১১ খৃঃ অব্দে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, তাহা পৃথিবী হইতে ১ বৎসর ৫ মাস ধরিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল। এবং ইহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ১০,০০,০০,০০,০০ মাইল ছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ধূমকেতু দিবা-লোকেও দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ইহাই অন্য সমস্ত ধূমকেতু অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটতম হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ডোনেটির ধূমকেতুকে বিনা যন্ত্র সাহায্যে চারিমাস কাল ধরিয়া বেশ পরিষ্কার দেখা গিয়াছিল। নির্দ্ধারিত হইয়াছে প্রতি ২০০০ বৎসর অন্তর এই ধূমকেতু পৃথিবী হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ ভেদ করিয়া পৃথিবী চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ঘটনা সম্ভাবিত হয় নাই। কেপলার অনুমান করিয়াছেন, সাগরে মৎস্যরাশির ন্যায় অন্তরীক্ষেও ধূমকেতু রাশি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই অসংখ্য ধূমকেতুর একটি কি দুইটি আমরা কচিৎ দেখিতে পাইয়া থাকি। পৃথি-বীর সহিত কোন ধূমকেতুর সংঘাত সম্ভবপর নহে, অন্ততঃ পরবর্ত্তী ১৫,০০,০০,০০ বৎসরের মধ্যে এরূপ ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে ধূম-কেতুর অবয়ব পরিমাণ বা ইহার আয়তনে পদার্থ সন্নিবেশ এতই অল্প যে, ইহাদের দ্বারা, কোন গ্রহ কখনও আকৃষ্ট হইতে পারে না, পরন্তু ধূমকেতু সমূহই গ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ধূমকেতুর যে অংশকে পুচ্ছ মনে করি, তাহা বাস্তবিকই পুচ্ছ নহে, কেননা পুচ্ছ বলিলেই পশ্চাতের অংশ মনে হয়। অশ্বের অগ্রগমন কালে পশ্চাতেই পুচ্ছ থাকে, কিন্তু ধূমকেতুর পক্ষে ইহার ঠিক বিপরীত। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় তখন পুচ্ছ পশ্চাতে থাকে বটে, কিন্তু ইহা যখন সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হয়, তখন ইহার পুচ্ছ অগ্রে থাকে, কেননা, ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস্ সকল সময়েই সূর্য্যের অভিমুখে অবস্থিত থাকে।

হেলি আবিষ্কৃত এই ধূমকেতু সূর্য্য মণ্ডল হইতে আকাশের বহু দূর বিস্তৃত প্রদেশ পর্য্যন্ত, বৃত্তাবাস আকারের কক্ষ পথে পরি-

নানারূপ কুসংস্কার দোষ ছিল; এ দোষের যথেষ্ট ন্যায় সঙ্গত কারণও রহিয়াছে। বোধ হয় ধূমকেতুর আবির্ভাব অমঙ্গল সূচক ভাবিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ উহার আলোচনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ কুসংস্কার ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়:—Canst thou tearless gaze (Even night by night) on that prodigious Blaze, That hairy comet, that long streaming star, Which threatens earth with famine, Plague, and War? ১৪৫৬ খৃঃ অব্দে ইস্তাম্বুল, তুর্কিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার সময় হেলির ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইস্তাম্বুল অধিবাসীগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—"Lord! save us from the Devil, the Turk, and the Comet"। অমর নিউ-টনের বন্ধু ও সমসাময়িক এডমণ্ড হেলিই মানবের মন হইতে ধূমকেতু জনিত ভয় মিশ্রিত কুসংস্কার বিদূরিত করেন। হেলি, নিউটনের অনু-রোধে ধূমকেতু সমূহের গতি সম্বন্ধে, ও কি নিয়মে এই সমস্ত অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি জ্যোতিস্ক পদার্থ পরিচালিত হয়, তৎবিষয়ে বহুবিধ পরীক্ষা ও আলোচনা করেন। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে যে ধূমকেতু উদিত হয়, তাহাই হেলির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি অসাধা-রণ বুদ্ধি বলে অতি সহজেই স্থির করিয়া ফেলেন, যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতি ৭৬ বৎসর অন্তর এইরূপ ধূমকেতু উদিত হইয়া আসিতেছে, এবং পরিশেষে সপ্রমাণ করেন যে ১৭৫৮ খৃঃ অঃ পুনরায় ইহা পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে। সেই হইতেই এই ধূমকেতুর নামের সহিত ইহার আবিষ্কর্ত্তার নাম চির সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি ইহার পুনরা-বির্ভাবের কথা ঘোষণা করিয়াই বলিয়াছিলেন:—"Wherefore if it should return to our prediction about the year 1758, impartial posterity will not refuse to acknowledge that this was first discovered by an English man" স্বজাতীর নাম গৌরবান্বিত করিবার জন্য ইংরাজি জাতির স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষা অব-লোকন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার পূর্ব্বে ধূমকেতু যে পুনরা-

বর্ত্তিত হয় তাহা লোকের জানা ছিল না। ইহার পরে সাক্‌সনির একজন জ্যোতির্ব্বিদ কর্ত্তৃক এই ধূমকেতু প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ৪।৫ মাস পরে ইহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইলে দেখা গেল যে ইহার পুচ্ছ মধ্য আকাশ হইতে দিগন্ত বৃত্তের অর্দ্ধ পথ ব্যাপিয়া দীর্ঘ ছিল। সেই হইতেই মানব ধূমকেতুর নামের সহিত যে একটা ভীতি প্রদ প্রহেলিকা গ্রথিত করিয়াছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে। এই ধূমকেতুর পুনরার্ত্তনের সহিত দুই একটি বিশেষ জটীল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম,—এই সমস্ত ধূমকেতুর গঠনের উপাদান কি কি? অধিকাংশ পণ্ডিতেই মনে করেন, উহারা অসংখ্য, কোটী, কোটি উত্তাপলোহিত উল্কাসমষ্টি। ইহা কিন্তু বাস্তবিকই ইহার প্রকৃত আকৃতির পরিচয় প্রদান করে না। বরং এই ব্যাখ্যা ইহার পুচ্ছের পক্ষে কতকটা সম্ভব বটে। আর একটি প্রশ্ন এই—ধূমকেতু গুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা হীনতর জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইতেছে কিনা? পণ্ডিত গণ বলেন, ধূমকেতুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিঃরও হ্রাস হইতেছে। বিগত ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই ধূমকেতুর আবির্ভাবের সময়, সার জন হারসেল ইহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, এইবারে তাহার সহিত ইহার ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করিলেই এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা হইতে পারে। অনেকে মনে করেন, যে নেপচুনের বহির্ভাগে আমাদের সৌর জগৎ সম্বন্ধীয় আরও অনেক গ্রহ রহিয়াছে। এমনকি মেয়র দ্বীপ মানমন্দিরের ডাক্তার সি এই সমস্ত গ্রহগণের নাম ও স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি নেপচুনের বহির্ভাগে গ্রহ থাকে তাহা হইলে এই সমস্ত ধূমকেতুর কক্ষ বিবর্ত্তন দ্বারাই তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ বৃহস্পতি এই হেলির ধূমকেতুর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। কোন গ্রহ এইরূপে নিকটবর্ত্তী হইলে নিজ আকর্ষণ দ্বারা সেই গ্রহ, ধূমকেতুকে নিজ কক্ষ মধ্যে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। এই আকর্ষণ হেতু ধূমকেতুর কেন্দ্রবিমুখ বা কেন্দ্রবিসর্পী (centrifugul force) শক্তির হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। কাজেই এইরূপে আকৃষ্ট ধূমকেতু সূর্য্যের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অল্পতর সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়। যে সমস্ত ধূমকেতু সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের প্রত্যেককেই গ্রহ সমূহ

দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। সূর্য্যের অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই ইহার গতির তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতেছি, জুন মাসের প্রথমে ইহার গতি প্রতিদিন ১০,০০,০০০ মাইল ছিল, ১৯১০ সালের জুন মাসে ইহা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইবে, অর্থাৎ তখন পৃথিবী ও এই ধূমকেতুর ব্যবধান মাত্র ২,০০,০০,০০০ মাইল হইবে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই দূরতা এক হাতেরও অধিক মনে করেন না। আগামী জুন মাসের পর ইহার জ্যোতিঃ ক্রমশঃই ক্ষীন হইতে থাকিবে, এবং ১৯১১ সালের প্রথমেই ইহা লোক-লোচনের বহির্ভাগে চলিয়া যাইবে। ইহা পুনরায় ১৯৮৫ খৃঃ অব্দে দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা আজ এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তখন মানবের কোন এক অজ্ঞাত দেশে বাস করিবেন। ধূমকেতুর আলোচনা তখন তাঁহাদের বিশেষ যত্নের জিনিষ নাও হইতে পারে। যে সমস্ত মান মন্দিরে বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই এই বহুদূর প্রত্যাগত যাত্রীকে অগ্রে নিরীক্ষণ করি-বার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে; কেননা এক্ষেত্রে প্রথম দর্শকেরই সম্মান অধিক। আগষ্ট মাসে বা সেপ্‌টেম্বর মাসেই ইহাকে প্রথমে দেখা গিয়াছে তখন ইহা বড়ই ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিশিষ্ট ছিল; এবং মৃগশিরা বা ওরায়ন (orion) নক্ষত্র হইতে অধিকদূরে অবস্থিত ছিল না। তখন ইহাকে মাত্র আলোকচিত্রণযন্ত্র সাহায্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। কেননা ঐ যন্ত্রে অনেক কষ্টদৃশ্য বস্তুর চিত্রও অঙ্কিত হয়। জুলাই মাসে ইহা উষা নক্ষত্র সমূহের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিল বলিয়া উত্তর গোলার্দ্ধের দর্শক গণের পক্ষে তত সুবিধাজনক হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধের পক্ষে ইহার স্থান সুবিধা জনক হওয়ায় তৎস্থানীয় দর্শকগণ প্রথমেই বিশিষ্টরূপে ইহাকে দেখিতে পাইয়াছে। যতদিন না রজনীর অংশ বৃদ্ধি পায় ততদিন উত্তরাংশের লোকের পক্ষে এই ধূমকেতু দর্শন বড়ই কষ্টকর। ১৯০৯ সালের সেপ্‌টেম্বর হইতে ১৯১০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকের পক্ষেই ইহাকে দেখিবার বিশেষ অসুবিধা হইবে না। কেননা তখন ইহা মধ্য রজনীতে প্রদীপ্ত হইবে। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে ইহা গোধুলির আকাশে এবং এই মাসেরই

শেষ ভাগে দিবা দ্বিপ্রহরের আকাশে এবং মে মাসের কিছু দিনের জন্য উষা আকাশে অবস্থিতি করিবে; এবং জুন মাসে সূর্য্যকে পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণ গোলার্দ্ধে উজ্জ্বল সান্ধ্য নক্ষত্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে। এই অক্টোবর মাসেই পুনরায় সূর্য্যের পশ্চাতে গমন করতঃ আবার উষা নক্ষত্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে। এই সময়ে ইহার জ্যোতিঃ অতি ত্বরিত গতিতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। এই ধূমকেতু অতীত কালে কখন কখন উদিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা অতুল আনন্দপ্রদ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুধীগণ এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনার ফলে পৃথিবী হইতে অতীত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধূমকেতু যতবার দৃষ্ট হইয়াছে ততবারেরই ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেওর পর্দ্দায় একটি ধূমকেতুর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে, এই ধূমকেতু ১০৬৬ খ্রীঃ অঃ উদিত হইয়াছিল। ইহা অবলোকন করিয়াই উইলিয়াম দি কঙ্কারার ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। প্রফেসর হিল্ড প্রমাণ করিয়াছেন ইহাই বাস্তবিক আধুনিক হেলির ধূমকেতু। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ এবং এসিয়ার পুরাণে বা পুরাতন গ্রন্থে "দুর্ঘটনা সূচক নক্ষত্রের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কতকগুলি এই হেলির ধূমকেতু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের পৌনঃপুনিকত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ধূমকেতুর পুনরাবর্ত্তকত্ব লক্ষ্য করেন নাই। প্রাচীন কালে, সেই জ্ঞান উন্মেষের প্রথম সময়ে, মানবের সর্ব্ব বিষয় অনুসন্ধিৎসা স্বতঃই প্রবল ছিল। ইহারই ফলে তাঁহারা বহু পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের কারণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এমনকি কোন ঘটনার সত্য কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, গ্রন্থাদিতে ঘটনাটির উল্লেখ করতঃ আপাতঃ সন্তুষ্টির জন্য যেরূপ হউক একটা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অথচ একই ধূমকেতুর পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব সম্বন্ধে যে তাঁহারা কোনরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। পুরাকালে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেরই

অন্যবস্তুর আকর্ষণ করিতেছে, সেই জন্যই এই সমস্ত ধূমকেতুর গতি কখনও বৃদ্ধি কখনও বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত আকর্ষণের জন্য ধূমকেতুর কক্ষ পথ কখনও জ্যামিতিক ছবির ন্যায় হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই কুটিল বা আঁকা বাঁকা। এই নিমিত্তই হেলির ধূমকেতু কখনও ৭৫ বৎসর পরে কখনও বা ৭৭ বৎসর পরে সূর্য্যের নিকটস্থ হয়। কাজেই যদি নেপচুনের বহির্ভাগেও গ্রহ সম্ভব হয়, তাহা হইলে যখন এই ধূমকেতু আপহেলিঅনে উপস্থিত হইবে, তখন সেই সমস্ত গ্রহ গণের আকর্ষণ জন্য ইহার গতিরও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ অনায়াসে সেই সমস্ত গ্রহ গণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন। শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে সকল লোক প্রতিমূর্ত্তি তোলাইতে আসে, তাহাদের মুখের গড়ন দেখিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয় যে তাহাদিগকে কি প্রকারে বসাইলে ভাল হয়। সাধারণতঃ মুখ তিন ভাগ ক্যামেরার দিকে ফেরান থাকিলেই ভাল ছবি হয়। কাহারও কাহারও মুখের একদিকের ছবি তুলিলেই ভাল হয়; কাহারও বা আবার সম্মুখ হইতে কিম্বা একটু পাশ হইতেই ছবি তুলিলেই ভাল হয়। ক্যামেরা সর্ব্বদা মুখের সহিত এক সমতলে থাকা ভাল, যদি ক্যামেরা উঁচুতে থাকে ও প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য লেন্সের মুখ নিচু করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে কপাল বড় বোধ হয় ও নাক, মুখ এবং চিবুক সরু হইয়া যায়। যদি লেন্সের মুখ উপর দিকে থাকে তাহা হইলে চিবুক মুখ ও নাকের ফুটা চওড়া দেখাইবে এবং কপাল ও নাক ছোট ও সরু দেখাইবে।

শিক্ষার্থীর মাটির বা মার্ব্বেলের মূর্ত্তির উপর এই সকল পরীক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত। ইহা দ্বারা দোষগুণ বুঝিতে পারিবেন ও কোন্ অবস্থার ছবি লইলে কতটুকু আলো পড়িবে ও ভাল ছবি হইবে তাহা বুঝিতে পারিবেন

অনেকেই জানেন না যে মানুষের মুখের দুই দিক একই রকম নহে। এবং যদি তাহা থাকে তাহা খুব কম লোকেরই আছে। সে জন্য মুখের কোন দিক হইতে ছবি তুলিলে ভাল দেখায় তাহা শিক্ষার্থীকে ঠিক করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত মুখের কোন দিকে যদি কাটা দাগ, আচিল বা অন্য কোন রকম দাগ থাকে তাহা হইলে যাহাতে সেই টুকু বাদ দিয়া ছবি তোলা যায় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য মুখ ফিরাইয়া যে প্রকারে বসিলে সেগুলি দেখা না যায় সেই প্রকারে বসাইয়া ছবি তুলিতে হইবে। যে সকল লোকের নাক খুব বেশী উঁচু বা উপরের ঠোট খুব লম্বা তাহাদের ছবি তুলিবার সময় যদি ক্যামেরা একটু উঁচু করিয়া, উপর হইতে ক্যামেরার মুখ নিচু করতঃ ছবি তোলা যায়, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে ছবি তোলা অপেক্ষা আরও সুন্দর ছবি উঠিবে। অবশ্য সাধারণতঃ ছবি তুলিতে হইলে উপবেশকের চক্ষুর সহিত ক্যামেরা এক সমতলে রাখিয়া ছবি তোলাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার্থীর উত্তোলিত প্রতিমূর্ত্তিতে সাধারণতঃ একটা এই ভুল হয় যে উপবেশকের মুখ যে দিকে ফেরান থাকে, চক্ষু সেদিকে না থাকিয়া প্রায়ই অন্য দিকে ফেরান থাকে। ইহাতে ছবি দেখিতে বিশ্রী হয়। যাহাতে এই প্রকার না হয় তাহা করিতে হইলে একটা আয়না লইয়া উপবেশকের সম্মুখে ধরিতে হয়, ইহাতে উপবেশক নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। অবশ্য আয়নাখানা যেন ফটোতে না উঠে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার দ্বারা মাথা যে দিকে ফিরান থাকিবে চক্ষু সে দিকে ফিবান থাকিবে ও এতদ্বতিত উপবেশক সচরাচর যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় থাকিবেন।

তৈয়ারী ব্যাকগ্রাউণ্ড না হইলেও সাধারণ গৃহের সকল স্থানেই ছবি তোলা যাইতে পারে। যেমন, কোন ভদ্র লোক ডেস্কে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন বা কেহ জানালার ধারে পাঠে নিবিষ্ট রহিয়াছেন; তবে এই সময় ছোট ডায়ফ্রাম ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হইলে যে ছবি উঠিবে তাহা খুব স্পষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে একটা বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে,—ইহা চিত্র রচনা বা চিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবার জন্য নানা জিনিষের

সমাবেশ। সে জন্য উপরোল্লিখিত চিত্রে যদি গৃহের মধ্যে আয়না বা অন্যান্য উজ্জ্বল বর্ণের, কাচের বা চিনা মাটির জিনিস থাকে তাহা হইলে ছবি দেখিলে প্রথমেই এই উজ্জ্বল দ্রব্য গুলির উপর দৃষ্টি পড়ে এবং সেজন্য যাহা প্রধান অর্থাৎ যে ব্যক্তির ছবি তোলা হইয়াছে তাহার প্রতি চক্ষু আকৃষ্ট হয় না।

কোন কোন লোক যখন তিনি কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তখন কার ছবি তুলাইতে চান। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই অবস্থাতেই তোলা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে যেন বে-মানান ও সৌন্দর্য্যাভাব না হয়।

যদি কখন সর্টফোকাস লেন্স (short focus lens) অর্থাৎ যে লেন্স ব্যবহার করিলে ক্যামেরার বেলো বেশী বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না, সেই লেন্স ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে যে সমস্ত জিনিষ ক্যামেরার দিকে বেশী আগাইয়া থাকে সে গুলি অসম্ভব বড় দেখায়। অর্থাৎ হস্ত পদাদি যদি শরীর হইতে বেশী অগ্রে থাকে তাহা হইলে সে গুলি শরীরের সহিত তুলনায় অসম্ভব বড় দেখায়।

গ্রীণ হাউস্ (greenhouse)—যদি কোন শিক্ষার্থীর বা চারা ও কোমল গাছ রক্ষার গৃহ থাকে তাহা হইলে এই স্থানে মনোমত ষ্টুডিও করা যায় ও সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি তোলা যাইতে পারে। এই ঘরে দরজা জানালা বা পর্দ্দা আঁকা ব্যাকগ্রাউণ্ড না দেওয়াই ভাল বরং সাধারণ এক রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড সুদৃশ্য হয়। গ্রিণ হাউসে একটি সুবিধা হয় যে এখানে আলোক খুব উজ্জ্বল না হইয়া বেশ কোমল হয় অথচ আলোর তেজ কমিয়া যায় না বলিয়া দ্রুত একস্‌পোসার দেওয়া যায়। কিন্তু একটি দোষ এই যে উপর হইতে খুব বেশী আলো আসে তজ্জন্য চোখ, নাক ও চিবুকের নীচে সুস্পষ্ট ছায়া পড়ে সে জন্য ছবি বড় বিশ্রী দেখায়। গৃহের বাহিরে ছবি তুলিলেও এ দোষ প্রায়ই হয়। এই দোষ স্খলন করিতে হইলে আলোর তেজ কমাইবার জন্য মস্তকের উপর সাদা কাপড়ের একটি পর্দ্দার প্রয়োজন।

একটা দশ ফুট লম্বা ও বেশ মোটা বেত ক্রয় করিয়া গোল চাকার মত করিতে হইবে এবং কিছু নয়নসুখ কাপড় কিনিয়া এই চাকাটির উপর

এক ফেরতা করিয়া মুড়িয়া সেলাই করিতে হইবে, ভিতরটা যেন বেশ টান হইয়া থাকে। এই চাকার একপার্শ্বে একটা হাত দুই লম্বা বাঁশ বা কাঠ পেরেক দিয়া আটকাইতে হইবে। এখন এই হাতলটি ধরিয়া পর্দ্দাটি উপবেশকের মাথার উপর ধরিয়া বা কোন প্রকারে অন্য কোন জিনিষের সহিত বাঁধিয়া যাহাতে মাথার উপরে ইহা থাকে তাহা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য উপরের আলোর তেজ কমিয়া যাইবে এবং কথিত সকল স্থানের ছায়া কমিয়া যাইবে। উপবেশক যে স্থানে বসিয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকে সাদা কাগজ মাটিতে পাতিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে নীচ হইতে আলো প্রতিফলিত হইয়া যে সকল স্থানে ছায়া পড়িয়াছিল তাহাতে লাগিয়া তাহার গভীরতা কমাইয়া দিবে।

যদি এই শির পর্দ্দার ব্যবহার করা হয় ও ইহার প্রতি মনোযোগ করা হয় তাহা হইলে গৃহের বাহিরের ছবি তোলা বেশী শক্ত হইবে না। অবশ্য স্থান বিশেষে বা আলোর কম বেশী তেজ বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে যে কয় ফেরতা কাপড় দিলে আলোর তেজ সুবিধা মত হইবে।

অবশ্য বাহিরে ছবি তুলিতে হইলে উপবেশকের ঠিক পিছনে গাছ বা অন্য কিছু না থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহা না হইলে অনেক সময় ছবি তোলা হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যেন মাথা হইতে গাছ বাহির হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে সূর্য্যালোক যেন কখন ব্যবহৃত না হয়, অধিক সূর্য্যালোক যেন কখন উপবেশকের মুখে না পড়ে, কারণ তাহা হইলে ভ্রুকুঞ্চিত হইয়া যায় চক্ষু ছোট হইয়া যায়। যদি কখন গাছ তলায় ছবি তোলা যায় তাহা হইলে পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া শরীরের নানাস্থানে পড়ে ও তজ্জন্য সাদা সাদা গোল গোল দাগ হইয়া যায় তজ্জন্য দেখিতে বড় ভাল দেখায় না।

ছবির মধ্যে উপবেশকের স্বাভাবিক চেহারা যতটা আনা যায় ততই ভাল। অস্বাভাবিক উপবেশন বা এরূপভাবে বসান যাহাতে উপবেশকের কষ্ট হয়, এ সকল পরিবর্জ্জন করাই প্রয়োজন কারণ তাহা হইলে মুখের ভাল ভাব থাকে না। উপবেশককে মনোমতরূপে বসাইতে কৌশল ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। কখন একস্‌পোসার দেওয়া হইল বা

হইবে, তাহা উপবেশককে না জানিতে দেওয়াই ভাল, কারণ উপবেশক, কখন একস্‌পোশ করিবে, এজন্য উদ্বিগ্ন থাকে ও সেজন্য মুখের ভাব অন্য রকম হয়।

গৃহের ভিতর ছবি তোলার প্রধান অসুবিধা এই যে বেশীক্ষণ একস্‌-পোস করিতে হয় ও আলোর কর্কশ বৈসাদৃশ্য পরিহার করা কষ্টকর হয়। গৃহের ভিতর ছবি তুলিতে হইলে একজনের বেশী লোকের তোলা উচিত নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

গৃহের ভিতর অপেক্ষা গৃহের বাহিরে ছবি তোলাই সুবিধাজনক। বাহিরে খুব কম একস্‌পোসার দিতে হয় কিন্তু মনোমতরূপে আলোর ব্যবস্থা হয় না ইহাই অসুবিধা। সূর্য্যালোক হইতে দূরে, বসিবার স্থান করিতে হয় ও আলোক সম্মুখ হইতে না পড়িয়া, যাহাতে মুখের একপার্শ্বে বেশী আলো পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। যদি ব্যাকগ্রাউণ্ড না পাওয়া যায় তাহা হইলে দেওয়ালের সম্মুখে বা গাছের বেড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিলে বেশ হয়। অবশ্য এই ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব ছায়ার মধ্যে থাকা দরকার, তাহা না হইলে প্রতিমূর্ত্তি ও ব্যাকগ্রাউণ্ড একইরূপ আলোকে আলোকিত হওয়ার দরুণ, ব্যাকগ্রাউণ্ড ছবির অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, সেজন্য বিশ্রী দেখায়। মাথার ঠিক পিছনে যেন এমন কোন জিনিষ না থাকে যাহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

যদি group বা ঐকোধিক লোকের ছবি তুলিতে ইচ্ছা থাকে তবে ইহা তোলার জন্য কিছুদিন অভ্যাস করিতে হয়। তজ্জন্য সর্ব্ব-প্রথমে বড় ছবির group দেখিতে হয় ও ইহা দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারা যায় কি প্রকারে লোকগুলিকে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া ছবির জন্য সাজাইতে হয়। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একজন লোকের ছবিতে আলোকের বন্দোবস্ত করিতেই অনেক কষ্ট পাইতে হয়; সে জন্য অনেকগুলি লোকের ছবিতে আলোকের প্রতি ভাল দৃষ্টি বা প্রত্যে-ককে ভাল করিয়া বসান, যাহাতে প্রত্যেকের মুখে ভাল ও মনোমতরূপ আলো পড়ে, তাহা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর এমন কি অসম্ভব ও হয়। যদি গ্রূপ তোলাই প্রয়োজন হয় তাহা হইলে গৃহের বাহিরে

তোলাই উচিত। সমস্ত লোকের ছবি যাহাতে ফোকাসে আসে সে জন্য ছোট ডায়াফ্রাম ব্যবহার করা উচিত। এই জন্যই সাধারণতঃ গ্রুপে বেশী একস্‌পোসার দিতে হয়; ও গৃহের ভিতর ছবি তুলিলে যাহারা জানালার দিকে থাকে তাহাদের মুখেই আলো লাগে ও যাহারা জানালা হইতে দূরে থাকে তাহারা একেবারে অন্ধকারে পড়ে।

গ্রুপ তুলিতে হইলে সকলেই যাহাতে এক দিকে চাহিয়া না থাকে বা একই রকম করিয়া না বসে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহাকেও সম্মুখে মাটিতে বসাইয়া কাহাকেও পশ্চাতে দাঁড় করাইয়া কাহাকেও হেলাইয়া বসাইয়া দিয়া যাহাতে দেখিতে ভাল হয় ও আলো মুখের উপর ভাল করিয়া পড়ে তাহা দেখা উচিত। যাহাতে সকলেই ক্যামেরার দিকে চাহিয়া না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ লোককে সকল এমন করিয়া বসান যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা কথা বলিতেছেন, এ ব্যবস্থাও মন্দ নয়। যাহাতে সকল লোকের মাথা এক লাইনে না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও পিরামিডের আকারে সাজাইতে হইবে কিন্তু ঠিক সমকোণ না হইয়া একটু বেঁকা বা অন্য কোন ভাবে হইলে আরও ভাল হয়। গ্রুপের যত ভাল ছবি দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রায় সকল গুলিই পিরামিড আকারের। অবশ্য পিরামিড আকারে সাজাইতে গেলে যাহাতে এদিকে বেশী লোক অপর দিকে কম লোক না হয় তাহা দেখা উচিত।

যখন খুব বেশী লোক থাকিবে, তখন অধিক সংখ্যক পিরামিড প্রস্তুত করিতে হইবে, অবশ্য প্রত্যেকটি ঠিক এক রকম করিলে ভাল দেখাইবেনা। গ্রুপের দুই পার্শ্ব একই রকম যেন না হয়। সকলেই এক রকম করিয়া যেন না বসেন ও যাহাতে সকলের মাথা এক লাইনে না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ অনেক লোকের গ্রুপে সম্মুখ হইতে আলো মুখের উপর পড়িলেই ভাল। অবশ্য একটু পাশ হইতে পড়িলেও ভাল হয় কারণ তাহা হইলে আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণ থাকিবে ও সেজন্য মুখ flat দেখাইবে

না। ক্যামেরার মুখ গ্রুপের মধ্যভাগে ফিরান থাকিবে, এবং ক্যামেরাটি গ্রুপের সাম্‌নে মধ্যস্থলে থাকিবে।

যাহাতে ওভার একস্‌পোসার না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যদি ফিকা রংয়েরও সাদা কাপড় পরা অনেক লোক থাকে তাহা হইলে যাহাতে তাহারা সকলে এক যায়গায় না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে অন্যান্য রংয়ের কাপড় পরা লোকের মধ্যে মিশাইয়া দিতে হইবে। নিল রং খুব ঘোর না হইলে প্রায় সাদা দেখায়। এই প্রকার করার কারণ এই যে যদি সাদা রঙের কাপড় পরা সকলে একস্থানে মিলিত হন তাহা হইলে সেই ছবির স্থানটি ওভার এক্‌স্‌পোসড হইয়া যাইবে।

শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতেই আপাততঃ বেশ কাজ চলিবে, ইহা অপেক্ষা যাহা কিছু বেশী শিখিবার আছে তাহা পরে লিখিব। আগে ইহাই অভ্যাস করা উচিত। আগামী বারে দৃশ্য তুলিবার সম্বন্ধে লেখা যাইবে।

ইংরাজির বাংলা ব্যাখ্যা। ষ্টুডিও– ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য বিশেষ করিয়া ঘর প্রস্তুত করা হয়। এই ঘরের উপরদিকে কাচ দেওয়া আছে ও আলোকের তেজ কমাইবার ও বাড়াইবার নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে। ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফারগণ এই প্রকার ঘরেই ছবি তোলেন।

ব্যাকগ্রাউণ্ড—প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে যে পর্দ্দা দিতে হয়।

রিফ্লেক্টর—আলো প্রতিফলিত করিবার জন্য ইহার ব্যবহার করিতে হয়।

ফ্ল্যাট—আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণে নাক, চক্ষু কান প্রভৃতির দূরত্ব ও উঁচু নীচু না থাকে ও তজ্জন্য ছবির মুখ খানা এক সমতলে আছে ও মুখের সর্ব্বত্র সমান আলো আছে এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে সেই চিত্রকে ফ্ল্যাট বলে।

শ্রীসুকুমার মিত্র।

শিল্প ও বিবিধ।

উত্তর মেরু।—আজ কাল উত্তর মেরুর আবিষ্কার সম্বন্ধে সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই সমালোচনা চলিতেছে। ডাক্তার কুক ও ক্যাপ্‌টেন পেয়ারীর মধ্যে কোন জন বাস্তবিকই উত্তর মেরুর প্রকৃত আবিষ্কারক তাহার মীমাংসা লইয়া নানারূপ গোলযোগও চলিতেছে। আমরা আগামী বারে এই সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

জুয়ার ভাটার মানমন্দির—ভারত গভর্ণমেণ্টের সারভেয়র জেনারেল ক্যাপটেন লঙ্গের রিপোর্টে প্রকাশ যে গত বৎসরের আগষ্ট মাসে মৌলমিন সহরে উক্ত মানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। টাইডগেজ এবং অন্যান্য যন্ত্র শীঘ্রই আনীত ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। এবং ১৯১০এর ১লা জানুয়ারী হইতে এই মানমন্দিরে রীতিমত কার্য্য চলিবে। গভর্ণমেণ্ট মৌউল মিনে জুয়ার ভাটার মানমন্দির চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

রেলওয়ে বোর্ডের ডিপ্লোমা—ভারতের রেলওয়ে বোর্ড, পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে এডমিনিষ্ট্রেশন ১৯০৮ সালের ফ্রাঙ্কো ব্রিটিশ প্রদর্শনীতে নিজ নিজ কার্য্যবিভাগের আলোক চিত্র প্রেরণ করায় প্রদর্শনী হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এসিড।—বিগত জুন মাসে সহজ দাহ্য তরল পদার্থ ও বিপজ্জনক এসিড সমূহের ব্যবসা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আনিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আজপর্য্যন্ত ইহাদের আমদানী রপ্তানীতে কোন প্রকার বিপদ সংঘটনের উল্লেখ না থাকায় এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের আমদানী রপ্তানীর সময় যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাহা যথেষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, উক্ত প্রসঙ্গ প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ব্যোমযান।—মিঃ ওরভিল রাইট তাঁহার ব্যোমযানটি আর অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা করিয়া ফেলিবেন। তিনি ইহাকে এত লঘু ও ইহার পরিচালন প্রণালী এত সহজ করিয়াছেন যে ইহা দৈনিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

১ম বর্ষ।] কার্ত্তিক ১৩১৬, অক্টোবর ১৯০৯। [১০ম সংখ্যা।

বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড।

আজ কাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলে প্রায়ই তাহাতে বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষতঃ কলিকাতায় অট্টালিকা একটু বৃহৎ এবং উচ্চ হইলেই এরূপ দণ্ড সংলগ্ন করা একরূপ প্রথা দাঁড়াইয়াছে। এই প্রবন্ধে কি কি উপায়ে দণ্ড নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। এইরূপ দণ্ড প্রচলিত হইবার প্রথমাবস্থায় লোকে গোলাকার লৌহ দণ্ড উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ পরিচালক ভাবিয়া, লৌহ দণ্ডই ব্যবহার করিত। সাধারণতঃ এই লৌহ দণ্ডের ব্যাস অন্ততঃ এক ইঞ্চি হইলেই চলিতে পারে ভাবিয়া সাধারণ গ্যাস পাইপই তড়িৎ পরিচালক দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইত, ইহার প্রধান কারণ, লৌহের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং ইহা অনায়াসে পাওয়া যায়; অধিকন্তু ইহাও তড়িৎ পরিবাহক এবং একটু মোটা হইলে অন্য ধাতুর ন্যায় বজ্র পতন কালীন উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া যায় না। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ দণ্ডের জন্য লৌহের ব্যবহার কখনই বিজ্ঞান সম্মত নহে। সকল ধাতুই উত্তম তড়িৎ পরিচালক নহে। লৌহ তড়িৎ পরিবাহক হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া তড়িৎ পরিবাহিত হইবার সময় অন্য ধাতু অপেক্ষা ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটির জন্য (magnetic

permeability) কথঞ্চিৎ অধিকতর বাধা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য আজকাল তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। তড়িৎ লৌহ অপেক্ষা তাম্রে অল্প বাধা প্রাপ্ত হয়। অন্য উত্তম বিদ্যুৎ পরিচালক ধাতুও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাম্রের ব্যবহারে প্রায় সর্ব্বত্রই সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্র দণ্ড যত মোটা এবং চ্যাপ্টা হইবে, তড়িৎ ততই সহজে পরিচালিত হইবে; তাম্র সুমসৃণ না হইলে বজ্র পতিত হইয়া, দণ্ড দিয়া পরিবাহিত হইবার কালীন ইহার গাত্র হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া, কোন দাহ্য বস্তু নিকটে থাকিলে, তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়; এবং অনেক সময়ে তুমুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক খণ্ড এবং অবিভিন্ন ও অসংযুক্ত হইলেই ভাল হয়। খণ্ড খণ্ড অংশে দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের সহিত গলাইয়া এক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যখন এরূপ ভাবে গলান অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন অংশ দুইটি রীতিমত স্ক্রু এবং লোহার বা তামার কড়া গাঁথিয়া একটির ন্যায় করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাম্র দণ্ড যেন কিছুতেই অমসৃণ হইতে না পারে, তৎবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। সাধারণতঃ তাম্রের গাত্রে কাল রং মাখাইয়া দিলে তাম্র সুমসৃণ থাকে, এবং অন্য কোন কারণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পায় না। দণ্ডের উপরিভাগ সূচ্যগ্র হওয়া আবশ্যক। সূচ্যগ্র বলিলেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম করা উচিত নহে। বজ্রপতন কালীন অত্যন্ত উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই জন্য দণ্ডের উপরিভাগ সূক্ষ্ম ও পাতলা হয় বলিয়া, বজ্রের উত্তাপে গলিয়া যায়; বজ্র পতিত না হইলেও অনেক সময়ে আলোক, বায়ু ও জলের সংস্পর্শে সূক্ষ্ম অংশটুকু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। এই জন্য সূচ্যগ্র অংশে ব্যাপিয়া প্লাটিনাম্ ধাতু রীতিমত ঝালিয়া দেওয়া ভাল। এই প্লাটিনাম প্লাত এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ ঘন হইলেও চলে। এইরূপ প্লাটিনাম পাতের আচ্ছাদন ম্যাথামেটিকাল যন্ত্রাদি নির্ম্মাতাগণের নিকট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহাকে প্লাটিনামের কোন্ (platinum cone) বলে। সাধারণতঃ প্লাটিনামের কোন্, একটি পিত্তলের আধারে সংযুক্ত থাকে এবং এই পিত্তল,

তাম্র দণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না বরং কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়। এই প্লাটিনামের আচ্ছাদন এত পাতলা করা হয় যে, বজ্র পতন একটু তীব্র হইলে প্লাটিনাম গলিয়া যায়। দণ্ড যতই অল্প দীর্ঘ হইবে এবং মৃত্তিকা হইতে সরল রেখা ক্রমে উত্থিত হইবে, ততই তড়িৎ শীঘ্র পরিচালিত হইবে। যত দূর সম্ভব দণ্ড বক্র না করাই ভাল, কিম্বা তাহার গাত্র হইতে কোন অংশ উদ্গত হইতে দেওয়া একবারেই উচিত নহে। অট্টালিকার দেওয়ালের সহিত লৌহ নির্ম্মিত আঁকড়া দ্বারা দণ্ড সংলগ্ন করা উচিত। এই আঁকড়ার মধ্যে কাঁচের নল দিয়া গৃহ প্রাচীর হইতে দণ্ড ইনসুলেটেড (insulated) করিয়া রাখা হয়। ইহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। কেননা কাঁচ তড়িৎ পরিবাহক নহে বটে, কিন্তু জল তড়িৎ পরিবাহক ; এবং জল-সিক্ত-বাতাসে কাচ স্বভাবতঃ জল সিক্ত হইয়া তড়িৎ পরিবাহক হইয়া পড়ে। অধিকন্তু তীব্র বজ্র পতন কালীন এই কাচ নল চূর্ণ হইয়া যায়। এই দণ্ড জমীর সহিত সম্পূর্ণরূপে প্রোথিত করা আবশ্যক। যে সমস্ত গৃহে ওয়াটার পাইপ আছে, তথায় এই দণ্ড উক্ত পাইপের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন করিয়া দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপে সংলগ্ন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তড়িৎ বিজ্ঞান অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, যে সমস্ত ওয়াটার পাইপ গৃহ প্রাচীরে লম্বভাবে প্রোথিত আছে, সে গুলি, তড়িতের ইন্‌ডাকসন্ (induction) ধর্ম্মানুসারে, অতি শীঘ্র তীব্র বি-সম তড়িৎ সম্পন্ন (negatively electrified) হইয়া পড়ে। কেননা মেঘ সর্ব্বদা সম তড়িৎ যুক্ত (positively electrified)। এইরূপ হয় বলিয়া দণ্ড মাটীর সহিত সুপ্রোথিত না হইলে বজ্র, দণ্ড দিয়া পরিবাহিত হইবার কালীন, উক্ত পাইপ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে বাটীরও বিশেষ ক্ষতি হয়। এরূপ ভাবে বাটীর ক্ষতির সংবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই দণ্ড এই সমস্ত ওয়াটার পাইপের সহিত সংযুক্ত থাকিলে এরূপ ভয়ের কোন কারণ থাকে না। পাইপের সহিত সংলগ্ন করিতে হইলে দণ্ড এবং পাইপ তামার পাত দিয়া রীতিমত গলাইয়া এক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্যাস পাইপের সহিত দণ্ড সংযুক্ত করা একবারেই

উচিৎ নহে। কেননা গ্যাস সহজ দাহ্য। তড়িৎ স্ফুলিঙ্গে গ্যাস জ্বলিয়া যাইতে পারে, এবং এরূপ হইলে গৃহের ক্ষতি অনিবার্য্য। যে গৃহে ওয়াটার পাইপ নাই, তথায় দণ্ড গৃহপ্রাচীর নিকটস্থ জল পূর্ণ গভীর কূপে ডুবাইয়া দেওয়া ভাল। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গভীর গর্ত্ত কাটিয়া গর্ত্তের তল দেশে একখণ্ড লৌহ বা অন্য ধাতুর তক্তা মৃত্তিকা সংলগ্ন করতঃ, সেই তক্তার সহিত তাম্র দণ্ড সংলগ্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ স্থলে জমী খুব "স্যাঁতা" হওয়া ভাল। দণ্ড জমীতে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহ প্রাচীর হইতে প্রায় সম-কোণে আসিয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই দণ্ড জমীর ভিতরে অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেই ভাল হয়। এই গর্ত্ত কাঠ কয়লায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। গৃহ অল্পায়তন হইলে, একটি দণ্ড হইলেই চলিতে পারে। তবে ছাদ হইতে দণ্ড অনেকদূর উচ্চে উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্থান বজ্র পতন হইতে নিরাপদ করিতে হইবে, দণ্ড হইতে তত দূরের অর্দ্ধেক অংশ যতটুকু হইবে এই দণ্ড ছাদের উপরেও ততটুকু রাখিতে হইবে। আজকাল প্রত্যেক গৃহেই যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ সংশ্লিষ্ট আছে। কাজেই দুইটি দণ্ডের ব্যাবধান উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ব্যবধান অপেক্ষাও অল্পতর হওয়া প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক গৃহে যত বেশী দণ্ড সংলগ্ন হইবে, ততই গৃহও অধিক নিরাপদ হইবে। এই সমস্ত দণ্ড পরস্পর দৃঢ় সংলগ্ন এবং জমীতে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রোথিত হওয়া আব-শ্যক। গৃহের ছাদ ধাতব দণ্ডের সহিত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত।

দণ্ড সাধারণতঃ এই নিয়মেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তবে বাড়ী প্রকাণ্ড হইলে বা জটীল হইলে অভিজ্ঞের দ্বারা বা ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তবে দণ্ড সংলগ্ন করা উচিত।

প্রফেসর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বলেন যে "গৃহ সম্পূর্ণরূপে বজ্রপতন হইতে নিরাপদ করিতে হইলে উহাকে চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে তারের জাল দিয়া আচ্ছাদিত করাই বিজ্ঞান সম্মত।" অনেকগুলি ত্রিশিরা বা ফণী মনসার গাছ টবে করিয়া ছাদের উপরে সারি দিয়া রাখিলে বজ্র পতন নিবারিত হয়। ফ্রান্‌ক্লিনই (Franklin) সর্ব্ব প্রথমে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা

প্রমাণ করেন যে, মেঘ মণ্ডলস্থিত তড়িৎ বা বজ্র স্যূচ্যগ্র দণ্ড দ্বারা পরিবাহিত হইয়া নিরাপদে পৃথিবীতলে নীত হইতে পারে। তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ দণ্ড গৃহে সংলগ্ন হইলে, গৃহও বজ্রপতন হইতে নিরাপদ হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—May not the knowledge of this power of points be of use to mankind, in preserving houses, churches, ships &c, from the stroke of lightning by directing us to fix on the highest parts of those edifices upright rods of iron made sharp as a needle, and gilt to prevent rusting, and from the foot of those rods a wire down the outside of the building into the ground, or round one of the shrouds of a ship, and down her side still it reaches the water? Would not these pointed rods probably draw the electrical fire silently out of a cloud before it came nigh enough to strike, and thereby secure us from that most sudden and terrible mischief." এই দণ্ড নির্ম্মাণের সময় চারিটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয়:—(১) দণ্ড স্যূচ্যগ্র হইয়া ছাদের এতটা উর্দ্ধে উত্থিত থাকিবে, যেন ছাদের কোন অংশই দণ্ড অপেক্ষা উচ্চ না হয়। (২) দণ্ডের তলদেশ জলে কিম্বা জমীর ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবে। (৩) সমস্ত দণ্ড আগাগোড়া একটি হইবে, সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে, এবং কুত্রাপি বিভিন্ন থাকিবে না। এই দণ্ড যেন উত্তম তড়িৎ পরিচালক হয়। (৪) ছাদের শিকল বা অন্য কোন ধাতব অংশ দণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ঐ দুইটির কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য।

দৃশ্য তুলিতে হইলে প্রথমে কিসের ছবি তুলিতে হইবে তাহা স্থির করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কোন দৃশ্যের অবিকল ছবিটি তুলিয়াই সন্তুষ্ট; কেহ বা, ইহার সহিত যথা সম্ভব চিত্র কলার ভাব সংযোগ করিয়া ফটোর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, অপরে, চিত্রকলার ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করেন; এবং তজ্জন্য যে স্থানের ফটো তুলিলে কেবল চিত্রোপযোগী হয় তাহারই ফটো তোলেন এবং অন্যান্য স্থান বাদ দেন।

মনে করুন কোন যায়গায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি গাছ দেখিয়া বেশ ভাল মনে হইল তখন কি তাহার দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি ফাইণ্ডারের দিকে দেখিয়াই বোতাম টিপিয়া দি? না গাছগুলির দিকে চাহিয়া তাহার মধ্যে কোন জিনিষটা আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করে তাহাই বিবেচনা করি? পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্লেট প্রস্তুত কারক ব্যতিত আর কাহারও কোন লাভ হয় না। গাছ সাধারণতঃ চিত্তাকর্ষণ করে বলিয়াই কি ফটো তুলিতে হইবে? তাহা নহে, কিন্তু ফটোগুলি যেন চিত্তাকর্ষণ করে, যেন আমাদিগের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের প্রতি appeal করে। যদি কোন ছবি নিজের নিকট ভাল লাগে তাহা হইলে অপরের নিকটও ভাল লাগিবে। আমরা নিজেরা যাহা অনুভব না করি তাহা ছবিতে প্রকাশ করা অসম্ভব সেজন্য প্রথমে দেখা উচিত যে, যে দৃশ্যের ছবি তুলিবে সত্যই তাহা তোমার ভাল মনে হয়, তোমার সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে, যেন ইহা দেখিয়াই মনে হয় যে তোমার সম্মুখে খুব একটা সুন্দর জিনিষ রহিয়াছে।

শিক্ষার্থীর ইহার পূর্ব্বকথিত সমস্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিয়া লওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বেই ফটোর সহিত চিত্রকলার সম্বন্ধ বিষয়ে বলা হইয়াছে,

তবে এ বিষয়টি খুব শক্ত ও যাঁহারা উচ্চাঙ্গের ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে চান তাঁহাদিগের জন্য উচ্চাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি, দৃশ্য ও অন্যান্য জিনিষের ফটো তোলা সম্বন্ধে পরে বিবৃত হইবে। চিত্রের সহিত ফটোগ্রাফীর প্রধান তফাৎ এই যে চিত্রে নানা বর্ণ থাকে ফটোতে তাহা নহে। চিত্রে কেবল বর্ণের সাহায্যে যে কোন স্থানের গভীরতার তারতম্য করা যায় কিন্তু ফটোতে তাহা হয় না; সেজন্য কেবল আলো ও ছায়ার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অনেক সময়ে ক্যামেরার গ্রাউণ্ড গ্লাসে বর্ণ বৈচিত্র্যের জন্য কোন কোন দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখায় কিন্তু ফটো তোলার পর এক রঙ্গের হয় বলিয়া দেখিতে কোন কাজেরই হয় না। গৃহ, জন্তু, ফুল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জিনিষের ঠিক ছবিটি তোলা কেবল ফটোগ্রাফ দ্বারাই সম্ভব অবশ্য চিত্রের কথা বলিতেছিনা, তবে, এটা ঠিক যে নিখুঁত ফটোখানি তুলিবার সময় ইহা যতদূর সম্ভব সুন্দর করিয়া তোলাই উচিত। যদি কেবল চিত্রোপযোগী করিয়া ফটো তুলিবার ইচ্ছাই থাকে, সে অবস্থায় ফটোগ্রাফারের চিত্র রচনার মূল তথ্যগুলি জানা থাকা প্রয়োজন। চিত্রোপযোগী বস্তু সকলের সংগ্রহ, তাহার সমাবেশ ও আলো ও ছায়ার সুব্যবস্থা করা ভাল চিত্রে এই সকলই পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

চিত্রে যেমন মনের ভাব প্রকাশ করান যায় সেরূপ ফটোতে হয় না। আমাদিগের প্রথমে দেখা উচিত কোন গুলিতে প্রীতি ও ঐক্য সম্পন্ন 'লাইন' ও সুন্দর আলো ও ছায়ার সমাবেশ আছে এবং কোনগুলি কম প্রীতিকর। কেবল গাছ দ্বারাই আমাদিগের ছবি পূর্ণ হইবে না, তাহা করিলে বড় বিশ্রী বোধ হইবে। সে জন্য আমাদিগকে চতুর্দ্দিক একবার মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করিতে হইবে; তাহা গ্রাউণ্ড গ্লাসের বা ডিউ ফাইণ্ডারে দেখিয়া করিলেই সুবিধা হইবে। এইখানেই আমরা দেখিতে পাইব যে কতকগুলি লাইন এমন ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে সেগুলি সকলে মিলিয়া বেশ প্রীতিকর সমষ্টি হইয়াছে আবার কতকগুলি লাইন ইহার মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া এই সকলের সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষুকে বিক্ষিপ্ত করে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন অযোগ্য স্থানে খানিকটা যায়গা খুব বেশী আলোকে আলোকিত হয়, বিশেষতঃ যদি

তাহা ছবির এক পার্শ্বে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে পাবে কিন্তু যদি তাহা ঠিক স্থানে পড়ে তাহা হইলে ইহা দ্বারা চিত্র রচনার সাহায্য হইতে পারে। চিত্রকর তাহার চিত্রে 'লাইন' বা পুঞ্জীকৃত গাছ পালাদি (masses) বদল বা চিত্রের অন্য অংশে সরাইয়া লইয়া আঁকিয়া মনোমত করিয়া লইতে পারেন কিন্তু ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা নড়াইয়া অন্য স্থানে বসাইয়া নিজের মনোমত করিয়া লইতে হইবে কারণ তাহা ছাড়া আব অন্য উপায় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লাইন ও পুস্তক বস্তুর রাশিকে (mass) প্রীতিকররূপে সাজানকে চিত্র-বচনা (composition) বলে। আলো ও ছায়ার তারতম্য করিয়া সাজান বা সমন্বয়কে chiaroseuro বা আলো আঁধার বলে।

বর্ণের সুবিধা না থাকায় ফটোগ্রাফার আলো ও ছায়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। ইহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও কোন প্রকার স্বাভাবিক ছবি তোলা সম্ভব হয়। সম্মুখে যে সকল বস্তু থাকে তাহা ছবিতে উঠে বটে কিন্তু নয়নরঞ্জক হয় না, চিত্র হয় না; সেজন্য চিত্র রচনা ও আলো ও ছায়ার (chiaroscuro) প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্য প্রকারে বুঝাইয়া দিতেছি, প্রথমরূপ,—কেবল স্বভাবের চিত্র তোলা, আমরা চারিদিকে যাহা দেখি তাহার প্রতিরূপ; দ্বিতীয়রূপ,—যেমন একটা নক্সা, যাহা কেবল সাজাইবার জন্য সুন্দর দেখায় কিন্তু ছবির বিষয়টির প্রতি কোন দৃষ্টি রাখা হয় নাই।

ফটোতে চিত্র-সৌন্দর্য্য প্রদান কবিতে হইলে তাহাতে এই দ্রুটিই থাকা প্রয়োজন। একই সময়ে ইহা স্বাভাবিক ও সাজসজ্জায় পূর্ণ হইবে। তবে গ্রাউণ্ড গ্লাসের প্রতি দেখিবার সময় যেন কোন দৃশ্যকে কেবল স্বভাবের চিত্ররূপে নহে, কিন্তু সাজসজ্জার প্রতিও যেন দেখিতে মনে থাকে। যখন গ্রাউণ্ড গ্লাসে কোন দৃশ্যের প্রতিফলিত ছবি দেখিয়া তাহার দোষগুণ ঠিক করা হইল তখন আমরা দেখিতে পাই যে তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ যে দৃশ্যের ছবি তুলিতে হইবে তাহার বৃক্ষাবলি খুব বড়

হইতে পারে সে জন্ত গ্রাউণ্ড গ্লাসের অনেকটা যায়গা অধিকার করে। দুই প্রকারে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে, আমরা short-focus lens—অর্থাৎ যে লেন্স ব্যবহারে ক্যামেরার বেলো বেশী বাড়াইতে হয় না—তাহাই ব্যবহার করিতে পারি, ইহা দ্বারা গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতি-ফলিত সমস্ত বস্তুই ছোট হইয়া যাইবে, এবং long focus lens দ্বারা চারিদিকের যে সকল বস্তু গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাপেক্ষা বেশী জিনিষ প্রতিফলিত হইবে। যদি এই উপায় দ্বারা সন্তোষজনক ফল না হয় অথবা আমাদিগের নিকট অন্য কোন lens না থাকে তাহা হইলে আমরা যে দৃশ্যের ছবি তুলিতে ইচ্ছা করিয়া যে স্থানে ক্যামেরা স্থাপন করিয়াছি তাহা হইতে আরও পশ্চাতে ক্যামেরা সরাইয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ, যদি গাছের সমষ্টি (group) খুব ছোট ও সামান্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমরা হয় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি না হয় long focus lens ব্যবহার করিতে পারি—rectilinear বা symmetrical lens এর অৰ্দ্ধেকটা ব্যবহার করিলে ইহা হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটিতে একই রকম ফল হইবে না। মনে কর যেন গাছের পাশ্চাতে দূরে এক পাহাড়ের শ্রেণী আছে, ক্যামেরা সম্মুখে বা পশ্চাতে একশত গজ সরাইয়াও এই পাহাড়ের প্রতিফলিত ছবির আকারের কোন তারতম্য হইবে না কিন্তু ইহাতে গাছের আকারের অনেক তফাৎ হইবে। long-focus lens সমান ভাবে সকল জিনিষকেই বড় করিবে। এই দুই উপায়ে, যে সকল জিনিষ দ্বারা আমাদিগের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদিগের আকার সকলরূপেই আমরা ঠিক মনোমত করিয়া লইতে পারি।

ভাল চিত্র মাত্রেরই একটা মিল বা ঐক্য থাকে, তাহাতে একটা প্রধান বস্তু কিম্বা ভাব প্রকাশ করা উচিত। কেবল একটাই উদ্দেশ্য (motif) থাকা প্রয়োজন। ছবিটি তুলিতে হইলে, তাহার মধ্যে নানা বস্তুর সমাবেশ ও চিত্র গঠন দেখিয়াই ছবির 'উদ্দেশ্য' যেন পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। নানা বস্তুর এমন ভাবে সমাবেশ করিতে হইবে যেন

তাহাতে ছবির প্রধান উদ্দেশ্যই ফুটিয়া উঠে ; সে জন্য ছবি সুন্দর করিতে অবশ্য দেয় যে সকল বহুবিধত্বের প্রয়োজন তাহার সবই থাকা উচিত কিন্তু গৌণ ভাবে থাকিলে মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। গৌণ ভাবে বা অপ্রধান ভাবে থাকে বলিয়া প্রধান জিনিষ হইতে মনোযোগ এই সকল গুলির দিকে পড়েনা। অর্থাৎ একটা ছবিতেই যদি এমন দুইটা জিনিষ থাকে যাহাদিগকে সমান প্রধানত্ব দেওয়া হইয়াছে, সেই ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলে একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি না পড়িয়া দুইটির প্রতি পড়ে বলিয়া মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, সে জন্য ছবি তত সুন্দর হয় না। কথাটা বোধ হয় ভাল বোধগম্য হইল না, ধরা গেল যেন একটা ছবির একপাশে একটা বৃহৎগাছ আছে ও অন্য পাশে প্রায় একই মাপের একটা ঘর আছে, সেজন্য ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলে দুইটির প্রতিই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যদি বাড়ীটি খুব পশ্চাতে ও ছোট থাকে তাহা হইতে অবশ্য কিছু অল্প দেখাইবে। কিন্তু গাছটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, সেজন্য গাছটিই প্রধান জিনিষ। চিত্রের মত ফটো তুলিতে হইলে ফটো তুলিবার আগে আলো ও ছায়া, বস্তুর গঠন ও লাইন প্রভৃতির উপযুক্ত সমাবেশ করিয়া লইতে হইবে। এই সমাবেশ জন্য ছবির মধ্যে কোন বস্তু প্রধান কিম্বা গৌণ স্থান প্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে ছবির মধ্যে কোন বস্তু কোন বিশেষ স্থান অধিকার করার জন্য কতকটা প্রধানত্ব লাভ করে। চিত্রের মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ স্থান (weak position) অর্থাৎ চিত্রের মধ্যভাগে যদি প্রধান জিনিষটি থাকে তাহা হইলে ইহা এইস্থানে থাকিবার জন্য তেমন ভাল দেখিতে হইবে না। কিন্তু যদি একটু ডাহিনে কি বামে থাকে তাহা হইলে ছবিটি তেমন নিস্তেজ বোধ হইবে না। এই স্থানকে সতেজ স্থান (strong point) বলে। বোধ হয় একটু দুরূহ বোধ হইল, নীচের লাইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশী বুঝা যাইবে।

কেহ কেহ ইহাকে পাঁচভাগ করেন, আবার কেহ সাতভাগও করেন। ভাগের জন্য কিছু আসে যায়না ; প্রধান জিনিষটির স্থান ঠিক হইলেই

হইল। ধবা গেল যেন একটা ছবি লইয়া তাহাকে উপবেব মত লম্বা ও

পাশ ভাবে তিন ভাগ কবিয়া লওবা হইযাছে। ইহাব মধ্যে ক, চ, ট বা ত লাইনেব স্থানে যদি কোন বস্তু থাকে তাহাব উপব স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কিন্তু এই সকল গুলিব মধ্যে গ, জ, ড, দ এই গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ স্থান বা strong position, উপবেব, নীচেব ও দুইধাবেব চতুষ্কোণে যদি প্রধান জিনিষটি থাকে তাহা হইলে ইহাব অবস্থিতিব স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীব strong position হয়, মধ্যেব চতুষ্কোণটি weak point এবং মধ্যস্থলেব ন চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা weak point।

এই যে প্রধান স্থানেব কথা বলা গেল ইহাব স্থান যে কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বাখিতে হইবে, তাহাব মধ্যে যে কোন নড চড় হইতে পাবিবে না এরূপ নয, কিন্তু প্রধান জিনিষেব স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীব পক্ষে একটা জ্ঞান হইবাব জন্যই উক্ত রূপ লিখিত হইল। উপবে যে প্রকাবে দাগ কাটিয়া দেওয়া হইযাছে এই প্রকাবে ক্যামেবাব গ্রাউণ্ড গ্লাসে লাইন টানিয়া লইতে হইবে। ছবি তুলিবাব সময় দেখিতে হইবে যেন দিগন্তবৃত্ত বা horizon ছবিব মধ্যভাগে না পড়ে, তাহা যেন হয় ক লাইনে না হয় চ লাইনে পড়ে। যদি পাঁচ ভাগ কবা থাকে তাহা হইলে নিম্ন হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় লাইনের উপব horizon line পড়িবে। ক, চ, ট, ত এই কয়েক লাইনেব মধ্যে যে কোন লাইনেব উপব প্রধান বস্তুব চিত্রটি হওয়া উচিত ও সেই সঙ্গে সমান্তবাল লাইনেব উপবও পড়া উচিত। Horizon ও প্রধান

জিনিষ ঠিক কোন স্থানে বসিবে তাহা ছবিব একপার্শ্বেব সহিত অপব পার্শ্বের সামঞ্জস্যের উপব নির্ভব কবে, অর্থাৎ ছবিব একদিকে যদি বেশী বস্তু অর্থাৎ গাছপালাদি থাকে কিম্বা একদিকে যদি প্রধান জিনিষ থাকে অপব দিকে কোন অপ্রধান বস্তু থাকা প্রয়োজন ; তাহা হইলে ছবিব মধ্যে সমতা ঠিক থাকিবে। ইহাকে ইংবাজিতে balance of the picture অর্থাৎ ছবিব সামঞ্জস্য বা সমতা পবিবক্ষণ কবা বলে।

নিখুঁত দৃশ্যেব ছবি মাত্রেই সম্মুখ জমী বা পাদভূমি (fore ground) অল্পদূব (middle distance), দূর (distance) ও প্রধান বস্তু (principal object) থাকে। প্রধান বস্তু অল্প দূব (middle distance) বা তাহাব নিকটে বা সন্মুখজমীতে (fore ground) অবস্থিত। দূবেই ফটোগ্রাফী নিষ্ফল হয়, দূবেব জিনিষ যাহা চোখে বেশ সুন্দব দৃশ্য বলিয়া মনে হয়, ফটোতে ছোট ও অস্পষ্ট হইযা পড়ে। দৃশ্যেব খুব দূবেব জিনিষেব ছবিতে দূবত্ব বুঝাইবাব জন্য কতকটা অস্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন এবং যেরূপে এই দূবত্ব বুঝান যায় তাহাব উপব চিত্রেব সৌন্দর্য্য নির্ভব কবে। সাধারণতঃ চোখে যে দূবেব জিনিষ অস্পষ্ট বোধ হব তাহা ক্যামেবাতে আবও বেশী হয়, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহা ঠিক কবিযা লইতে হয়।

ছবিতে বৈচিত্র বা বহুবিধত্ব (variety) বক্ষা কবিবাব জন্য যাহাতে আলো ও ছায়া, কিম্বা চিত্র বচনায (composition of a picture) যাহাতে একইরূপ (symmetrical) না হয় তাহাব প্রতিদৃষ্টি বাখিতে হইবে ; এইজন্য এবং যাহাতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না হয় সেজন্য দুইটি প্রধান জিনিষ (prominent object) যাহাতে ছবিব দুইধাবে একই ভাবে না থাকে তাহা কবিতে হইবে। উদাহবণ স্বরূপ বলা যাইতে পাবে, যদি কোন প্রবল বস্তু (prominent object) দ স্থানে থাকে তাহা হইলে, গ স্থানে যেন ঐরূপ আব একটি prominent object না থাকে।

যদি কখন বাড়ীব ছবি তুলিতে হয় তবে তাহা যেন ছবিব ঠিক মাঝখানে না বসাইযা একটু পাশ ভাবে লওয়া হয়, এবং সম্মুখে ক্যামেরা না বসাইয়া একটু কোণ হইতে তুলিলেই ভাল হয় ; কাবণ ইহা দ্বাবা

বৈচিত্র ও বহুবিধত্ব পরিস্ফুট হয় বলিয়া ছবি আরও ভাল দেখায়। যদি কোন রাস্তার ছবি তুলিতে হয় তাহা হইলে তাহার ক্রমঃঅন্তর্হিত সীমা (vanishing point) ছবির ঠিক মাঝখানে না হইয়া একটু পাশের দিকে হইলেই ভাল হয়। ছবিতে সমচতুষ্কোণ বা সমত্রিকোণ প্রভৃতি যাহাতে না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

গৃহের বাহিরে ছবি তুলিতে গেলে ফটোগ্রাফারের অধীনে আলো ও ছায়া থাকে না, কিন্তু স্থান বিশেষ হইতে বা দিনের বেলা এমন কি মাস বিশেষে কোন দৃশ্যের ছবির আলো ও ছায়া ঠিক স্বাভাবিক মনোমত রূপে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন দৃশ্যের ছবি তুলিতে হইলে যদি নিকট হইতে সুবিধা না হয় তাহা হইলে ক্যামেরা পশ্চাতে সরাইয়া বা দক্ষিণে কিম্বা বামে সুবিধামত সরাইয়া মনোমত ছবি তুলিতে পারা যায়, এবং তাহাতেও যদি আলো ও ছায়ার সুবিধা না হয় তাহা হইলে সকালে বিকালে কিম্বা দ্বিপ্রহরে তুলিলে কোন সময়ে বোধ হয় মনোমত আলো পাওয়া যাইতে পারে। এমন কি শীত গ্রীষ্মকালে তুলিলে দৃশ্যের উপর আলো ও ছায়ার ব্যতিক্রম হয়। কারণ শীতকালে দক্ষিণায়ণ হওয়ার জন্য শীতকালে দৃশ্যের দক্ষিণ দিকে বেশী আলো হয়। যদি সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছবি তোলা হয় তাহা হইলে ছবি flat উঠিবে এবং ছায়া ইত্যাদি বড় একটা দেখা যাইবে না কিন্তু যদি সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া ছবি তোলা হয় তাহা হইলে কেবল ছায়াই বেশী দেখা যাইবে। ইহা ব্যতিত সূর্য্যের আলো যেন ঠিক একপাশ হইতে না আসে অর্থাৎ ক্যামেরার সহিত সমকোণ(right angle)করিয়া একপাশ হইতে আলো আসিয়া দৃশ্যের উপর না পড়ে। যদি ক্যামেরার পশ্চাতে দক্ষিণে কি বামে, কিম্বা ক্যামেরার সম্মুখে দক্ষিণে বা বামে সূর্য্য থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল হয়, অর্থাৎ সম্মুখ, পশ্চাৎ কিম্বা পাশ হইতে আলো না আসিয়া যদি কোণাকুণি ভাবে আলো আসিয়া দৃশ্যের উপর পড়ে তাহা হইলে ভাল ফল হয়।

সূর্য্য যদি একটু সম্মুখে রাখিয়া ছবি তোলা যায় তাহা হইলে ছায়াটি বেশ সুন্দর হইয়া উঠে, ছবিতে ছায়ার মূল্য খুব বেশী; কিন্তু এই ব্যবস্থা

করিতে গিয়া সূর্য্যালোক যেন লেন্সের উপর না পড়ে, তাহা হইলে
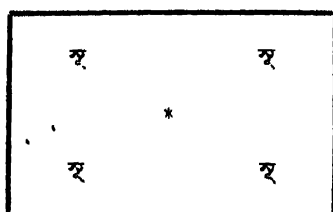
ছাতা কিম্বা হাত দিয়া ছায়া করিতে হইবে। যদি নিম্ন লিখিত ছবি অনুসারে ফটো তোলা যায় তাহা তাহা হইলে সুন্দর স্পষ্ট করিয়া উঠে। ইহা গৃহাদির ছবি তুলিলে বেশী বুঝা যায়।
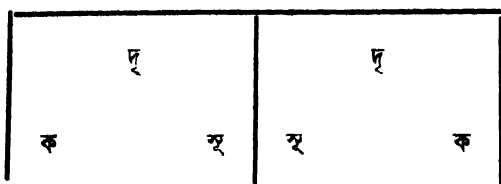
বহু বিধত্ব (varicty) রক্ষা করিতে গিয়া যেন ছবির অত্যাবশ্যক জিনিষ, balance বা সমতা নষ্ট না হইয়া যায়। ছবির এক দিক হইতে যদি লাইন থাকে তাহা হইলে উল্টা দিক হইতে লাইন দ্বারা ছবির balance রক্ষা করিতে হইবে। যদি ছবির কোন কোণ হইতে লাইন থাকে তাহা হইলে লম্বভাবে দণ্ডায়মান (vertical) লাইন দ্বারা কিম্বা সমান্তরাল (horizontal) লাইন দ্বারা ছবির balance রক্ষা করিতে হইবে ; যদি ছবির এক পার্শ্বে খুব ছায়া ও আলো থাকে তাহা হইলে অন্যান্য পাশেও আলো ও ছায়ার দ্বারা balance রক্ষা করিতে হইবে। সামঞ্জস্য (balance) না থাকিলে মনে হয় যেন ছবিটি অরক্ষিত ভাবে রহি-য়াছে, যেন ছবিটি পড়িয়া যাইবে। কোন কোন ছবিতে প্রধান বস্তুর অবস্থিতির স্থানের উপর balance নির্ভর করে। বাড়ীর ছবি তুলি-বার সময় তাহার সম্মুখটার উপর balance নির্ভর করে অর্থাৎ বাড়ীর কোণ হইতে ছবি তুলিবার সময় যতখানি সম্মুখ দিকটা তুলিতে পারা

যায় তাহাই ভাল, কারণ balance বাড়ীর সম্মুখ দিকেই ঠিক হয়, একথা যেন স্মরণ থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

উত্তর মেরু।

উত্তর মেরুর আবিষ্কার লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক জগৎ, বিশেষতঃ ভৌগলিক জগৎ একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। মেরু আবিষ্কৃত হউক বা না হউক সাধারণ মানব কেবল মাত্র একটা হুজুগের বা মস্ত মজার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই ব্যস্ত। অনেকে গৃহের কোণে বসিয়া মেরুর আবিষ্কার সম্বন্ধে কত অসম্বদ্ধ আলোচনা করিতেছে,- সেখানে মেরুর দুরন্ত শীত নাই, প্রতিপদে মৃত্যুর বিভীষিকা নাই; উপদেশ পাইবার জন্য সঙ্গীর অভাব নাই। কত লোক মেরু আবিষ্কার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সাধারণে ভাবে এরূপে অকারণে জীবন বিসর্জ্জন মুর্খতার নামান্তর মাত্র। কাজেই এই সমস্ত অমূল্য জীবনের জন্য একটা সহানুভূতির তপ্তশ্বাসও প্রবাহিত হয় না। লোকে ভাবে উত্তর মেরুর স্থান নিরূপনার্থ জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া একটা মার্জ্জার শিকারের জন্য মূর্খতা বশতঃ জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া উভয় প্রায় তুল্য। বরং বিড়ালের চলিবার ক্ষমতা আছে, সময়ে সময়ে মানবের ক্ষতি করিতে পারে, তাহাকে হত্যা করিতে যাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার কতকটা মূল্য আছে। তাঁহারা বিড়াল শিকার ও মেরু আবিষ্কার উভয় একটা প্রকাণ্ড উন্মাদের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। আর যখন বৈজ্ঞানিক জগৎ এই সমস্ত সাধারণবিবেচ্য অযোগ্য পদার্থের আবিষ্কারের জন্য যাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথার্থ বীরপুরুষ মনে করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তখন সাধারণ লোকে কেমন হইয়া যায়, ভাবে "এ আবার কি হইল!" যদি ডাক্তার কুক উত্তরমেরু আবিষ্কার করিয়া

থাকেন ; বেশ ভালই করিয়াছেন, নীরবে বিনা আড়ম্বরে সমস্ত সমাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পেয়ারী তাহার জন্য চীৎকার করিতেছে কেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, আজ না হইলেও ব্যোমযানের যেরূপ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বা মোটর গাড়ী যেরূপ ক্ষীপ্র তাহাতে একদিন না একদিন যে কোন লোক আকাশ দিয়াই হউক বা বরফ দিয়াই হউক উত্তর মেরু আবিষ্কার করিয়া ফেলিত, তাহারা এত চীৎকার করিয়া নিজ কৃতীত্ব দেখাইতে চাহিত না। কেননা, সহজ লভ্য দুইটি কুকুর লইয়া, বা অনায়াসলব্ধ সঙ্গী দুইজন সরল এস্কিমো লইয়া এবং নিজের দুই চরণের উপর নির্ভর করিয়া যে জিনিষ আবিষ্কার করা যায় তাহাতে আবার প্রশংসা করিবার কি আছে ? বোধ হয় ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম। কেননা সকলেই জানেন "What man has done, a man may do." কেহ কেহ ভাবেন, এস্কিমো-গণ, ল্যাপলাণ্ডারগণ বা উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণ হয়ত বহু পূর্ব্বে এই উত্তরমেরু প্রদেশে বহুবার পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছে ; তাহারা ইহাতে বিশেষ কিছু লাভবাণ নাই ; অনেকে মনে করেন, উত্তর মেরু গমন হয়ত তত কষ্ট সাধ্য নহে ; সহজসাধ্য হইলেও বাস্তবিক কোন স্থান-টুকু উত্তর মেরু তাহা আবিষ্কার করাই বড় কষ্টকর। সাধারণের নিকট উত্তর মেরুর আবিষ্কারের কোন মূল্য না থাকিতে পারে ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিকগণের কথা বাদ দিলেও, যাহারা সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে জানেন, তাঁহারা বলিবেন, উত্তর মেরুর আবিষ্কারেরও যথেষ্ট মূল্য আছে ; আমরা হয়ত যাহাকে উত্তরমেরু বলিয়া এতদিন ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তাহা ভ্রমাত্মক। অধিকন্তু জ্ঞানপিপাসার চরিতার্থতাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

যে জাতির মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবল, অথবা যে জাতি অনুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধান প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ নহে, সে জাতি অন্য জাতির বরেণ্য ; সে জাতির উন্নতি অনিবার্য্য। ইউরোপীয়গণ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়, নূতনতত্ত্বের আরও নূতনতর গুঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়ে ;

এবং যে পর্য্যন্ত এই নূতন বিষয় পরিস্ফুট ও সম্যকরূপে মীমাংসিত না হয় ততদিন কিছুতেই নিশ্চেষ্ট বা নিরস্ত হয় না, তাই আজ সমগ্র পৃথিবী খ্রীষ্টিয়গণের প্রাবল্যে ব্যতিব্যস্ত, তাই আজ তাহারা "যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।" এই উত্তর মেরুর আবিষ্কার খ্রীষ্টিয়গণ কর্ত্তৃক বা ইউরোপবংশীয়গণ কর্ত্তৃকই সম্ভব। আমেরিকা ইউরোপেরই জাতি, আমেরিকান ও ইউরোপীয়গণের ধমনীতে একই পিতৃপুরুষের রক্ত সঞ্চালিত, এই জাতিই আজ মানব জাতির শক্তি স্বরূপ। যাহা হউক এ সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আলোচ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ পৃথিবীর কোন স্থানটি বাস্তবিক উত্তর মেরু তাহাই বর্ণিত হইবে। গণিত তত্ত্ববিৎগণের মতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় মেরুই পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তাস্থ দুইটি সর্ব্ব শেষ বিন্দুমাত্র। এই স্থানেই আমরা প্রথম দ্রাঘিমা (meridian) বলিলে যাহা বুঝি, অথবা যে কল্পিত সরল রেখাকে আমরা প্রথম দ্রাঘিমা এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই নিরক্ষবৃত্তে (latitude) বা মেরুপ্রদেশে কোন মানব দণ্ডায়মান হইলে, মস্তকোর্দ্ধ-কল্পিত-নভোবিন্দু (zenith) ঠিক তাহার মস্তকোপরেই অবস্থিত থাকিবে। আমরা ধ্রুব নক্ষত্রের কথা জানি, অনেকে আকাশে ধ্রুব নক্ষত্র (Pole Star or Polaris) দেখিয়াও থাকিবেন ; উত্তর মেরু বিন্দু পৃথিবীর, এবং ধ্রুবনক্ষত্র নভোমণ্ডলের একই দেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই জন্যই আমরা এই নক্ষত্রকে ধ্রুব নক্ষত্র বা মেরুনক্ষত্র বলিয়া থাকি। এই স্থানে এই দুইটি বিন্দু এক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা উত্তর মেরুতে অসংখ্য বৃত্তের অঙ্কন কল্পনা করিতে পারি। বিষুব রেখা (Equator) পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীর মধ্যস্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে এই রেখা পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে দূরে অপসারিত হইলেই আমরা তাহাকে নিরক্ষ রেখা বলিয়া থাকি। এই নিরক্ষ রেখা উত্তর মেরুতে শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং শেষ নিরক্ষ রেখা ও দিগন্তবৃত্ত বা ক্ষিতিজ (horizon) উভয়েই সংসক্ত বা সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই উত্তর মেরুতে পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তর এই তিন দিকেরই

অবসান হইয়া কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকই অবশিষ্ট রহিয়াছে। এইরূপে দক্ষিণ মেরুতে কেবলমাত্র উত্তর দিকই বর্ত্তমান। একটি গোলাকার পদার্থের উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিলে, পূর্ব্ব পশ্চিম থাকা অসম্ভব, উত্তর দিক ত শেষ হইয়াই গিয়াছে। কাজেই দিক হিসাবে উত্তর মেরুতে মাত্র দক্ষিণ দিক বর্ত্তমান। যদি আবিষ্কারক উত্তর মেরু হইতে এক পদমাত্র সরিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহার মস্তকোর্দ্ধ কল্পিত নভোবিন্দু (Zenith) এবং উত্তর মেরু-বিন্দু পৃথক হইয়া পড়িবে; সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দ্রাঘিমাও তৎক্ষণাৎ নির্দ্ধারিত হইয়া পড়িবে। উত্তর মেরুতে ২১শে মার্চ্চ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস ধরিয়া সূর্য্য দিগন্তবৃত্তে উদিত থাকে। আমরা জানি এই দুই দিনই রাত্রি পরিমাণ ও দিন পরিমাণ সমান। ইংরাজিতে ২১শে মার্চ্চকে ভারনাল ইকুইনক্স (Vernal Equinox--বিষ্ণুপদ) এবং ২২শে সেপ্টেম্বরকে অটাম্ন্যাল ইকুইনক্স (Autumnal Equinox—হরিপদ) বলে। অর্থাৎ সূর্য্য যখন পৃথিবীর বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরায়ন আরম্ভ করে সেই সময় হইতে পুনরায় বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণায়ন আরম্ভ করিবার সময় পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশে সূর্য্যের আলোক থাকে। ২১শে মার্চ হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোক ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং পুনরায় অল্পতর হইয়া একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ২১শে জুন সূর্য্যের কর্কট ক্রান্তিতে (Summer Solstice) উপস্থিত হইবার দিন। ইহাই সূর্য্যের উত্তর দিক গমনের শেষ সীমা। আমাদের দেশে প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় অস্ত আছে, কিন্তু মেরুপ্রদেশে এরূপ উদয় অস্ত নাই। উত্তর মেরু ৬ মাস কাল ক্রমাগত সূর্য্যালোকিত থাকে। অবশ্য এই ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য কেবল এক স্থানে অবস্থিত থাকে না। পরন্তু দিগন্তবৃত্ত হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ২১শে জুন পর্য্যন্ত ২৩.৫ ডিগ্রি উঁচে গমন করে। পরে পুনরায় অবতরণ করিতে করিতে ২২শে সেপ্টেম্বর দিগন্তবৃত্তে অদৃশ্য হইয়া যায়। ২২শে সেপ্টেম্বর সূর্য্য একবার ৬ মাসের জন্য অস্তমিত হইলে তবে উত্তরমেরুতে নক্ষত্র সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর মেরুতে দণ্ডায়মান হইলে সেই স্থান হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত

যত নক্ষত্র আছে, তাহাই দেখিতে পাওযা যায়, বিসুব বেখাব দক্ষিণ-দিকের কোন নক্ষত্রই উত্তর মেরুব লোকেব দৃষ্টিগোচব হয় না। আমাদেব দেশে দিবা রাত্রি আছে বলিয়া আমবা চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রেব উদয় অস্ত দেখিয়া থাকি, কিন্তু মেরু প্রদেশে একপ দিবা রাত্রির অভাবে নক্ষত্র সমূহেরও উদয় অস্ত নাই। অথবা, যেখানে বৎসবেব ছয মাস ব্যাপিয়া দিবা বা আলোক এবং অপব ছয মাস কেবল-মাত্র বাত্রি বা আলোকেব অভাব, তথায এই বাত্রিব ছযমাস পবিদৃশ্যমান নক্ষত্রসমূহ দর্শকেব মস্তকোপবস্থিত আকাশে বৃত্ত পথে পবিভ্রমণ কবিয়া বেড়ায। এই নক্ষত্র সমূহই বিশেষতঃ ধ্রুবনক্ষত্রই বাস্তবিক মেরুব প্রকৃত পথ প্রদর্শক। ধ্রুব নক্ষত্র দর্শকেব মস্তকোপব থাকে বলিযা বায়ুমণ্ডলেব দ্বাবা বাধা প্রাপ্ত হইযা এই নক্ষত্র নিঃসৃত আলোক বশ্মিব দিক পবিবর্ত্তন হয় না। সূর্য্য লক্ষ্য কবিয়া মেরু নিরূপণ কবা সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টকব। কেননা মাত্র গ্রীষ্মকালেই সূর্য্য দিগন্তবৃত্ত হইতে কিয়ৎ পবিমাণ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। সেই সময়েই কেবলমাত্র সূর্য্য লইয়া উত্তব মেরুব পবীক্ষা চলিতে পাবে, অন্য সময়ে বায়ুমণ্ডলেব দ্বাবা বাধা প্রাপ্ত হইযা সূর্য্য রশ্মির দিক এই পবিবর্ত্তিত হয় যে সূর্য্য লক্ষ্য কবিয়া পবীক্ষা কবিলে, সে পবীক্ষা নিশ্চয়ই ভ্রম-সঙ্কুল হইয়া পড়ে। সূর্য্য লইয়া পবীক্ষা কবিতে হইলে গ্রীষ্ম ঋতুব মধ্যভাগে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। উত্তব মেরুতেও দিক নির্ণয় যন্ত্র (compass) আবশ্যক। সাধারণতঃ এই যন্ত্রেব নির্দ্দিষ্ট উত্তব দিক প্রকৃত উত্তব নহে, বস্তুতঃ প্রকৃত উত্তবেব কতিপয় ডিগ্রি দক্ষিণে উত্তব আমেবিকায় অবস্থিত। কাজেই ঠিক উত্তব মেরুতে উপস্থিত হইল, কম্পাসেব সাধাবণতঃ উত্তব-অভিমুখ-অংশ দক্ষিণ দিকে পবিবর্ত্তিত হইয়া পড়িবে। আবিষ্কাবক যতই উত্তব মেরুব নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন ততই তাঁহাকে নক্ষত্রাদিব পবিদর্শন ও পবীক্ষার মাত্রাও বাড়াইয়া লইতে হয়। এই সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পবীক্ষা করিতে হয়, কেননা সামান্য ভ্রান্তি হইলেই তিনি একবাবে পথ হাবাইয়া ফেলেন এবং মেরু প্রদেশে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্যাপটেন স্কট দক্ষিণ মেরু আবিষ্কাবেব

সময় থিয়োডোলাইট (theodolite) নামক যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেক্সট্যাণ্ট (sextant) নামক অন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু আবিষ্কারকগণ থিয়োডোলাইট ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচিন মনে করেন। সেক্সট্যাণ্ট হাতে ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই সেক্সট্যাণ্ট অপেক্ষা থিয়োডোলাইট ব্যবহার করাই যুক্তি যুক্ত। তাঁহারা দিগন্ত বৃত্ত হইতে সূর্য্যের উন্নতি বা সূর্য্য কতটুকু উর্দ্ধে গমন করিয়াছে তাহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া নোট-বুকে লিখিয়া রাখেন। সমভি-ব্যাহারী কোন ব্যক্তি দ্বারা এবিষয়ের পুনঃ পরীক্ষা করতঃ পূর্ব্ব পরীক্ষার সহিত মিলাইয়া লন। তৎকালিক তাপমান ও বায়ু চাপ পরিমানও লিখিয়া রাখেন, মেরুতে উপস্থিত হইবার পথে এইরূপে পরীক্ষার দ্বারা সূর্য্যের উন্নতি নির্দ্দিষ্ট করতঃ মেরুর দূরতা নির্ণয় করিয়া থাকেন। উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইলে কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত ঘণ্টায় ঘণ্টায় হয় সূর্য্যের উন্নতি, বা অন্য নক্ষত্র সম্বন্ধে পরীক্ষা করতঃ নোট বুকে লিখিয়া লইয়া তাহার গড় (mean) বাহির করিলেই কতকটা উত্তর মেরুতে উপস্থিতি প্রতিপন্ন করেন। এই নোটবুক, এই সমস্ত পরীক্ষার তালিকা ও সঙ্গিগণের উক্তিই উত্তর মেরুতে উপস্থিতির প্রধান সাক্ষ্য। যদি দর্শ-কের নিকট ফটো তুলিবার ক্যামেরা থাকে তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যা-বলী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। কেননা সূর্য্য দিগন্ত বৃত্ত হইতে কতটা উর্দ্ধে রহিয়াছে তাহারও একটা প্রতিকৃতি উঠাইয়া আনিতে পারেন। দক্ষিণ মেরুতেও ঠিক ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত থাকে; উত্তর মেরুরই ন্যায়, তবে দক্ষিণ মেরুতে এবং চুম্বকের দক্ষিণ অংশ উত্তর অভিমুখী হয়। এস্থলে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য উত্তর মেরু ধ্রুব নক্ষত্র হইতে প্রায় ১ ডিগ্রি দূরে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দিগন্তবৃত্ত ও বিষুব রেখা (plane of horizon and Plain of Equator) শেষ হইয়া উভয়ে মিলিত হইয়াছে সূর্য্য ২১শে এপ্রিল দিগন্তবৃত্ত হইতে ১১ ডিগ্রি ৪৯ মিনিট উর্দ্ধদেশে অবস্থান করে, মোটামুটি ১২ ডিগ্রি ধরিয়া লইলেও চলে। যত ল্যাটিচিউড (নিরক্ষরেখা) পরিবর্ত্তিত হইবে, অর্থাৎ যতই পরিদর্শক এক

ল্যাটিচিউড হইতে অন্য ল্যাটিচিউড স্থানান্তরিত হইবেন, ততই ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় দিগন্ত বৃত্ত হইতে সূর্য্যের উন্নতির তারতম্য হইবে। কুক ২১ শে এপ্রিল উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সূর্য্যের উন্নতি প্রায় ১২ ডিগ্রিই পাইয়াছিলেন ; কাজেই তিনি যে উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পাবা যায়। পরন্তু এই পরীক্ষাই যথেষ্ট পরীক্ষা নহে। উত্তর মেরু হইতে ধ্রুব নক্ষত্র ১ ডিগ্রি দূরে অবস্থিত ঠিক মস্তকোপরি নহে। ডাক্তার কুক যদি ধ্রুবনক্ষত্রকে ঠিক মস্তকোপরি দেখিতে পাইতেন, অথবা যদি সেক্সট্যাণ্ট দ্বারা ধ্রুব-নক্ষত্র উত্তর মেরু হইতে অন্ততঃ ১।২ ডিগ্রি দূরে লক্ষ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উত্তর মেরু নির্ণয় অবিসংবাদী হইতে পারিত। কিন্তু ডাক্তার কুক যখন উত্তব মেরুতে ছিলেন, তখন তথায় রাত্রি ছিল না দিন, অর্থাৎ অন্ধকার ছিল না আলেক ছিল! কাজেই তিনি ধ্রুব নক্ষত্র লইয়া উত্তর মেরু পরীক্ষা করিবার অবকাশ পান নাই। ক্যাপটেন পেয়ারী ও ডাক্তার কুক উভয়েই অল্প সময়ে মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই মেরুতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। গত ৩০০ বৎসর যাবৎ এই উত্তর মেরু আবিষ্কার জন্য কত অর্থ রাশি ব্যয়িত হইয়াছে, কত অমূল্য জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও উত্তর মেরু বাস্তবিক আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা, এবং প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তাকে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কর্ত্তাগণের বিবরণাদি পাঠ করিয়া যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। যাহা হউক এই দুই আবিষ্কর্ত্তার ক্রিয়া কলাপ অবগত হওয়ার যথেষ্ট আনন্দ অনুভূত হইবে। প্রাচ্য দেশের ধন রত্ন আহরণ করিবার আশায় মধ্যযুগে পাশ্চাত্য নাবিকগণ একটি জল পথের আবিষ্কার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য প্রদেশের পথ আবিষ্কৃত হইলে তখন লোকে উত্তর মেরু আবিষ্কার সম্বন্ধে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুকই প্রথম উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কুকের সম্পূর্ণ নাম ডাক্তার ফ্রেডারিক এ, কুক, তিনি একজন আমেরিকান নিউইয়র্ক প্রদেশ অন্তর্গত ব্রুকলিন নগরে তাঁহার নিবাস। তিনি উত্তর

মেরু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোপেনহেগেন ও শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছিলেন (২৪ শে আগষ্ট ১৯০৮)। এই শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ পুঞ্জ হইতে তাঁহার উত্তর মেরু উপস্থিতির সংবাদ টেলিগ্রাম দ্বারা ইউরোপে, ঘোষণা করিলেন। এখনও কুক সাহেব তাঁহার আবিষ্কারের কোন বিজ্ঞান সম্মত প্রমানাদি দেন নাই সত্য, তথাপি তাঁহার বিবরণ পাঠে তাঁহাকেই প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া সম্মান করিতে হয়। তিনি বহুবার মেরু সাগরে ভ্রমণ করিয়াছেন; আর্টিক সমুদ্রের বহুস্থান তাঁহার পরিচিত।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিণাম।

গত দুই শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপে বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জীবন রক্ষার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা অনায়াসলভ্য হইয়া উঠিয়াছে। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য যাহাকে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা সমস্তই বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

জানি না সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির প্রথম আবির্ভাব হয় তখন লোকের অবস্থার সহিত বা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মানব জীবনের তুলনা হইতে পারে কি না। কেবল ভাষার অলঙ্কারের জন্য আমরা আজ কাল জীবনকে সমরক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক এমন একটা সময় ছিল যখন বাঁচিয়া থাকাটা এক বিষম সমস্যা ছিল, কেবল প্রাণটিকে কোনও রূপে রক্ষা করিবার উৎকট ভাবনা চিন্তা আমাদের অতিদূর পূর্ব্বপুরুষগণের সুদীর্ঘ জীবন নিতান্ত দুঃসহ করিয়া রাখিয়াছিল। হিংস্র-জন্তু-সমাকুল বনমধ্যে বাস করিয়া তখন তাহাদিগকে একদিকে বন্য পশু এবং অপর দিকে প্রতিবেশী অন্য মানব সমাজ, উভয়ের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আজীবন কেবল যুদ্ধ লইয়াই

ব্যস্ত থাকিতে হইত। সারাদিন আহারের জন্য বন্য হরিণ ও ঘোটকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া, শ্রান্ত দেহ লইয়া রাত্রে শয়ন করিলেও নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা হইত না, নিশা অবসানে সুপ্তি ভাঙ্গিবে কিনা, নূতন প্রভাতে আবার সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইবে কিনা, এই সকল দুর্ভাবনায় কঠিন ভূমিশয্যা অধিকতর অসুখকর হইয়া উঠিত। তখন আপন আপন জীবন রক্ষা করাই মানুষের একমাত্র কার্য্য ছিল। কিন্তু এখন আর তেমন নাই! আমার জীবন রক্ষার ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমার কোন চিন্তাই নাই। এখন তৎপরিবর্ত্তে আমাদের অবসরটুকু বিলাসের নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জীবনের সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যয় করিতে পারি।

মানুষের তীক্ষ্ন বুদ্ধি এবং কল্পনা শক্তি তাহাকে ইতর জন্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণীরা পুরুষানুক্রমে একই অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতি নাই, যেমন আছে যেন তেমনই থাকিতে চাহে, তাহাতেই সন্তুষ্ট। বস্তুতঃ সন্তোষ নামক যে গুণের আমরা প্রসংশা করিয়া থাকি মানুষের মধ্যে তাহা নাই, সে কিছুতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নহে। কিন্তু সে কেবল অসন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সে যে অবস্থায় আছে তাহা অপেক্ষা একটা উৎকৃষ্টতর অবস্থার কল্পনা করিতে পারে, এবং বুদ্ধি বলে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারে। ব্যাঘ্র হরিণের পশ্চাতে ছুটিয়া, তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া শিকার করে এবং তাহার মাংসে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আহার সংগ্রহের আর সহজ উপায় নাই। মানুষও পূর্ব্বে এইরূপে খাদ্য আহরণ করিত। কিন্তু এত শ্রমসাধ্য কার্য্য তাহার ভাল লাগিল না, বলিল "এত পরিশ্রম করিব কেন? ভাবিয়া দেখি যদি কোনও উপায়ে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় বাহির করিতে পারি তবে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না।" ইহারই ফলে প্রথমে পাথর ছুঁড়িয়া পশু পক্ষী শিকার করিবার প্রথা হইল, তাহার পর প্রস্তর ঘসিয়া নানা প্রকার অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, তাহার পর লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইল। ক্রমে তীর ধনুক-

এবং শেষে বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রের সৃষ্টি হওয়ায় এক্ষণে পশু শিকার অতি অনায়াস সাধ্য ক্রীড়া মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কার্য্যে যত পরিশ্রম আবশ্যক ইতর জন্তু তাহা বিনা আপত্তিতে করিবে, কিন্তু মানুষ যতদূর সম্ভব অল্প পরিশ্রমে সেই কার্য্য করিতে চাহে। মানুষ অলস, শ্রমবিমুখ; কারণ তাহার বুদ্ধির সাহায্যে সকল শ্রমের লাঘব করিতে সে সমর্থ। এই আলস্য, এই শারীরিক শ্রম কাতরতা, হৃদয়ের তীব্র অসন্তোষ, এবং সুখের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই সকল মানব প্রকৃতির উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, বি, এ।

বিবিধ।

সার জেম্‌স্ ডিওয়ার এ বৎসর রয়াল সোসাইটি হইতে ডেভিমেডাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি অতি মৃদুতম উত্তাপ উৎপাদন, তৎসম্ভূত ক্রিয়া ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন। সুপরিচিত গ্লেজব্রুক সাহেব হিউঘ্‌স্ মেডাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম রিচার্ড টেট্‌লি' গ্লেজব্রুক। তড়িতের বহুবিধ গবেষণার জন্য তিনি উক্ত সম্মান ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মঙ্গল গ্রহে আরও সাতটি নূতন খাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, পূর্ব্বে ১৬টি দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে এইরূপ খালের সংখ্যা মোট ২৩টি।

ইউনাইটেডষ্টেটের ব্লু হিল মানমন্দির হইতে একটি রবার নির্ম্মিত পাইলট ব্যোমযান ছাড়া হইয়াছিল। পৃথিবী পরিত্যাগের পর হইতে ইহাকে ১ ঘণ্টা দশ মিনিট কাল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে ১১০২৫ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত এইরূপ যত বেলুন ছাড়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে গমন করিয়াছিল। এইরূপ পাইলট বেলুন দ্বারা বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ, বায়ু চাপ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপার নির্ণীত হইয়া থাকে।

১ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ ১৩১৬, নভেম্বর ১৯০৯। [১১শ সংখ্যা।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিণাম।

মানুষ অধিক খাটিতে চাহে না, ভাবিতে চাহে, পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য ভাবিতে চাহে। আজকাল যে সকল কলকারখানার সৃষ্টি হইতেছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুদ্রা যন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কেহ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে পারিত না, যাহার প্রয়োজন হইত স্বহস্তে তাহার প্রতিলিপি লিখিয়া লইয়া পাঠ করিত। এই পরিশ্রম কমাইবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। উহাই এক্ষণে কি নূতন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং তাহা হইতে কি পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক সংবাদ পত্রের প্রত্যহ লক্ষাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়। এই সকল সংবাদ পত্র যে যন্ত্রে মুদ্রিত হয় তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত হয়, অধিক লোকের প্রয়োজন হয় না। যন্ত্রটি আপনি কাগজের স্তূপ হইতে এক এক খানি কাগজ লইয়া ছাপিয়া, ভাঁজ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট আয়তন মত কাটিয়া সাজাইয়া রাখে,—কালী মাখাইতে হয় না,—সমস্তই কলে হয়। এইরূপে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র সংবাদ পত্র মুদ্রিত হইয়া

যায়। এই প্রকার অন্যান্য সকল যন্ত্রেই পরিশ্রম ও সময়ের আশ্চর্য্যরূপ সংক্ষেপ সাধিত হইয়াছে।

আবার, পূর্ব্বে একজনকে অনেক প্রকার কাজ করিতে হইত, এখন তাহা করিতে হয় না। তখন সকলে আপন আপন আহার সংগ্রহ করিত, শস্য উৎপন্ন করিত; নিজের জন্য পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিত, আবার শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। এখন আর একজনকে এত কাজ করিতে হয় না, উহা অনেকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি কৃষক, শস্য উৎপন্ন করি,—আমার নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদ্ব্যতীত আরও অধিক শস্য উৎপন্ন করিলাম, অনেকেই তাহার অংশ খাইল ! তুমি তন্তুবায়, তুমি নিজের আচ্ছাদনের উপযোগী বস্ত্র বয়ন না করিয়া সকলের জন্য করিলে, রাম যুদ্ধব্যবসায়ী সৈনিক, সে আমাদের সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল, যুদ্ধই তাহার ব্যবসায় হইল, সে কেবল যুদ্ধ লইয়াই রহিল, অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে হইল না,—আমারা তাহার অন্নবস্ত্র যোগাইলাম। এইরূপ শ্রম-বিভাগের দ্বারাও আমাদের শ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে ; এই শ্রমবিভাগের নিয়ম অর্থ-নীতির অন্তর্গত,—এবং অর্থ নীতি বিজ্ঞানের একটা শাখা।

তবে আমরা দেখিতেছি যে বিজ্ঞান নানা উপায়ে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম কমাইয়া দিতেছে। এবং বিগত দুই শত বৎসরে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে ভবিষ্যতের উন্নতিও যদি সেই অনুপাতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সহস্র বৎসর পরে মানুষকে স্বহস্তে কিছুই করিতে হইবে না, সমস্তই কলে হইবে। কোথাও একটা চাবি ঘুরাইলে হয়ত রন্ধনশালার রন্ধন আরম্ভ হইয়া যাইবে, একটা কল নাড়িলে হয়ত সুদূর প্রবাসী আত্মীয় স্বজন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া পড়িবে, আর একটা যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ বেগে বহুদূরদেশে উড়িয়া যাওয়া যাইবে। হয়ত বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যও কল উদ্ভাবিত হইবে ; তাহাতে গো, ব্রাহ্মণ ও ইক্ষুদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিলে অপর দিক হইতে স্ফীতোদর ব্রাহ্মণ দধী সন্দেশ ভোজন করিয়া বাহির হইবে।

রহস্যের কথা যাউক, এখন আমরা দেখিতেছি যে বিজ্ঞান আমাদিগকে আদুরে ছেলের মত বসাইয়া রাখিতে চাহে, বলে—"কেন বৃথা খাটিয়া মরিবে? বসিয়া বসিয়া তোমার বুদ্ধি বৃত্তির চালনা কর,—আকাশের সৌদামিনী হইতে ভূগর্ভের পাথুরিয়া কয়লা পর্য্যন্ত প্রকৃতির যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকল কার্য্য করিবে। জীবন এখন আর একটা ভীষণ সমরক্ষেত্র নহে, উহা এক্ষণে সুরম্য প্রমোদকাননে পরিণত হইয়াছে; জীবন লইয়া দিবারাত্রি বিব্রত হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই,—উহা এখন উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—উপভোগ কর।"

কথাগুলা শুনিতে বেশ বটে, কিন্তু উহাতে আমাদের কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই ত? আদুরে ছেলের অধঃপতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই বিজ্ঞানের এই অত্যধিক আদর মানব জাতির অধোগতির পথ প্রসস্ত করিয়া দিতেছে না ত? রূপকটা ভাল করিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিলেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। ধনী পিতামাতা ছেলেকে কেবল বিলাস সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে চাহে; কিন্তু বিজ্ঞান মানব-সমাজকে শুধু জীবনের সুখ উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বলে না, উপভোগের উপকরণ বৃদ্ধির জন্য, সুখের মাত্রা বাড়াইবার জন্য চিন্তা করিতে বলে। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করা অলসের লক্ষণ নহে, কারণ চিন্তাও একটা কাজ, মানসিক পরিশ্রম,—শারীরিক পরিশ্রমের অপেক্ষা কঠোরতর। পশুর মানসিক পরিশ্রম নাই। বস্তুতঃ যে যত মানসিক পরিশ্রম করে সে তত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, যাহার মানসিক পরিশ্রম নাই সে মানুষ নহে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু অপর দিকে আবার তাহার মানসিক পরিশ্রমের বৃদ্ধি হইতেছে। যতদিন এই উভয়বিধ পরিশ্রমের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে ততদিন মানব সমাজও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

শ্রীসত্য রঞ্জন সেন, বি, এ।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-পুরাবৃত্ত গবেষণায় বুঝিতে পারা যায় যে, তড়িৎ বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কার ও ক্রমিক অভ্যুদয়, ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই অত্যন্ত আধুনিক। প্রাচীন মনীষিগণের এই প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা অতি অল্প মাত্রই ছিল। কিন্তু তড়িৎ বিজ্ঞান স্বকীয় বিদ্যুৎ গতির ন্যায় অতি অল্প সময় মধ্যে বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়াছে; এবং যদিও তড়িৎ বিজ্ঞান এখনও পরিপক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি গুরুত্ব এবং কার্য্য কারিত্বের তুলনায় কোন বিজ্ঞানই তড়িৎ বিজ্ঞানের সহিত তুলিত, বা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

পৃথিবীর আদিম অর্দ্ধসভ্য অধিবাসী যাযাবর-জাতিগণই তড়িতের অতি সাধারণ মাত্র কয়েকটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। বিদ্যুৎ, তৎসহজাত বজ্র নির্ঘোষ, বজ্র পতন অথবা নরকেশ বা পশু লোম সহ ঘর্ষণজাত তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনই প্রাচীন সুধীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

খৃষ্ট আবির্ভাবের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রথম পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীসের সপ্ত রত্নের অন্যতম রত্ন মিলেটাস-বাসী (Miletus) মহামতি থেলিস (Thales) স্থির করিয়াছিলেন যে তৃণমণি (amber) ঘষিত হইলে লঘু পদার্থ সমূহকে আকৃষ্ট করে। ইহার ৩০০ শত বৎসর পরে থিওফ্রাস্টাস্ লক্ষ্য করেন যে, কোন বিশেষ স্ফটিক পদার্থও উত্তপ্ত হইলে লঘু পদার্থ সমূহকে আকর্ষণ করে। তিনি এই স্ফটিক পদার্থের "লিনকারিয়াম" (Lyncurium) এইরূপ নাম করণ করেন। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ইহাই আধুনিক "তুরমালিন" (Tourmaline)। কিন্তু তৃণমণিও যে এইরূপ আকর্ষণ ধর্ম্ম সম্পন্ন ইহা প্রথম লক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, মণির গ্রীক নাম

"ইলেকট্রন" (Electron) অনুসারে, তড়িতের শৈশবাবস্থায় ইহার "ইলেক্‌ট্রিসিটি" (Electricty) এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

তড়িৎশক্তি সম্পন্ন টরপিডো নামক (Torpedo) একপ্রকার মৎস্যও এইরূপে আক্রান্ত জীবের শরীর স্নায়বিক আক্ষেপ সঞ্জাত করিতে পারে, ইহা প্লিনি (Pliny) নামক জনৈক পণ্ডিত প্রথমে লক্ষ্য করেন। এই মৎস্যকে সময়ে সময়ে "ক্রাম্প" (Cramp) বলে। কিন্তু এই মৎস্য বিশেষের এইরূপ শক্তি তৃণমণি বা তুরমালিনের আকর্ষনী শক্তিরই অনুরূপ ইহা গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দীতে ইউসষ্টেথিয়াস্ (Eustatheus) লিখিয়া গিয়াছেন যে কারা-মুক্ত কোন টাইবেরিয়াস (Tiberius) বাসীর বাতব্যাধি এই মৎস্য প্রদত্ত স্নায়বিক বিক্ষোভ দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল। চিকিৎসার্থে তড়িৎ প্রয়োগের ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে গথ-নৃপতি ওলিমার (Wolimar) তাঁহার গাত্র হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে পারিতেন। এইরূপ কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতও কেশ বিন্যাসের সময় তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর ১২০০ বৎসর যাবৎ আর তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা বা ইহার উন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ডাক্তার গিলবার্ট এই বিস্মৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া (De Magnet "ডি ম্যাগনেট" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আরও কয়েকটি নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে তৃণমণি এবং তুরমালিন ব্যতীত মূল্যবান প্রস্তর সমূহ, কাচ, গন্ধক, চাঁচগালা, রজন ইত্যাদিও, অম্বর এবং তুরমালিনের সম-ধর্ম্ম সম্পন্ন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের অভাবই তড়িৎ ক্রিয়ার অনুকূল। পক্ষান্তরে জলকণা সিক্ত বা দক্ষিণ বাতাস এইরূপ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। গিলবার্টের এই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের পর ৬০ বৎসর আবার তড়িৎ আলোচনা অন্ধকারে পড়িয়াছিল। ইহার পর বয়েল (Boyle) তড়িৎ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। গিলবার্ট সম্পাদিত তড়িৎ ক্রিয়া গুলির পুনঃ সম্পাদন করতঃ তাঁহার উক্তির সমর্থন করেন।

প্রত্যুতঃ তিনিই তড়িৎ সম্ভূত আলোক আবিষ্কার গৌরবের প্রকৃত অধি-কারী। তবে তাহার ক্রিয়াবলী বা মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী এতই অস্পষ্ট যে তাঁহাকে তড়িৎ আলোকের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কিছুতেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রায় এই সময়েই ম্যাগডিবার্গের বিচারপতি (Burgo master of Magdeburg) বায়ু নিস্কাষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, স্বনামধন্য আটো ভন গেরিক (Otto Von Guericke) তড়িৎ বিজ্ঞা-নের যথেষ্ট উন্নতি করেন। খ্রীষ্ট সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘর্ষিত বস্তুর স্থানে কাঁচ দণ্ড, রজন বা গন্ধক দণ্ড এবং ঘর্ষকের স্থানে হস্ততালু এবং পশম এই সমস্তই তড়িৎ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট তড়িৎ উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কাজেই উৎপন্ন তড়িৎ পরি-মাণ যে অতি সামান্যমাত্র হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ! অটো ভন গেরিক প্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন ও গঠন করেন। এই যন্ত্রের প্রধান উপাদান অর্থাৎ ঘর্ষিত বস্তু একটি গন্ধকের গোলক, এবং ঘর্ষক হস্ততালু। এই গন্ধক গোলকটি অক্ষদণ্ডে বিঘুর্ণিত হইত। এই অতি অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত যন্ত্র সাহায্যেও তিনি দণ্ড ঘর্ষণ জাত তড়িৎ অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ উৎপাদিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অধিক পরিমাণ তড়িৎ হইতে আলোকের অধিকতর দীর্ঘ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া-ছিল ; এবং স্ফুলিঙ্গ নির্গম কালীন যে প্রকার শব্দ উত্থিত হয় তাহাও শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি এই সমুদয় হইতেই তড়িতের আলোক উৎপাদনকারী ক্ষমতার অবিসংবাদী মীমাংসা করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তড়িতের বিকর্ষণ শক্তিও প্রথম আবিষ্কার করেন।

তড়িৎ বিজ্ঞানে মহামতি স্যার আইজ্যাক নিউটন তত মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র স্থির করেন যে তড়িতের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি কাঁচের চাদর ভেদ করিয়াও প্রসারিত হয় ; এবং যদি এক খানা কাঁচের চাদরের এক দিকে তড়িৎ উৎপাদিত হয়, সেই তড়িৎ অপর পৃষ্ঠেও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে।

তৃণমণি ঘর্ষণে অসংখ্য মৃদু শব্দ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক রেখা পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ওয়ালই (Dr. Wall) সর্ব্ব প্রথম বিদ্যুৎ এবং

বজ্রপতনের সহিত তড়িৎ ক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—"This light and cracklings seem in some degrees to represent thunder and lighting"। ইহার পর ৪০ বৎসর আর কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। ১৭২৯ খৃঃ অঃ ষ্টিফেন গ্রে (Stephen Grey) সর্ব্ব প্রথম তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই তড়িৎ অপরিবাহক পদার্থের সহিত তড়িৎ পরিবাহক পদার্থের বিভিন্নতা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। তিনি কোন সময়ে অল্পদূরে তড়িৎ পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং সাধারণ সূত্রে তার ঝুলাইয়া এই পরিবাহন পথ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু সূত্র তড়িৎ বাহক বলিয়া তাঁহার চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার পরীক্ষার সহকারী হুইলার (Wheeler) অনুমান করিলেন, যে সূত্র ওচ্ছ অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়াছে বলিয়া তড়িৎ অতি ত্বরিত গতিতে পরিবাহিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। কাজেই তিনি ওয়ালকে অতি সূক্ষ্মতম সূত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনি বুঝাইলেন যে অতি সূক্ষ্ম সূত্র বাহিয়া তড়িৎ ত্বরিত গতিতে স্বস্থানভ্রষ্ট হইতে পারিবে না। রেশম সূত্র সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবিয়া রেশম সূত্র ব্যবহার করিলে, তাঁহারা পরীক্ষায় কৃত কার্য্য হইলেন। তাঁহারা সূক্ষ্মতাই কার্য্য সিদ্ধির উপায় ভাবিয়া এবং সূক্ষ্ম ধাতবতার ব্যবহার করিলে আরও কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে ভাবিয়া, তার ব্যবহারে পুনরায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন। এবারে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইলেন বলিয়া রেশম এবং তারের মধ্যে এবং তাহাদের প্রত্যেকের তড়িৎ পরিবাহন ক্ষমতার মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, যে কতকগুলি পদার্থ তড়িৎ পরিবাহক এবং কতকগুলি তড়িৎ পরিবাহন পথরোধক। তাহারা এই দুই বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থের একটি তালিকাও প্রস্তুত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মীমাংসা করিলেন, যে ঘর্ষণ বা এইরূপ কোন উপায়ে উদ্রিক্ত করিলে যে সমস্ত পদার্থ তড়িৎ পূর্ণ হয়, তাহারাই তড়িৎ অপরিবাহক

এবং যাহারা উদ্রিক্ত হইলেও কিছুতেই তড়িৎ পূর্ণ হয় না, তাহারাই তড়িৎ পরিবাহক।

প্রায় এই সময়েই ফরাসি রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধাবক জনৈক ডু ফে (Du Fay) দুই বিভিন্ন জাতীয় তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ইহাও আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। একখণ্ড সুবর্ণ পত্রিকা (কাগজের অপেক্ষাও পাতলা এবং লঘু পেটা-সোনা) উদ্রিক্ত কাঁচদণ্ড দ্বারা বিকর্ষিত হইলে, ডু ফে অন্য একটি উদ্রিক্ত চাঁচ গালাদণ্ড দ্বারা পুনঃ বিকর্ষিত করিবার মানসে উক্ত পত্রিকাব নিকট গালাদণ্ড লইয়া আসিলে পত্রিকা বিকৃষ্ট না হইয়া তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইল দেখিয়া ডুফে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া স্থির কবিলেন যে বিভিন্ন পদার্থে উদ্রিক্ত তড়িৎ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্পন্ন। অতঃপর বুঝিবাব সৌকর্য্যার্থে তিনি এই দুই বিভিন্ন তড়িতের একটির নাম কাচোৎপাদিত অপরটি রেজিন উৎপাদিত তড়িৎ এইরূপ নাম করণ করিলেন vitrious and resinous.

প্রায় এই সময়েই গ্রে (Gray) নামক জনৈক পণ্ডিত তড়িৎ অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে পৃথকীকৃত আসনে স্থিত মানব দেহ হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত করাইযা সাধারণকে চমৎকৃত কবিলেন। এইরূপে তড়িৎ পরিবাহক পদার্থকে অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা পৃথকীকৃত করার ইংরাজি নাম ইন্‌সুলেশন, (Insulation) এবং এইরূপে স্বতন্ত্র-স্থিত-পদার্থকে ইন্‌সুলেটেড (Insulated) পদার্থ বলে। ইহার পর হইতে তড়িৎ ক্রিয়া বা তাহার ধম্মপরীক্ষা কালে বা তড়িতের কোন কিছু কার্য্যোপলক্ষে ইন্‌সুলেটেড টুল ব্যবহৃত হইতে লাগিল। খৃষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে জার্ম্মাণ দেশীয় পণ্ডিতগণ তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা আরম্ভ করিলেন। উইটেন্‌বর্গের দর্শন শাস্ত্র অধ্যাপক এম্ বোজ্ (M. Boze) নামক জনৈক পণ্ডিত একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র গঠন কবিলেন, ইহাতে তড়িৎ পরিবাহিত হইবার জন্য ধাতব পরিবাহক সংযুক্ত কবিলেন, অধিকন্তু গন্ধকের গোলকের পরিবর্তে তিনি কাচগোলক ব্যবহার করিলেন।

বার্লিন নগরের পণ্ডিত ডাক্তার লুডল্ফ (Ludolph) সর্ব্বপ্রথম স্পিরিট, ফস্‌ফরাস্, বারুদ প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থ ইন্‌সুলেটেড টুলের উপর বা রজন-পিষ্টকের উপর দণ্ডায়মান মানব অঙ্গুলি নিঃসৃত তড়িৎ সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিলেন।

লিডেন (Lyden) নগরের পণ্ডিত এম কিউনিয়াস (Cuneus) কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লিডেন বোতলের (Lyden Jar) আবিষ্কার ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে সংসাধিত হইয়াছিল। এবং অতীতের অন্য সমস্ত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের ন্যায় ইহাও আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। তৎকাল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ-অভিহিত এই "তড়িৎ-বাষ্প" (electric effluvium) একই স্থানে বা একই পাত্রে পরিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অধ্যাপক মুসেনব্রোক (Muschenbroek) উদ্ভাবিত কোন এক সুসংস্কৃত পরীক্ষার পুনঃ সম্পাদন কালে এম কিউনিয়াস লিডেন বোতল নির্ম্মাণ পন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মুসেনব্রোক অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে, যদি অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত কোন পরিবাহক পদার্থকে তড়িৎ পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে, তড়িৎ শক্তি নিশ্চয়ই সর্ব্ব দিকে অনায়াসে বিকীরিত হইবার তত সুবিধা পাইবে না। কাজেই ইহা একই স্থানে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে। এইরূপ যন্ত্র গঠিত করিতে হইলে তিনি স্থির করিলেন যে জলকে কাঁচের বোতলের মধ্যে পূরিয়া বোতলের ছিপির মধ্যে দিয়া প্রবিষ্ট ও জল-লগ্ন-লৌহ কীলক দ্বারা সেই জল এবং তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের মূল এবং প্রধান তড়িৎ পরিবাহন দণ্ড (prime conductor) পরস্পর সংযুক্ত করতঃ জলকে তড়িৎ পূর্ণ করিলেই তড়িৎ জলে সঞ্চিত থাকিবে; এবং কাচ অপরিবাহক বলিয়া তড়িৎ বিকীরিতি হইয়া পড়িবে না। কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না। কাজেই অধ্যাপক মুসেনব্রোক সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এম কিউনিয়াস এইরূপে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিবার কালে দৈবাৎ বোতলটি এক হাতে ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা কীলকটি প্রাইম কণ্ডাকটার হইতে অপসারিত করিতে যাইয়া বাহু অভ্যন্তরে মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা তীব্র স্নায়বিক বিক্ষোভে বিস্মিত হইয়া পড়ি-

এই শিশি পরিবিশুদ্ধ এবং উত্তপ্ত হওয়া প্রয়োজন। আমি খড়িচূর্ণ দিয়া বোতলটীকে হাতে রাখিয়া রীতিমত ঘর্ষণ করি, এই শিশিতে যদি স্পিরিট বা পারদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কার্য্য আরও সুন্দররূপে সংসাধিত হয়। এই শিশি এবং কীলক প্রাইম কণ্ডাকটার বা তড়িৎ পূর্ণ কাচদণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার অব্যবহিত পরেই ইহা হইতে এরূপ দীর্ঘ অগ্নি কীরণ জাল সমাকীর্ণ হইতে থাকে, যে এই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লইয়া আমি আমার গৃহের বহির্দ্দিকে ৬০ পদ চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহাকে আরও অধিকতর তড়িৎপূর্ণ করিয়া আমি কক্ষান্তরে প্রবেশ করতঃ তথায় স্পিরিট প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি। ইহাকে তড়িৎপূর্ণ করিবার কালে যদি আমি অঙ্গুলি দ্বারা কীলকটি স্পর্শ করি, অথবা হস্তে সুবর্ণ দণ্ড লইয়া সেই দণ্ড লৌহ কীলকে সংলগ্ন করি, তাহা হইলে আমার স্নায়ু মণ্ডলে একটা বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হয়; এবং আমার স্কন্ধ প্রদেশ ও বাহুদ্বয় অসাড় হইয়া পড়ে। একটি টীনের নল, বা কোন মানব যদি ইনসুলেটেড্ টুলের উপর দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে, সাধারণ প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে অধিকতররূপে তড়িৎপূর্ণ হইয়া থাকে। যখন আমি ২৫ ফিট লম্বা একটা টিনের নলে এই শিশি ও কীলক সংলগ্ন করিয়াছিলাম, তখন এই নল যে কিরূপ অধিক পরিমাণে তড়িৎপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা না দেখিলে কিছুতেই অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। দুই টুকরা পাতলা কাঁচখণ্ড এই তড়িৎ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের মধ্যে এই টুকুই অসাধারণ যে যদি এই কীলক ও শিশি পরস্পর তড়িৎপরিবাহক বা তড়িৎ অপরিবাহক কোনরূপ পদার্থ দ্বারা সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে শরীরে কোনরূপ তীব্র আঘাত লাগে না। আমি ইহা কাষ্ঠখণ্ডে, কাঁচখণ্ডে, গালায় এবং অন্য ধাতব পাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সেই জন্য মনে হয় মানব-শরীরের সহিত ইহার কোন বিশেষ রহস্য সংলিপ্ত রহিয়াছে। আমার এই মত সমর্থনের জন্য আমি কেবল এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিতে চাই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি

এই শিশি হস্তদ্বারা ধারণ করি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কিছুতেই স্পিরিটে অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে পারে না।

যাহা হউক এম কিউনিয়াসের সময় হইতে সকলেই এই বোতল তড়িৎ পূর্ণ করিতে হইলে, হাতে করিয়া ধরিতেন, কিন্তু এরূপ করিবার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন না। অবশেষে মহামতি ফ্রাঙ্ক-লিনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনিই প্রথমে মীমাংসা করেন যে শিশির ভিতরে এবং বাহিরে এক জাতীয় তড়িৎ থাকে না, পরন্তু দুইটিই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন একটি বোতলকে তড়িৎপূর্ণ করিবার সময় বোতলের ভিতরে যতটুকু তড়িৎ প্রবিষ্ট করান হয়, বাহির হইতে ততটুকু তড়িৎ বিনির্গত হইয়া যায়। এই জন্যই তড়িতের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য পথ স্বরূপ হস্ত কিম্বা অন্য কোন পরিবাহকের প্রয়োজন হয়।

১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার ওয়াটসন, (Dr. Watson) লর্ড সি ক্যাভেণ্ডিস (Lord C. Cavendish) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিঃসৃত তড়িৎ কত ত্বরিত গতিতে প্রবাহিত হয়, তৎ অবধারণার্থে টেমস নদীর উপর দিয়া ২ মাইল তার সহযোগে ও সুটার্শহিল (Shooter's Hills) নামক নীরস ২ মাইল পার্ব্বত্য ভূমিতে পরীক্ষা করেন। এই দুই স্থানেই অতি ত্বরিত গতিতে তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত পরীক্ষা আধুনিক তড়িৎ-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণের নিকট অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়া পড়িয়াছে। এই পরীক্ষার ফল অনুধাবন করিয়া এবং পৃথিবীর তড়িৎ পরিবাহন ক্ষমতা অবলোকন করিয়া পণ্ডিতগণ টেলিগ্রাম গমন প্রত্যাগমনের জন্য দুইটি বিভিন্ন তার যোজনা না করিয়া, কি স্থলে, কি জলে সর্ব্বত্রই একটি তারে কার্য্য চালাইতেছেন, অন্য তারের কার্য্য পৃথিবীর দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। ইহাতে যে কোটী কোটী টাকা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফ্রাঙ্কলিন সাহেবই প্রমাণ করেন যে লিডেন বোতলে, তড়িৎ ধাতব আচ্ছাদনে অবস্থান করে না, পরন্তু বোতলের গাত্রে অর্থাৎ কাঁচ অংশে অবস্থিতি করে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি বোতলের গাত্র

কাজেই ফুলিঙ্গ নির্গম কালীন তড়িৎ নির্ঘোষ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। সেই গৃহ মধ্যে তড়িৎ ক্রিয়া বড়ই অসাধারণ হইয়াছিল। গৃহদ্বারের "চৌকাট" ইত্যাদি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং কবাট কবজা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

অধ্যাপক রিচম্যানের দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, যে তাঁহার কপালে একটি লোহিত দাগ ও তথাকার লোমকূপ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিত নিঃস্রুত হইয়াছে। কিন্তু গাল চর্ম্মে কোনরূপ ছিদ্র হয় নাই। বামপদের পাদুকা পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই পদ তালুতে একটি নীল দাগ পড়িয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে বিদ্যুৎ কপালে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বামপদ দিয়া বিনির্গত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত গাত্রেও অনেকগুলি কাল ও লোহিত দাগ হইয়া গিয়াছিল। বামপদের পাদুকা ভিন্ন পরিহিত-বস্ত্রের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা পরে শরীর ব্যবচ্ছিন্ন হইলে দেখা গেল যে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, এবং করোটী বা মস্তকের খুলিও সম্পূর্ণ অনাহত রহিয়াছে। শ্বাসনালী পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছত্বক সমূহ অত্যন্ত পেলব হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অতি সামান্য নাড়াচাড়াতেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পাকস্থলি ও গলনালীর অধোভাগের গর্ত্ত সমূহে অতিস্রাবিত শোণিত সঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রন্থি ও অন্ত্র সমূহ অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছিল। দেহ অত্যন্ত শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করিল; এবং মৃত্যুর দুই দিন পরেই এরূপ গলিয়া গিয়াছিল, যে অতিকষ্টে শবাধারে ন্যস্ত করিতে হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ লইয়া যতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন, যে বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ডগুলি বি-সম তড়িৎ ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া পড়ে। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন যে মেঘ সমূহ সর্ব্বদাই বি-সম তড়িৎ সম্পন্ন। কাজেই বজ্র ঝড় বৃষ্টির সময় মেঘ হইতে পৃথিবীকে আঘাত করেনা; পরন্তু পৃথিবীর বিদ্যুৎই মেঘমণ্ডল সমূহকে আঘাত করে।

অবশ্য তাঁহার এ যুক্তি ভ্রমাত্মক, তাঁহার এই ভ্রান্ত অভিমত পরে ক্যাণ্টন (Canton) তড়িতের ইণ্ডাক্‌শন্ (induction) ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সময় সংশোধন করিয়া লন। উক্ত পণ্ডিতই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন, যে ঘর্ষণে কোন এক ঘর্ষিত বস্তুতে যে জাতীয় তড়িৎ উৎপাদিত হয়, ঘর্ষক পরিবর্ত্তিত করিয়া অথবা ঘর্ষিত বস্তুর উপরিভাগের অবস্থান্তর করিয়া একই বস্তুতে বিপরীত জাতীয় তড়িৎ উৎপাদিত হইতে পারে। সাধারণতঃ মসৃণ কাঁচ দণ্ডে রেশম ঘর্ষণ করিলে সম-তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিড়াল লোম ঘর্ষণ করিলে বা কাঁচের উপরিভাগ বন্ধুর বা অমসৃণ করিয়া দিলে বি-সম তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এম, এপিনাস (Epinus) এবং অনারেব্‌ল্ এইচ ক্যাভেণ্ডিস তড়িতের আকর্ষণ বিকর্ষণের গণিতমূলক কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করেন। এই তত্ত্ব পরীক্ষায় ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে এম কুলোম (Coulomb) বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি ইহার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবন্ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "টরসন্ ব্যালান্স" (torsion balance) এই যন্ত্র সাহায্যে এক গ্রেনের ২০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ বলও (force) নির্ভুল পরিমিত হইতে পারে। এই যন্ত্র সাহায্যে তিনি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত করেন।

(১) দুই বস্তু একই জাতীয় সম পরিমাণ তড়িৎ পূর্ণ হইলে পরস্পরের বিকর্ষণ হয়। এই বিকর্ষণ বল বস্তুদ্বয়ের দূরতার বৃদ্ধির সহিত সম অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) দুইটি বস্তুর একটিতে যত পরিমাণ তড়িৎ থাকিবে, সেই বস্তু অন্য বস্তুটিকে তাহার তড়িৎ পরিমাণের সম অনুপাতে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করিবে। দুইটি বস্তুর একটিতে যত পরিমাণ তড়িৎ থাকিবে, সেই বস্তু অন্য বস্তুটিকে উভয়ের দূরতার বি-সম অনুপাতে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করিবে।

এতদ্ব্যতীত কুলোম স্থির করিলেন, যে তড়িৎ পূর্ণ কোন ইনসুলেটেড (insulated) পদার্থ হইতেও তড়িৎ অল্পে অল্পে ক্রমশঃ

চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু রাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই বায়ু মণ্ডল অবশ্য কখনই জলকণা শূন্য নহে। তবে জলীয় অংশ কখনও অধিক কখনও বা অল্প থাকে।

টর্‌সন্ ব্যালান্স উদ্ভাবিত হইবার কয়েক বৎসর পরেই ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে এম ভল্টা (M. Volta) ইলোক্ট্রোফোরাস (Electrophorus) নামক আরও একটি তড়িৎ যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাভইসিয়ার (Lavoisier) এবং ল্যাপলাস (Laplace) তড়িৎ সম্বন্ধীয় অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তড়িৎ বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হইবার সময়, কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হইবার সময়, পদার্থের অকস্মাৎ অবয়ব পরিবর্ত্তনের সময় এবং পদার্থ দ্বয়ের তীব্র রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় যে তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহা উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ই নির্ণয় করেন।

ইটালীর অন্তর্গত পেভিয়ার (Pavia) শারীর স্থান বিদ্যার অধ্যাপক গ্যালভানী (Galvani) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তড়িতের আর একটি নূতনতর শাখা আবিষ্কার করেন। আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে, এই শাখা বিজ্ঞানের নাম গ্যালভানিসম্ (Galvanism) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই আবিষ্কারের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বিবরণ পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে ইহাও সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। তাঁহার স্ত্রী ও জনৈক ছাত্র লক্ষ্য করিলেন যে, একটি তড়িৎ যন্ত্রের নিকটস্থ একখানি ছুরিকার দ্বারা ভেকের ব্যবচ্ছিন্ন দেহ স্পৃষ্ট হইবামাত্র ভেকের স্নায়বিক আক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। গ্যালভ্যানীর পত্নীই এবিষয়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; কেননা তিনি পীড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহারই পথ্য তৃপ্তিদায়ক করিবার জন্য ভেকটি আনীত হইয়াছিল।

যাহা হউক "ইন্সটিটিউট অফ সাএন্সে" নামক সভার ব্যবহারার্থে এই আবিষ্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বোলোনা (Bologna) হইতে ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন, ইহাতে লেখা আছে

যে তিনি একটি টেবিলের উপর একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সন্নিকটে একটি ভেকের অঙ্গচ্ছেদ করিতে করিতে তাহার জনৈক শিষ্য কর্তৃক ছুরিকা দ্বারা ভেকের উরুদেশীয় স্নায়ু স্পৃষ্ট হইবামাত্র ভেকটির স্নায়বিক আক্ষেপ উপস্থিত হইল। ঠিক এই সময়ে নিকটস্থ তড়িৎ যন্ত্র হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হইতে লাগিল, এবং প্রত্যেক বারেই তাঁহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে স্নায়ুর সহিত কোন তড়িৎ পরিবাহক ধাতব পদার্থ স্পৃষ্ট হইলেই এইরূপে পেশী আক্ষিপ্ত হয়, নতুবা কিছুই হয় না। গ্যালভানী পূর্ব্বে অনুমান করিতেন যে পেশীর ক্রিয়া হইতেই তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে; কাজেই এই ব্যাপারকে তাঁহার অনুমানের পরিপোষক মনে করিয়া এই তথ্যের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সবিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। এইজন্য তিনি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র, ইলিক্ট্রোফোরস ইত্যাদি কৃত্রিম যন্ত্র সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া নানারূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং তিনিও প্রত্যেক পরীক্ষায় একরূপ কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি বায়ুমণ্ডলস্থিত বিদ্যুতের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটা উষ্ণ শোণিত বিশিষ্ট জীবের ও ভেকের পদ একটা বিদ্যুৎ পরিচালক সূচ্যগ্র দণ্ডে গ্রথিত করিয়া উক্ত দণ্ড গৃহের ছাদে সন্নিবিষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে প্রত্যেক বার বিদ্যুৎ চকিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জীবের পা দুটি তীব্রবেগে আক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আবার ঐরূপ ক্রিয়া বজ্রাঘাত সহ ঝড় বৃষ্টি ভিন্ন অন্যসময়েও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তবে ওরূপ তীব্র আক্ষেপ উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ নানাবিধ গবেষণাকালীন তিনি কতকগুলি ভেকের মেরুদণ্ডে ধাতব হুক বিদ্ধ করিয়া তাঁহার বাগানের লোহার রেলিংএ টাঙ্গাইয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে লোহার রেলিংএ হুক স্পৃষ্ট হইবামাত্রই সর্ব্বঋতুতে ও সর্ব্ব সময়েই ঐরূপ আক্ষেপ চলিতে থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করিলেন যে সাময়িক ঋতুর কোনরূপ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকেও এরূপ ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার গৃহে পুনরায় ভেক লইয়া পরীক্ষা কবিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে বহিঃ পেশীর সহিত

উরুদেশীয় স্নায়ু ধাতব তড়িৎ পরিবাহক দ্বারা স্পর্শ করিলেই ঐরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে এই স্নায়বিক আক্ষেপের একমাত্র কারণ জান্তব তড়িৎ। এবং তিনি অনুমান করিয়া লইলেন যে পেশী এবং স্নায়ু একটি তড়িৎপূর্ণ লিডেন বোতলের বহিঃ এবং আভ্যন্তরিক আবরণের ন্যায় এবং ধাতব দণ্ডটি দুই তড়িতের পরিবাহক। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

আলোক চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব।)

ফটোতে চিত্র সৌন্দর্য্য প্রদান কবিতে হইলে ফটোতে চিত্রের প্রসার বা (breadth) থাকা প্রয়োজন। যে ছবিতে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর ঐক্য আছে, যাহাতে অপর সকল বস্তু প্রধান বস্তুব (principal object) সহ কার্য্য করে, যাহাতে ছবিব প্রত্যেক অংশ মিলিয়া এক সমন্বয় স্থাপন করে এবং সমস্ত বস্তুব দ্বারা ছবিব 'উদ্দেশ্য' (motif) পরিস্ফুট করিয়া তোলে—তাহাকে প্রসার বা breadth বলে। যদি ছবিতে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুব সম্বন্ধ না থাকে তজ্জন্য অসংলগ্ন ও প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব প্রধান বলিয়া বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে যে চিত্রে প্রসার বা breadth নাই। ছবি তুলিবার সময় ক্যামেরা বসাইবাব স্থান এমন যায়গায় ঠিক করিতে হইবে, যে সেই স্থান হইতে লাইন গুলি বেশ লম্বাভাবে অনেক খানি গিয়াছে এবং অন্যান্য বস্তুসকলের বেশ বিস্তৃতি আছে অথচ অসংলগ্ন বা ছাড়া ছাড়া নহে, কিন্তু এক বস্তুব সৌন্দর্য্য অন্যের উপর নির্ভর করে।

চিত্ররচনার প্রতি মনোযোগ যেমন প্রয়োজন তেমনি দৃশ্যেব উপর কি রকম আলো পড়িয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিও প্রয়োজন। সমস্ত ছবিতে যদি কেবল খুব সাদা আলো (high lights) নানা স্থানে আসিয়া পড়ে

তাহা হইলে ছবি যেমন খারাপ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না সাধারণতঃ ছবিতে খুব সাদা আলোর (high light) ভাগ কমই থাকিবে এবং ছবির বেশী ভাগ ছায়া ও ক্রমিক ছায়া (half tone) দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। এই খানে বলা উচিত যে ছবিতে সাদা স্থান ও ছায়ার মধ্যস্থিত অংশ যেখানে সাদা হইতে ক্রমে কাল হইয়া গিয়াছে বা কাল হইতে ক্রমে সাদা হইয়া গিয়াছে এই ক্রমিক ছায়া অর্থাৎ ছায়া হইতে আলো বা আলো হইতে ছায়াকে (half tone) বলে। যখন ছড়ান আলো পরিহার করান অসম্ভব হয় তখন আলোর মধ্যে ছবির কোন সতেজ স্থানে (strong point) যদি এমন কোন বস্তু বসান যায় যাহাতে খুব সাদা আলো (high light) ও গভীর ছায়া পাশাপাশি আছে তাহা হইলে খুব ভাল হয় ; উদাহরণ স্বরূপ একটা কাল গরু ও তাহার সাদা বাছুর কিম্বা সাদা ধুতি ও চাদর পরিহিত কোন লোক। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা অতি আশ্চার্য্যরূপে ছবির ঐক্য স্থাপন হয়। ঐ প্রকার স্থানে সাদা (background) পশ্চাৎ ভূমির উপর কাল কিম্বা কাল ব্যাকগ্রাউণ্ডের উপর সাদা জিনিষ স্থাপন করিলে চলে ; উজ্জ্বলালোকিত জলের উপর কাল নৌকা অথবা সাদা কাপড় পরিহিত কোন লোক যদি কাল প্রস্তর বা ঝোপের সম্মুখে দাঁড়ায় তাহা হইলেও চলিতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রুপ তুলিতেও এই প্রকার ভঙ্গী (pose) 'লাইন', * সামঞ্জস্য (balance) প্রভৃতি রাখিয়া পশ্চাদভূমি (background) ও অন্যান্য সরঞ্জামের সহিত সমন্বয় স্থাপন যাহাতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দৃশ্য তুলিতে হইলে তাহার মধ্যে আকাশের ছবি তোলা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর, আকাশের ছবি একেবারেই উঠে না। যে এক্সপোসারে দৃশ্যের ছবি বেশ উঠিয়াছে ও সে জন্য যে ছবিতে প্রতি জিনিস বা সূক্ষ্মাংশ (detail) পরিষ্কাররূপে উঠিয়াছে তাহাতে আকাশে বেশী এক্সপোসার

---

* পূর্ব্বে 'লাইন' কথার উল্লেখ করা গিয়াছে—খালের ধারে যেখানে জল তীরে আসিয়া লাগে সেখানে তৃণাবৃত সমস্ত স্থানের পাশ দিয়া একটা লাইনের মত দেখায়। মাটি ও পর্ব্বতের পাদদেশেও লাইনের মত দেখায়। এই গুলিকে সংক্ষেপে 'লাইন' বলা হইয়াছে।

(over exposed) হইয়া যায় তজ্জন্য কোন মেঘ দেখা যায় না, কেবল সমস্তটা সাদা দেখায়। মেঘের ছবি তুলিতে হইলে দুইবার ছাপা বা প্রিণ্ট করা প্রয়োজন—ইহা পরে বিবৃত হইবে—বা কোন উপায়ে যাহাতে দৃশ্যের, বিশেষতঃ সম্মুখ জমীর (forgraund) ঠিক এক্‌স্‌পোসার হয় কিন্তু আকাশ টুকুর কম এক্সপোসার হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। এ জন্য আজকাল একরকম শার্টার নির্ম্মিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বস্তুর ছবি দৃশ্যচিত্রে বেশ উঠে;—যে দৃশ্যে আলো ও ছায়ার সুন্দর তারতম্য আছে, সর্ব্বপ্রকার গাছ পত্র-শোভিত বা পত্রশূন্য। তবে পত্র থাকিলে বাতাসে তাহা নড়ে বলিয়া একটু অসুবিধা হয় কিন্তু খুব কমক্ষণ এক্সপোস করিলে সে অসুবিধা থাকে না কিম্বা যে দিন বাতাস নাই সে দিন ছবি তোলা ভাল। সর্ব্বপ্রকার হর্ম্ম্য ও ইমারতাদির ফটো অতি নিখুত ভাবে উঠে। যেখানে জল থাকে সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছবি হয় যেমন কোন খাল বা বিলের উপর বৃক্ষাদির ছায়া কিম্বা নদীতে পালভরা নৌকা বা জাহাজ। যাঁহারা চিত্র সৌন্দর্য্য পূর্ণ ফটো তুলিতে চান তাঁহাদের উপরোক্ত মতে চলিলে শিক্ষার সময় বেশ উপকার হয় অবশ্য সমস্ত ব্যপারাটা বুঝিতে পারিলে নিজে ঠিক করিয়া চলিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত আজকাল একদল হইয়াছেন তাঁহারা এ সকল কোন নিয়ম মানেন না তাঁহারা নিজেকে 'প্রাকৃতিক' (naturalist) ফটোগ্রাফার বলেন! তাঁহাদের মতে বলিলে এত কষ্টের প্রয়োজন হয় না। আগামী বারে ছবি তুলিবার সময় কি করিতে হয় সে সম্বন্ধে লেখা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

দুষ্প্রাপ্য মূল পদার্থের তালিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১—সাঙ্কেতিক অক্ষর (Symbol)

২—পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight)

৩—আবিষ্কারক (Discoverer)

৪—আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)

৫—প্রধান প্রাপ্তিস্থান (Principal sowell)

৬—দ্রব করিবার উত্তাপ (Melting point)

৭—ধর্ম্ম (Properties)

(উক্ত নির্দ্দেশকের সংখ্যার সহিত পদার্থের নিম্নস্থিত সংখ্যা মিলাইয়া লইতে হইবে।)

ইরিডিয়াম (Iridium)

১—Ir.

২—১৯৩·২

৩—টেন্যাণ্ট ১৮০৪ খৃঃ অব্দে।

৪—২২·৪

৫—ইরিডস্‌মাইন।

৬—১৯৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

৭—প্ল্যাটিনাম ধাতু অপেক্ষাও অধিক তাপে দ্রব হয় এবং ইহা অপেক্ষাও ভঙ্গপ্রবণ

ল্যান্থানাম (Lanthanum)

১—La

২—১৩৮·২

৩—মোসাণ্ডার ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে

৪—৬·১

৫—সেরাইট।

৬—ক্যালসিয়ামের অনুরূপ এবং উক্ত ধাতু অপেক্ষাও শীঘ্র অক্সিডাইজড্‌ হয়।

লিথিয়াম—

১—Li

২—৭

৩—আরফ্রেড্‌সন্‌ ১৮১৭ খৃঃ অব্দে।

৪—০'৫৮

৫—লেপিডোলাইট।

৬—১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

৭—কোমল, বাতাস সংস্পর্শে বিবর্ণ হয়। আজ পর্য্যন্ত যত কঠিন পদার্থ (solid) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। (ক্রমশঃ)

বিবিধ।

হেলির ধূমকেতু পৃথিবীর অভিমুখে প্রতি ঘণ্টায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ মাইল অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ২৮ মাইল গতিতে প্রধাবিত হইতেছে। ধূমকেতু যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে, ইহার গতির তীব্রতাও অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে, জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনা অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ইহা ১৮ই মে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে। সেই সময়ে ইহার শিরোভাগ পৃথিবী হইতে ১,৬১,৪৬,০০০, এক কোটী একষট্টি লক্ষ, ছেচল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিবে। প্রায় সমস্ত ধূমকেতুর পুচ্ছ দুই কোটি হইতে ৩ কোটী মাইল দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাজেই এই ধূমকেতুর পুচ্ছ আমাদের পৃথিবীকে ২।৪ মিনিটেই সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিতে পারে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ক্ল্যামেরিও সেই সময়ে পৃথিবীর অবস্থা সম্ভবতঃ কিরূপ হইতে পারে, এখন হইতেই তাহার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে পৃথিবীর অক্সিজন গ্যাস যদি পুচ্ছের হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইবে। তবে এই পুচ্ছ বৃহদায়তন হইলেও অতিশয় লঘু, এবং ইহা সংশ্লিষ্ট গ্যাস অতীব বিরলীকৃত। ইহার লঘুত্ব পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের সহিত তুলনা করিলে, শেষোক্ত শীশকের ন্যায় ভারী হইয়া পড়িবে। পৃথিবী ১৮১৯ ও ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে এইরূপে ধূমকেতু পুচ্ছ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীর জন্তু সমূহ বিধ্বংশ হয় নাই বটে, কিন্তু মহামারীর উৎপাতে পৃথিবীর নরনারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবারেও মৃত্যু না হইতে পারে বটে, কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর মহামারী যে হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

১ম বর্ষ।] পৌষ ১৩১৬, ডিসেম্বর ১৯০৯। [১২শ সংখ্যা।

পশুচিত্তে ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাষ।

কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় পশু সমূহ ভূমিকম্পের পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধীয় কোন কিছু বুঝিতে পারে কিনা, তৎবিষয়ে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। সিসিলি এবং ক্যালাব্রিয়ায় ভূমি কম্পনের তারতম্য পরিমাপক যন্ত্রে এখনও রীতিমত ভূমির আন্দোলন সূচিত হইয়া থাকে। তবে এইরূপ আন্দোলন-পরিমাণ অতি অল্প। সিসিলিতে গত ভূমিকম্পের পূর্ব্বেই পশু সমূহ বিচলিত হইয়া পড়ে। মানবের মনে দুর্ব্বিপাকের কোন চিন্তাই ছিল না। কিন্তু পশু এবং অন্য ইতর প্রাণী ভূমিকম্পের পূর্ব্বেই নিতান্ত ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্ত হওয়ায়, এখন বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে নিকটবর্ত্তী দুঃসময়ের বিষয় বুঝিতে পারিয়াই তাহারা এরূপ বিচলিত-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে. বা প্রাচীন মানবজাতির ইতিহাস অনুধাবন করিলেও. বোধ হয় যেন ইতর প্রাণী ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া থাকে। ৩৭৩ পূঃ খৃঃ অব্দে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ইলাইক ধ্বংস হইয়া যায়। ভূমিকম্প সংঘটিত হইবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বেই মূষিক, সর্প, নকুল ও অন্যান্য গর্ত্তবাসী প্রাণি-সমূহ ভয়ব্যস্তায় পৃথিবীর আভ্যন্তরীন স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীর উপরিভাগে বাস করিতে লাগিল। এবং ভূমিকম্পে দেশ বিপর্য্যস্ত

হইবার বহুদিন পরে পুনরায় তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে সিসিলিতে যে দারুণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সংঘটিত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই প্রাণী সমূহ পৃথিবীর উপরি-ভাগে বাস করিতে লাগিল; এমন কি সমুদ্র তলবাসী বহু মৎস্যও জলের উপরিভাগে পলাইয়া আসিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গৃহপালিত পশুই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে এই প্রকার বিপদ সমূহের পূর্ব্ব জ্ঞান-প্রবণ। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে চিলি প্রদেশ অন্তর্গত ট্যালকাহুয়ানোয় যে ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ৫।৬ দিবস পূর্ব্বেই কুক্কুর সমূহ ভয়ে অস্থির হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইতে লাগিল; তাহাদিগকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায় ৫।৬ দিন পরেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গেল। মানুষ কিন্তু ভূমিকম্পের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রীতি প্রফুল্ল ছিল। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জাভা-দ্বীপে ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বে কাক সমূহ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল, এবং গৃহের প্রাচীর, চূড়া, শিখর বৃক্ষ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সমস্ত দেশটী ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে রিভিয়েরা ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে অশ্বসমূহ অশ্ব শালায় বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তীব্র কষাঘাতেও তাহারা চঞ্চল চিত্ততা বা অধৈর্য্য পরিত্যাগ করিল না। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে হফ্ইকুই ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে সী-গল এবং অন্যান্য সামুদ্রিক পক্ষী সমূহ ঝাঁকে ঝাঁকে নগরাভ্যন্তরে উড়িয়া আসিতে লাগিল, এবং কর্কশ স্বরে চারিদিক পরিশব্দায়মান করিয়া তুলিল। ১৯০৫ সালে লাহোরে যে ভূমি-কম্প সংঘটিত হইয়াছিল তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই হস্তি সমূহ চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়িল, এক সঙ্গে সমস্ত হস্তী ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাহুত এবং অন্যান্য লোক বহু কষ্টে হস্তী সমূহকে নিরস্ত করিতেছে এমন সময়ে প্রবল ভূমিকম্পে দেশ আন্দোলিত হইয়া গেল। এইরূপে ১৯০৭ সালে করাতঘের ভূমিকম্প কুক্কুর, অশ্ব, গাভী, বৃষ এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু ভীত চিত্ততার দ্বারা পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করিতে পারেন যে হয়ত এই সমস্ত কাণ্ড সত্য নাও হইতে পারে। হয়ত কোন কারণ

বশতঃ কোন পশু বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছিল. কিন্তু পরক্ষণেই ভূমিকম্প হইল দেখিয়া অজ্ঞ লোক ঠিক করিয়া লইয়াছে, এবং পরে লোক সমাজে প্রচারিত করিয়াছে. যে ভূমিকম্প হইবে বুঝিতে পারিয়াই পশু সকল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও- এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছে। কোন সময়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হামবল্ট. অরিনকো নদীকূলে বসিয়াছিলেন। অল্প পরেই দেখিতে পাইলেন, কুম্ভীর সমূহ দলে দলে জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া কূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। মৎস্য সমূহ জলের উপরিভাগে সন্তরণ দিতেছে, এবং স্থল ভাগের নিকট ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ইহার কারণ নির্ণয়ার্থ চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এমন সময়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবী বিলোড়িত হইত লাগিল। তিনি তখনই উক্ত জলচর জীবসমূহের জলত্যাগের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

আমাদের দেশে গত ভূমিকম্পের সময় জলাশয় নিকটস্থ কার্য্যে ব্যাপৃত অনেক লোকের মুখে শুনা গিয়াছিল. যে ভূমিকম্পের পর জল আন্দোলিত হইতে না হইতেই বড় বড় মৎস্য সমূহ জল ত্যাগ করিয়া তীর ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই সমস্ত বৃহৎ মৎস্যের গভীর জলত্যাগ করিয়া তীরভূমির নিকট আসিবার কারণও বোধ হয় ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাষ ; বোধ হয় ইহারা আবাস ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানের অনুসন্ধানের ইচ্ছায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু ইতর প্রাণী সমূহের এইরূপ বিপদের পূর্ব্ব জ্ঞানের ভিত্তি কোথায় ? কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে সীমাবদ্ধ-জ্ঞান ইতর প্রাণী সমূহ কোন বিশেষ তড়িৎ ক্রিয়ার শক্তিতে ক্রিয়াপ্রবণ। এইরূপে পৃথিবীর বিক্ষোভের সময় পৃথিবীর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক তড়িৎ শক্তিও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। এবং তড়িতের ক্রিয়া বলেই পশু সমূহ বুঝিতে পারে যে কোন না কোন বিপদ সম্মুখীন। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে এই সমস্ত পশুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। সেই ইন্দ্রিয় সাহায্যেই উহারা অনেক ভবিষ্যত বিষয় বুঝিতে পারে, আমাদের সেই ইন্দ্রিয়ের অভাব. কাজেই আমাদের নিকট যাহা প্রহেলিকা বা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া

অনুমিত হয়, তৎসমুদয়ই তাহাদের নিকট অতি সুস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। কাজেই বিপদ দেখিতে পাইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য কাতর হইয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে মানব সমূহের ইন্দ্রিয় বৃত্তি ক্রমাগত বিভিন্ন কার্য্যে পরিচালিত হয় বলিয়া সকল সময়ে ইন্দ্রিয়গণ তীক্ষ্ণ শক্তি সম্পন্ন হইতে পায় না। কিন্তু মস্তিষ্ক বিশেষরূপে তীক্ষ্ণ হইয়া পড়ে। পরন্তু প্রাণী সমূহ ক্রমাগত একই বিষয়ে ইন্দ্রিয় পরিচালিত করে বলিয়া সে বিষয়ের অতি সামান্য ব্যতিক্রমও বুঝিতে পারে। অন্ধের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির কারণই এই, যে দর্শন শক্তির অভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে অনেক কাজ চালাইতে হয় বলিয়াই তাহার কর্ণ পাটাহ সামান্য শব্দ তরঙ্গও গ্রহণপ্রবণ হইয়া পড়ে। কাজেই পৃথিবীর কম্পনের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে মৃদুকম্পন হইতে থাকে, তাহা হইতেই বুঝিয়া লয় যে প্রচণ্ড কম্পন আরম্ভ হইবে, কাজেই ব্যতিব্যস্ত হয়।

এই কারণেই সর্ব্বেব যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাই যে সত্য তাহার অনুমান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ অনুমান করিতে হইলে এটা নিশ্চিত হইয়া পড়ে। অতি সুক্ষ্ম এমন কি সামান্য পদ বিক্ষোৎ সংজাত কম্পন ও যে সিমমোগ্রাফিক যন্ত্রে অঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই যন্ত্র অপেক্ষাও পশু সমূহের কম্পন অনুভূতি শক্তি প্রখরতর। কেন না ভূমিকম্প হইবার ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ যন্ত্রে পৃথিবীর কম্পন লিপিবদ্ধ হয় না। অতএব মানব অপেক্ষা ইতর প্রাণী পূর্ব্ব হইতেই ভূমিকম্পের 'অধিকতর 'আভাষ পায় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে উহারা পৃথিবীর কম্পন অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারে। আর এই অনুমান ও অনেকটা সত্য সমীপবর্ত্তী। কিন্তু মানবজাতি অপেক্ষা তাহারা এই বিষয় অধিকতর ক্ষমতাপন্ন এরূপ উক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভল্টা গ্যালভানির অভিমতের বিরুদ্ধবাদী হইলেন। তিনি তর্ক করিতে লাগিলেন যে এইস্নায়বিক বিক্ষোভের একমাত্র কারণ ধাতব সংস্পর্শন; জান্তব তড়িতের ইহার সহিত কোন সংশ্রব নাই। তাঁহার উক্তি এবং অভিমতের সমর্থন স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিলেন যে ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এম. সুলজার এইরূপ সংস্পর্শন জন্যই, একখণ্ড তাম্র ফলক ও একখণ্ড দস্তা ফলক জিহ্বার উপর স্থাপন করায় তাঁহার একপ্রকার অভাবনীয় অনুভূতি হইয়াছিল। ভল্টা অনুধাবন করিলেন, যদি একখণ্ড তাম্র ফলকের উপর একখণ্ড জলসিক্ত ন্যাকড়া স্থাপন করতঃ পুনরায় একখণ্ড রজত ফলক স্থাপন করা যায় বা ঐরূপে অনেকগুলি স্তবক একত্র স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তড়িৎ শক্তি সঞ্চিতহইবে; এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য্যও হইলেন। এই সময় হইতেই ভল্টার স্তম্ভ (Volta's Pile) নামক আর একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়া তড়িৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রাগার পরিবর্দ্ধিত করিল। ইহাতে তড়িৎ উৎপাদনের নানারূপ অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রণালী অবলম্বনে আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন; তাহার নাম—'করোন ডি ট্যাসেস্' বা 'ক্রাউন অফ কাপ্‌স্' (মুকুটাকারে সজ্জিত পানপাত্র সমষ্টি)। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী এইরূপ:—একটি তাম্র ফলকের সহিত তার দ্বারা অন্য একটি দস্তা ফলক সংযুক্ত করতঃ দুইটি সাধারণ লবণ মিশ্রিত জলপূর্ণ কাঁচপাত্রের একটিতে দস্তা এবং একটিতে তাম্র ফলক নিমজ্জিত করিয়া এইরূপে অনেকগুলি পাত্র পরস্পর সংলগ্ন করিলেই ক্রাউন অফ কাপ্‌স্ নির্ম্মিত হয়। এই প্রণালী দ্বারা ভল্টা প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেন। এম ভল্টা তড়িৎ উৎপাদানের এই নূতন প্রথা ১৮০০ খৃঃ অব্দে উদ্ভাবন করিলেন, এবং উদ্ভাবকের নামানুসারে ইহার "ভল্টেইক তড়িৎ" এইরূপ নাম করণ হইল।

ডু লাক ভল্টার স্তূপের তাম্র ও দস্তা ফলকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তড়িতের

দাহিকাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জ্যাম্বোনী এই যন্ত্রের সম্যক উন্নতি সংসাধন করেন। তিনি তাম্র ও দস্তা ফলকের পরিবর্ত্তে অন্য দুইটী পদার্থ সন্নিবিষ্ট করিলেন। তিনি মোটা কাগজের টুকরার এক পৃষ্ঠা দস্তা ফলক দ্বারা আবৃত করিয়া অন্য পৃষ্ঠায় মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (manganese dioxide) লেপন করিয়া দিলেন এবং এই কাগজের দস্তা-অংশ উপরের দিকে রাখিয়া কাগজের টুকরাগুলি উপরি উপরি সজ্জিত করিলেন; এবং সজ্জিত কাগজের টুকরা গুলি একটি কাঁচের বা ইবনাইটের নলের মধ্যে সংরক্ষিত করিলেন। ১০০০০ টুকরা কাগজের নির্ম্মিত এইরূপ যন্ত্র হইতে প্রতিনিয়ত সম পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে। 'গোল্ডলিফ তড়িৎ নির্দ্দেশক' নামক এক প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব নির্দ্দেশক যন্ত্র এই তড়িৎ সাহায্যে তড়িৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে, এবং লিডেনজারও তড়িৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক প্রতিরোধ (internal resistance) অত্যন্ত অধিক। কেন না কাগজ খণ্ড গুলির আর্দ্রতাই তড়িৎ পরিবাহক। কিন্তু ইহার ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স অত্যন্ত অধিক বলিয়া এই সমস্ত কাগজ খণ্ডের বিশুষ্ক স্তম্ভ বেশ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এইরূপ কথিত আছে যে অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্ল্যারেণ্ডন নামক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে এইরূপ তড়িৎ উৎপাদক কাগজের স্তম্ভ রহিয়াছে। ইহার দুইটী পোল (তড়িৎ নির্গম পথ) দুইটি ধাতব ঘণ্টা নির্ম্মিত। এই দুই ঘণ্টার মধ্যস্থলে একটি পিত্তল গোলক দোদুল্যমান রহিয়াছে। এই গোলক ঘণ্টা দুইটির আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্য ক্রমাগত দুলিতেছে। কাজেই স্তম্ভ সঞ্জাত তড়িৎ ক্রমাগত নিঃসৃত হইয়া যাইতেছে। এই ঘণ্টা দুইটি ঐ গোলক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আজ ৫০ বৎসর কাল ক্রমাগত শব্দিত হইতেছে।

ভল্টা অনুধাবন করিলেন যে. ভল্টেইক তড়িৎ কোষ (battery) হইতে তড়িৎ উৎপত্তির কারণ দুই বিভিন্ন ধাতুর পরস্পর সংস্পর্শন; এবং যে তরল পদার্থে ধাতব পাত্র নিমজ্জিত করা হয়, তাহা তড়িতের পরিবাহক স্বরূপ কার্য্য করে। কিন্তু উলাস্টন্ এইরূপ অভিমত ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং তিনি প্রকাশ করেন যে ধাতব পাত্র সংস্পর্শন জন্য তড়িৎ উৎপাদিত হয়

না. পরন্তু পাত্রদ্বয়ের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যই তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক ক্রিয়াই তড়িৎ উৎপত্তির একমাত্র কারণ। সার হাম্ফ্রি ডেভিও এই মতের সমর্থন করেন। তিনি নানারূপ পরীক্ষা দ্বারাও এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন। রয়াল সোসাইটিতে ভল্টার অভিমত বিবরণ পঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে নিকল্‌সন্ এবং কারলাইল ভল্টেইক তড়িৎ কোষ দ্বারা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলেন। সার হেম্‌ফ্রি ডেভি এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া জলকে তড়িৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করতঃ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুই বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেন। যে যন্ত্র সাহায্যে জল এই দুই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে পরিণত হইল তাহার নাম ভল্টামিটার (voltamiter) রাখা হইল। তিনি পরে আরও অনেক যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহার এইরূপে বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পাদন কালীন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে. যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ গন্ধক কিম্বা ধাতব পদার্থের সহিত অক্সিজেন সম্মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদিগকে তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করিলে. গন্ধক কিম্বা ধাতু নেগেটিভ পোলে (negative pole) এবং অক্সিজেন পজিটিভ পোলে (positive pole) সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ভল্টেইক তড়িৎ কোষ উদ্ভাবিত হইলে ডেভি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে ভবিষ্যতে এই শক্তি রাসায়নিক নূতন তথ্যানুসন্ধানে বিশেষ সহায়তা করিবে। তিনি তাঁহার নোট বুকে ১৮০০ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন " I cannot close this notice without feeling grateful to M. Volta, Messrs Nicholson and Carlyle, whose experience has placed such wonderful and important instrument of Analysis in my power"। পরে তিনি পটাশ (potash) বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ হইতেই, এমন একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিলেন, যে ইহা জলের সংস্পর্শে আসিলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া পড়ে। তিনি আরও অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর অন্যান্য বিষয়ের বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করেন; তাঁহার অধিকাংশ আবিষ্কারই ভল্টার তড়িৎ কোষ সাহায্যে। এইরূপ কথিত আছে যে যখন মহাবীর নেপোলিয়ান শ্রবণ করিলেন যে একজন ইংরাজ দার্শনিক ক্ষার-যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট

করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পারিস ইন্সটিটিউটের পণ্ডিত বর্গকে ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ফ্রান্স দেশে কেন এই সমস্ত আবিষ্কার সম্পাদিত হইল না। ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে প্রচুর ক্ষমতাপন্ন একটা তড়িৎ কোষের অভাবেই তাঁহারা কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ একটি তড়িৎকোষ নির্ম্মান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এবং এই যন্ত্র বিনির্ম্মিত হইলে, তিনি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ইন্সটিটিউটে গমন করিলেন। সম্রাট তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য সম্পাদন ক্ষিপ্রকারিতায়, পারিষদবর্গ নিষেধ করিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই, তড়িৎ কোষের দুইটি পোল জিহ্বার উপর স্থাপন করিলেন। তড়িৎ আঘাতে তিনি প্রায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন, এবং আঘাত হইতে সুস্থ হইবা মাত্রই যতটুকু সম্ভব স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি যন্ত্রাগার হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তড়িৎ কোষের ক্ষমতার পুনঃ পরীক্ষার আবশ্যক বোধ করিলেন না। তিনি আর কখনও এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করেন নাই। যদিও ফ্রাঙ্কলিন এবং সম-সাময়িক তড়িৎবেত্তাগণ তড়িৎ যন্ত্র দ্বারা ইস্পাতের তার চুম্বক ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তথাপি ১৮১৯ খৃঃ অব্দে নূতন ভাবে এবং নূতন প্রথায় ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিজম্ (electromagnetisim) আবিষ্কৃত হওয়ায় তড়িৎ বিজ্ঞান অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া পড়িল।

কোপন্‌হেগেন্ অধিবাসী অধ্যাপক আরষ্টেড oersted তড়িৎ এবং চুম্বক ধর্ম্মের মধ্যে কি সাদৃশ্য রহিয়াছে তৎ সম্বন্ধে আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহার আবিষ্কার-বিবরণী ১৮০৭ খৃঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। এই তথ্য আবিষ্কারের ১২ বৎসর পরে আরষ্টেড যখন একটি তড়িৎ পরিবাহিত ধাতব তারের নিকট কোন চুম্বক দণ্ড লইয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতেছিলেন সেই সময় লক্ষ্য করিলেন যে তড়িৎ স্রোত পরিবাহিত তারও চুম্বক ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, যে ধাতব বা অন্য বায়বীয় বা তরল যে কোন পদার্থ দিয়া তড়িৎ পরিবাহিত হউক না কেন, চুম্বক দণ্ডের পার্শ্ববিচলন deflection সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। এবং তড়িৎ পরিবাহিত পদার্থটি চুম্বকের উপরে ধারণ করিলে যে পার্শ্বে বিচলিত হইবে, নিম্নে ধারণ করিলে ঠিক তাহার বিপরীত

দিকে সম পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারের পরেই ফ্রেঞ্চ য়্যাকোডেমির এম এম আঁপেয়ার (Ampere) এবং আরাগো (Arago) লক্ষ্য করিলেন যে এই চুম্বক শক্তি তড়িৎ পরিবাহিত তারে স্পর্শজ্যাবৎ (tangential) কার্য্য করে। তিনি দীর্ঘ তারের কুণ্ডলি করিয়া চুম্বক শক্তিও বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হয় যে কুণ্ডলীকৃত তার মধ্য দিয়া তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইলে তারের কুণ্ডলী সর্ব্বতোভাবে চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই তারের কুণ্ডলীতে একখণ্ড লৌহ প্রবেশ করাইয়া দিলে কুণ্ডলীর চুম্বক শক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর তারের ইনসুলেশান্ প্রথা উদ্ভাবিত হইলে তার গুলি অত্যন্ত নিবিড় করিয়া জড়াইবার সুবিধা হইয়া পড়িল।

এম আঁপেয়ার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে যদি দুইটি তার একই অভিমুখে তড়িৎ বহন করে এবং তার দুইটি ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে প্রতিবন্ধক না পায়, তাহা হইলে এই দুইটি তারের পরস্পর আকর্ষণ সংঘটিত হইবে। ডাক্তার ফ্যারাডে একরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। ইহার সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহিত তার-কুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বক অথবা চুম্বক-পরিবেষ্টিত তড়িৎ-পরিবাহক বিঘূর্ণিত হইতে পারে। অধ্যাপক আরষ্টেডের চুম্বকদণ্ডের পার্শ্ব বিচলন সম্বন্ধীয় আবিষ্কার. আঁপেয়ার এবং আরাগোর তার কুণ্ডলীর শক্তি সম্বন্ধীয় আবিষ্কার. এই দুই প্রধান বিষয় লইয়া গ্যালভ্যানোমিটার নামক এক অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। এই যন্ত্র সাহায্যেই তড়িৎ স্রোতের শক্তি পরিমিত হইয়া থাকে। গ্যালভানোমিটার উদ্ভাবন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া এম আঁপেয়ার ১৮৩০খৃঃ অব্দে অনুধাবন করিলেন, যে এই উপায়ে তড়িৎ সাহায্যে সংবাদ (telegraph) প্রেরণ করা যাইতে,পারে; এবং ১৮৩৭খৃঃ এডিনবাবার আলেক্‌জ্যাণ্ডার নামক জনৈক তড়িৎবেত্তা গ্যালভ্যানোমিটারের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লণ্ডন নগরে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রেরণ প্রণালী প্রদর্শন করিলেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে ডাক্তার সিবেক (Seebeck) আর এক নূতন প্রথায় তড়িৎ উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। তিনি পদার্থের তাপ পরিমাণ বিশৃঙ্খল করিয়া তড়িৎ উৎপাদানে সক্ষম হইলেন। তিনি প্রদর্শন করিলেন, যে

অন্টিমানি এবং বিসমাথ্ নামক দুইটি ধাতুর শলাকা পরস্পর ঝালিয়া দিয়া সেই জোড়ের মুখে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এবং শলাকার অন্য প্রান্তদ্বয় শীতল রাখিলে, গ্যাল- ভানোমিটার যন্ত্র সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদিত হইয়াছে বুঝিতে প্যারা যায়। ইহার পরে মেলনি এবং নোবিলি (Meloni & Nobili) এই দুই বিভিন্ন ধাতুর অনেক গুলি শলাকা পরস্পর সংলগ্ন করতঃ থ্যারমো-ইলেক্‌ট্রিক পাইল নামক এক তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক ফ্যারাডে তড়িদ্রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। এই সমস্ত পরীক্ষা এবং তজ্জাত ফল সমূহ রয়াল সোসাইটির ফিলজফিক্যাল ট্রান্‌জ্যাকস্‌ন্ নামক পত্রিকায় ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪৪ খঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পরীক্ষা কালে তড়িৎ সম্বন্ধীয় তিনি কয়েকটী নূতন সংজ্ঞা ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ঃ—এই সংজ্ঞা গুলি এরূপ ইলেক্‌ট্রোড্‌স্ (electrodes), যে পদার্থে রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহার ভিতরেও, তাহা হইতে তড়িৎ চালিত হইবার পথ। য়্যানোড (anode) যে পদার্থ দ্বারা তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থে তড়িৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। ক্যাথোড (Cathode) যে পদার্থ দ্বারা উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থ হইতে তড়িৎ বিনির্গত হইয়া থাকে। এই নাম পৃথিবীর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া তড়িৎ স্রোত প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া পৃথিবী চুম্বকধর্ম্ম বিশিষ্ট, এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। সেইজন্য য়্যানোড্ বলিলে যে পথে সূর্য্যোদয় হয় এবং ক্যাথোড বলিলে যে পথে সূর্য্যাস্ত হয়, সেই সেই পথ বুঝাইয়া থাকে। ইলোক্ট্রোলাইটস্ (electrolytes) যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রোলাইজ (electrolyse) অর্থে কোন যৌগিক পদার্থকে তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করা বুঝায়। এই বিশ্লিষ্ট মৌলিক পদার্থ গুলির নাম আয়ন (ion)। য়্যানিয়ন্ (anion) যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ য়্যানোডে সঞ্চিত হয়। কাশিয়ন (cation) যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে ড্যানিয়ল প্রতিনিয়ত একই শক্তি সম্পন্ন একটী তড়িৎ কোষ উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবনের অল্প পরেই ডি লা রু ইলোক্‌ট্রোটাইপ

প্রণালী উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ইহাতে সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না, এবং ইহাও আপাততঃ বিশেষ কার্য্যোপযোগী হইল না। যাহা হউক লোকে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এই উপায়কে বাস্তবিক কার্য্যে লাগাইতে লাগিল; এবং ধাতব দ্রাবণ হইতে অন্য পদার্থে সেই ধাতু পাতিত হইতে লাগিল। এই কার্য্যে এম জ্যাকোবি, স্পেন্সার এবং জরড্যান এই তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্পেন্সারের কার্য্য বিবরণী লিভারপুলে পঠিত হইল, এবং তিনি নানাবিধ ইলেট্রোটাইপের নমুনা প্রদর্শন করিলেন।

থার্ম্মষ্ট্রং ১৮৪০ খৃঃ অঃ সম্পূর্ণ অভিনব আর একটি তড়িৎ উৎপাদন প্রথা আবিষ্কার করিলেন। এই আবিষ্কার সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। নিউকাস্‌লের নিকটবর্ত্তী সিজিল নগরে একটি বাষ্পীয় কলের বাষ্পস্থালীর (boiler) ছিদ্র (fissure) হইতে অতিবেগে প্রচণ্ড চাপ গ্রস্ত বাষ্প বহির্গত হইতেছিল। কল পরিচালক এক হস্তে নিঃস্রুত বাষ্প এবং অন্য হস্তে কলের বাষ্প নিঃসরণ পথাবরণের (valve) লিভার (lever) স্পর্শ করিবামাত্র একটা তড়িৎজাত স্নায়বিক আক্ষেপ অনুভব করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের গাত্র হইতে একটা তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিতে পাইলেন। এই ব্যাপার আর্মষ্ট্রঙ্গের নিকট বর্ণিত হইলে, তিনি ইহার তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন, এবং এই উপায়ে ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নিঃস্রুত করিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর এইরূপে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়া "হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক মেশিন" (Hydro electric machine) নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই যন্ত্র সাহায্যে ৫।৬ ফুট দীর্ঘ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে পারে। থার্মষ্ট্রং প্রমাণ করিলেন যে সাধারণতঃ বাষ্প স্থালীতে বি-সম তড়িৎ এবং বাষ্পে সম তড়িৎ সঞ্জাত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

উত্তর মেরু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৬ সালে কম্যাণ্ডার পেয়ারী ৮৭ ডিগ্রি ৬ মিনিট নিরক্ষান্তর রেখায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাজেই তিনি সে বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও আর একবার সুমেরু যাত্রার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়িলেন। "পেয়ারী আর্টিক ক্লাব" নামক সভা হইতে 'রুজ ভেল্ট" নামক অর্ণবপোতও সুসজ্জিত হইল। পেয়ারী ২৩ বৎসর যাবৎ উত্তর মেরু আবিষ্কারের জন্য যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত উদ্যম সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত অধ্যবসায় সুমেরু কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া রহিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায়, তাঁহার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছিল, তৎসমুদয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

১৯০৭ সালের ৬ই জুলাই তারিখে সদলবলে পেয়ারী রুজভেল্টে আরোহণ করিয়া মেরু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথমে সিড্‌নি, পরে নোভা-স্কসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ১৭ই জুলাই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দিকে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তথা হইতে উত্তরাভিমুখে ডেভিস প্রণালী, বেফিন উপসাগর অতিক্রম করিয়া গ্রীণল্যাণ্ডে স্মিথ সাউণ্ডের দক্ষিণভাগে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রাশি রাশি ভাসমান তুষার অতিক্রম করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পরিশ্রমের এক শেষ হইল। অবশেষে তিনি গ্রাণ্টল্যাণ্ডে সেরিডান অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ১লা সেপ্টেম্বর স্মিথ সাউ-ণ্ডের পরপারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শীত ঋতুর অবসান হইল।

পেয়ারী প্রথম অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে শীতের সময় বরফের উপর যে স্থানে হউক বিশ্রাম আবাস নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। তাঁহার যাত্রার বিবরণী পাঠে বেশ

বুঝিতে পারা যায়, এই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হইযাছিল। তিনি শেরিডান অন্তরীপে উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু তীরে উঠিতে পারিলেন না। সেই সমযে প্রবল বেগে উত্তর পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, তুষার রাশি বায়ু বলে প্রধাবিত হইয়া অর্ণবপোত আহত করিতেছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও অগ্রগমনের পরিবর্ত্তে ক্রমাগত জাহাজ পশ্চাতে হটিযা আসিতে লাগিল। এমন কি রুজবেল্ট জাহাজ খানি চড়ায আটকাইয়া গেল। যাহা হউক কযেক দিবস ক্রমাগতঃ বক্র-পথে গমন করিয়া অবশেষে রুজভেল্ট অল্প পরিসর তুষার শূন্য সমুদ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইল। এই স্থানটি শেরিডান নদীর মোহানা।

পেয়ারী সেই স্থানে উপনীত হইয়াই তীরভাগে উপনীত হইলেন। এবং উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত করিযা অতি শীঘ্র একটী ভাণ্ডার গৃহ নির্ম্মাণ করিযা ফেলিলেন। জাহাজ হইতে তুষার ক্ষেত্রে উপর দিযা মাল চালান করিয়া ভাণ্ডারজাত করিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে তিনি স্লেজে করিয়া দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার চালান করিযা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। এরূপ করিবার প্রধান কারণ এই যে তিনি স্বযং যখন যাত্রা করিবেন, তখন অধিক দ্রব্য সম্ভার সঙ্গে লইবার পরিবর্ত্তে পথের মাঝে মাঝে সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবেন। নভেম্বর ৫ই পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য চলিতে লাগিল। তাঁহার পারিষদবর্গ ও স্বয়ং এই সমযটা ভল্লুক শীকার করিয়া এবং জোযার ভাটা পর্য্যবেক্ষণ করিযা কাটাইযা দিলেন। তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শেরিডান অন্তরীপে অবস্থান করিলেন। এই স্থান হইতে পেযারী স্লেজে আরোহণ করিযা উত্তরাভিমুখে গমন করাই যুক্তি সিদ্ধ মনে করিলেন। কাজেই রুজভেল্ট পরিত্যাগ করা হইল। তাঁহার দলকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। প্রথম দল ১৫ই ফেব্রুয়ারী ক্যাপটেন বার্টলেটের অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় দল ২১ ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক মারভিনের অধিনায়কত্বে এবং তৃতীয় দল ২২শে ফেব্রুয়ারী স্বয়ং পেয়ারীর অধিনায়কত্বে যাত্রা করিল। এই তিন দলে সর্ব্বশুদ্ধ ৭জন ইউরোপীয়, ৫৯ এস্কিমো, ২২খানি স্লেজ, এবং এই স্লেজগুলি বাহিবার জন্য ১৪০টি কুকুর ছিল।

এই তিন দলই কলম্বিয়া অন্তরীপে পুনঃ একত্রিত হইল এবং পথে পূর্ব্ব সঞ্চিত ভাণ্ডার গৃহ হইতে যে সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে তাহাও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল; সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সকলে ভাল করিয়া বিশ্রাম করিয়া লইলেন। কুক্কুর গুলিও এই বিশ্রামে বেশ সবল, সুস্থকায় এবং সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হইয়া পড়িল। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্লেজ গুলির তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা হইযা গেল, ভগ্ন অংশ গুলি পরিবর্ত্তিত হইল, এবং যাহা কিছু করণীয় তৎসমুদায়ই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। ইতিমধ্যে বার্টলেটের দল নিবিড় তুষার ক্ষেত্র কাটিয়া উত্তর দিকে পথ করিতে লাগিলেন; এবং ১লা মার্চ্চ তিনি আরও একটা প্রকাণ্ড ববফপূর্ণ জলাশয় উত্তীর্ণ হইলেন। মারভিন এবং পেয়ারীর দল বার্টলেট কৃত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বার্টলেট যখন গমন করিতেছিলেন, তখন বায়ু মণ্ডল বেশ পরিষ্কৃত ছিল; কিন্তু তাহার পশ্চাৎবর্ত্তীগণ প্রবল ঝড়ের বেগে পরিষ্কৃত পথে রীতিমত অগ্রসব হইতে পারিলেন না। ঝড়ের জন্য পথে একদিন তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। দুই খানি স্লেজ একবারে ধ্বংস হইযা গেল। তাঁহারা কলম্বিয়া অন্তরীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত স্লেজ হইতে দুই খানি স্লেজ লইয়া আসিলেন। এবং চতুর্থ দিনে বার্টলেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। হইয়াই দেখিলেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড জলাশয়। কাজেই সেই স্থানে তাঁহাদিগকে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

দীর্ঘকালব্যাপী শীত ঋতুর অবসানে ৫ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহাবা মধ্য দিবসের সময় কয়েক মিনিটের জন্য সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন। ১১ই মার্চ্চের মধ্যেই সম্মুখস্থ জলাশয় জমিয়া গেল। এবং তাঁহারাও পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের এই স্থানে অবস্থিতি কালে বার্টলেট তৃতীয় ভাণ্ডার গৃহ হইতে তৈল এবং সুরাসার আনিবার জন্য মারভিন এবং আরও কয়েকজন সঙ্গী লইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহা হউক সেখানে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত মনে না করিয়া পেয়ারী সেই স্থানে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন যে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা তিন দিবস পরেই পেয়ারীর সহিত যোগদান করিলেন। ক্রমে সকলেই ৮৪ ডিগ্রি নিরক্ষ

রেখায় উপনীত হইলেন; পথে অনেক গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। নানারূপ যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইয়াছিল। নিদারুণ শীতে শরীর অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল যে ডাক্তার গুডমেল এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাহার সহিত ম্যাকমিলান নামক আরও একজন পেয়ারীর প্রিয় সঙ্গি ফিরিয়া আসিলেন। শীতের জন্য তাঁহার পদ তালু ক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ৪।৫ দিন তাঁহার রোগ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন. কিন্তু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইলে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাজেই তাঁহাকে অনিচ্ছা স্বত্তেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তিনি পেয়ারীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা এবং এইরূপ কার্য্যে অসীম সাহস ও ধৈর্য্যই পেয়ারীকে অনেকটা উৎসাহিত করিত।

এই স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে যাইবার জন্য সার্ব্বোৎকৃষ্ট কুক্কুর, স্লেজগুলি নির্ব্বাচিত হইল। সর্ব্ব সমেত ১২টি স্লেজ, ১৬জন লোক এবং ১০০টি কুক্কুর লওয়া হইল। জল অধিকাংশ স্থলেই জমিয়াছিল; সেই সময়ে বায়ুও তত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় নাই কাজেই তাঁহারা নিরাপদে ৮৫ ডিগ্রি ২৩ মিনিট নিরক্ষান্তর রেখায় উপনীত হইলেন। এতদিন যদিও সূর্য্য উঠিতেছিল বটে কিন্তু এত নিম্নস্তরে যে সূর্য্য লইয়া কোনরূপ পরীক্ষা চলিতে পারে না। আরও কয়েক দিবস পরে, অপেক্ষাকৃত উচ্চতরস্তরে সূর্য্য উদিত হইল। পেয়ারী লক্ষ্য করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহারা ৮৫ ডিগ্রি ৪৮ মিনিট নিরক্ষান্তর রেখায় উপনীত হইয়াছেন। এবং তথা হইতে তিন দিনের মধ্যেই তাঁহারা ৫০ মিনিট অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। তৃতীয় দিনেই তাঁহারা ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা ৮৬ ডিগ্রি ৩৮ মিনিটে উপস্থিত হইলেই পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে মারভিন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস তাঁহারা সুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল। এবং তুষার ক্ষেত্র নিরবচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাহার পরই প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল। অগ্রগমন দুঃসাধ্য করিয়া তুলিল। তাঁহারা বরফের উপর তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে সেই স্থানের বরফ ছিন্ন হইয়া গেল; বহু কষ্টে স্লেজ, কুক্কুর এবং সঙ্গিগণ রক্ষা পাইল। যাহা

হউক তাঁহারা ক্রমেই ভাসমান বরফক্ষেত্র পার হইয়া অবশেষে পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন তুষার প্রান্তরে উপনীত হইলেন। পেয়ারী সূর্য্য লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে তিনি সর্ব্ব শুদ্ধ ৮৭ ডিগ্রি ৪৮ মিনিটে উপস্থিত হইয়াছেন ৬ সেই স্থানেই বার্টলেট অবস্থান করিতে লাগিলেন এই স্থান হইতে পেয়ারীকে একা যাত্রা করিতে হইবে। তাহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহু অপরিমেয় শক্তি পূর্ণ হইয়া পড়িল। বার্টলেটেরও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই দুই জন এস্কিমো সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ৮৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

পেয়ারী সেই স্থান হইতে ৫ দিনেই মেরু. উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন ২৫ মাইল করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে শীত অত্যন্ত প্রচণ্ড বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এস্কিমোগণও শীতের জন্য কষ্ট পাইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপ কষ্ট ছিল না। পথের মাঝে মাঝে জলাশয় ছিল বটে কিন্তু তাহাদের পরিসর অত্যন্ত অল্প। কাজেই সে গুলিকে অতিক্রম করিতে তেমন বিশেষ কষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহারা বিশ্রামের সময় বরফের উপর তাঁবু খাটাইয়া বেশ সুখে নিদ্রা ভোগও করিতে পাইয়াছিলেন। ক্রমাগত উত্তাপের বৃদ্ধি হইতেছিল বলিয়া কুকুর গুলিও বেশ সুস্থ চিত্তে কার্য্য করিতেছিল। ৬ই এপ্রেল তাঁহারা ৮৯ ডিগ্রি ৫৭ মিনিটে উপস্থিত হইলেন। আর মাত্র তিন মিনিট বা তিন মাইল অতিক্রম করিলেই মেরুতে উপনীত হইবেন. কাজেই সে স্থানে অবস্থান না করিয়া মেরুতে উপস্থিত হইয়াই বিশ্রামাবাস টাঙ্গাইয়া লইলেন।

মেরুতে উপস্থিত হইবার পরে ৩০ ঘণ্টা কেবল মাত্র ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্য্যাবেক্ষণই অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের মেরুতে উপস্থিত হইবার সময় চারিদিকে ঘন কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু প্রায় দশ ঘণ্টা পরেই দিকমণ্ডল মৃদু সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। কাজেই পেয়ারী সেই স্থানটিকে রীতিমত পরীক্ষা করিবার অবসর পাইলেন। মেরু হইতে ৫ মাইল দূরে খানিকটা বরফ শূন্য স্থান পাওয়ায় তিনি সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৫০০ ফ্যাদম তার নামাইয়া দিয়াও তিনি সমুদ্রের তলভাগ পাইলেন না।

প্রত্যাবর্ত্তনের পালা পড়িয়া গেল যত বিলম্ব হইবে ততই ঝড়ের আশঙ্কা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়ের আশঙ্কা, সর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যাভাবের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পেয়ারী ঠিক করিয়া লইলেন, যে অগ্রগমনের সময় এক দিনে যে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই সময়ে দ্বিগুণ পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি সমস্ত দ্রব্য সম্ভার একবারে স্লেজজাত করিয়া লইলেন। পথে বিশ্রামের সময় তাঁবু না খাটাইয়া বরফের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কাটাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় দ্বিগুণ পথই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই ক্ষীপ্রতার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন কালীন গ্রীষ্ম জনিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় পার হইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বার্টলেটের গমনের চিহ্ন সকল দেখিতে পাইয়া পেয়ারী দ্বিগুণ উৎসাহে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং ২৩শে এপ্রিল কলম্বিয়া অন্তরীপে নিরাপদে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে রুজভেল্ট জাহাজ নঙ্গর করা ছিল। জাহাজখানি সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিল, তাহার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাকে পরবর্ত্তী ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল, সেই সময়ে বরফ সমূহ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, এবং রুজ-ভেল্ট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। ৫ই সেপ্টেম্বর রুজভেল্ট ইণ্ডিয়ান বন্দরে উপনীত হইল। সেই স্থান হইতে পেয়ারী তারে সমস্ত জগতে সংবাদ পাঠাইলেন—"Stars & Stripes nailed to the North Pole."

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

——:——

তাপ।
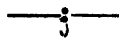
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। Temp. বৃদ্ধি। কোনও পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিবর্ত্তন উহার temp. বৃদ্ধি। অনেকে মনে করেন যে temp. বৃদ্ধি তাপ প্রয়োগের ফল নহে,—উহার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোনও পদার্থে তাপ প্রযুক্ত হইলে তাহার temp. বৃদ্ধি হয় না। বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহার temp.এর বৃদ্ধি হয় না। যে তাপ টুকু প্রযুক্ত হয় তাহা বরফকে গলাইয়া তরল জলে পরিণত করিতে ব্যয়িত হয়, এবং যতক্ষণ সমস্ত বরফটুকু গলিয়া না যায় ততক্ষণ উহার temp. 0°ই থাকে। যে পরিমাণ তাপ এই কার্য্যে ব্যয়িত হয় তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেজন্য উহাকে প্রচ্ছন্ন তাপ বলা যায়।

২। প্রসারণ। তাপ প্রয়োগ করিলে প্রায় সকল পদার্থ প্রসারিত হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে পদার্থের প্রসারণশীলতা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ক একটী ধাতুনির্ম্মিত গোলক (পার্শ্বের চিত্র) খ রিংটি উহার সমান, সুতরাং গোলকটি রিংএর ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এক্ষণে ঐ গোলকটি স্পীরিটল্যাম্প উত্তপ্ত করিলে উহা আর রিংএর ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে না, উহার উপর আটকাইয়া থাকিবে, কারণ এখন গোলকটি তাপ সংযোগে রিংএর অপেক্ষা বড় হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে রিংটিও গোলকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হইবে, এবং গোলকটি শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবে, তখন গোলকটি রিংএর ভিতর দিয়া পড়িয়া যাইবে।
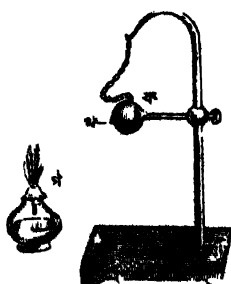
তাপ সংযোগে সকল সময় সকল পদার্থের প্রসারণ হয় না। antimony তাপ প্রযোগের দ্বারা দ্রবীভূত হইলে উহার আয়তন হ্রাস পাইয়া থাকে। বরফে তাপ প্রযোগ করিলে ৪° পর্য্যন্ত উহার আয়তনের হ্রাস হইতে থাকে, তাহার পর উহা প্রসারিত হইয়া থাকে।

(৩) অবস্থার পরিবর্ত্তন। তাপ সংযোগে প্রায় সকল পদার্থেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ কঠিন পদার্থ তরল, এবং তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়। একখণ্ড গন্ধক একটি পাত্রে রাখিয়া তাপ প্রয়োগ করিলে এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গন্ধক গলিয়া লোহিতবর্ণ তরল পদার্থের আকার ধারণ করে, পরে আর ও অধিক তাপ পাইলে উহা বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়।

(৪) তাপ পরিচালকতায় পরিবর্ত্তন। সকল পদার্থই ন্যূনাধিক পরিমাণে তাপ পরিচালক। একটী লৌহ শলাকার এক প্রান্ত হস্তে ধারণ করিয়া অপর প্রান্ত দীপ শিখার উপর ধরিলে অল্পক্ষণ পরে হস্তস্থিত প্রান্ত এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে আর ধরিয়া রাখা যায় না। শলাকার এক প্রান্ত দীপ শিখা হইতে যে তাপ গ্রহণ করিতেছে তাহা অতি সত্বর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া পড়িতেছে কারণ লৌহ এবং অন্যান্য ধাতু অধিক পরিমাণে তাপ পরিচালন করিতে পারে। কিন্তু একখণ্ড কাঠ বা কাচ এইরূপে উত্তপ্ত করিলে এত অধিক তাপ সঞ্চালিত হয় না, কারণ তাহাদের তাপ পরিচালকতা অতি সামান্য। তাপ পরিচালন করিবার এই ক্ষমতা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, উপরোক্ত লৌহ শলাকা যতই অধিক তপ্ত করা যাইবে ততই উহার তাপ পরিচালন ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে।

(৫) Sp. heatএর হ্রাস। উপরে যে তাপ পরিচালকতার উল্লেখ হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে সেই পদার্থের Sp. heatএর উপর নির্ভর করে। Sp. heat একটা পদার্থের তাপ গ্রহণ বা শোষণ করিবার ক্ষমতা তাপ গ্রহণ করিবার এই ক্ষমতাও তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে।

(৬) আলোক বিকীরণ। যে সকল কঠিন পদার্থ অধিক temp.এ তরল হয় তাহারা তরল হইবার পূর্ব্বে আলোক বিকীর্ণ করিয়া থাকে। একখণ্ড লৌহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ক্রমে উহা উজ্জ্বল লোহিতবর্ণও আরও

অধিক তাপ পাইলে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে।

(৭). Thermo electricity. দুইটি বিভিন্ন ধাতু একত্র যুক্ত করিয়া সেই সংযোগ স্থলে তাপ প্রয়োগ করিলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এক খণ্ড লৌহ ক (চিত্র ২) এবং এক খণ্ড তাম্র খ এই দুইটীকে স এর নিকট solder করা হইয়াছে এবং দুই খণ্ড তারের দ্বারা একটি galvanometer

চিত্র ২
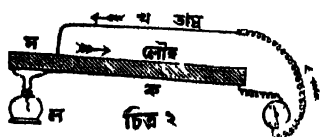
বা তড়িৎপ্রবাহনির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত ক ও খ এর সংযোগ করা হইয়াছে। এক্ষণে স্পীরিট ল্যাম্পের দ্বারা স অংশটি উত্তপ্ত করিলে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে, এবং galvanometer এ উহা প্রকাশিত হইবে।

(৮) Pyro. electricity এরূপ কয়েকটি পদার্থ আছে যাহাতে তাপ প্রয়োগ করিলে Statical electricity র সঞ্চারিত হয়। টুরমলিন (Tourmaline) নামক এক প্রকার প্রস্তর এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৯) তড়িৎ পরিচালকতার পরিবর্ত্তন। সকল পদার্থের যেমন তাপ পরিচালন করিবার ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ তড়িৎ পরিচালন করিবার ক্ষমতাও সকল পদার্থের আছে। তাপ প্রয়োগের সহিত এই তড়িৎ পরিচালকতার ব্যতিক্রম ঘটে। কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হইলে উহার হ্রাস হয়; একটি তড়িতালোকের কন্দ ক (চিত্র ৩) একটি battery র সহিত গ তারের দ্বারা সংযুক্ত হইলে কন্দের মধ্যস্থিত তার আলোকিত হইয়া উঠে, কিন্তু যদি একটি স্পীরিট ল্যাম্পের দ্বারা তারের এক অংশ উত্তপ্ত করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে আলোকে তেজ হ্রাস পাইতে থাকে। তার উত্তপ্ত হইলে উহার তড়িৎ পরিচালকতার হ্রাস হয়, সেজন্য তড়িৎ প্রবাহের ব্যাঘাত হওয়ায় কন্দের তার অধিক তাপ গ্রহণ করিতে পারে না।
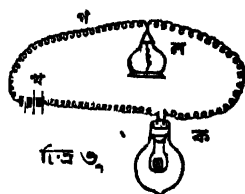
চিত্র ৩

তরল পদার্থে ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে, তাপ সংযোগে তাহার

পরিচালকতা বৃদ্ধি পায়। আবার কোনও কোনও অপরিচালক পদার্থ তাপ সংযোগে পরিচালক হয়। যথা, বরফ কাচ প্রভৃতি তাপের প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া পরিচালন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

(১০) Magnetismএর বিলোপ। একটি কঠিন ইস্পাত নির্মিত চুম্বক শলাকা উত্তপ্ত করিলে তাহার magnetismএর বিলোপ হয়, এবং শীতল হইলে উহার magnetism পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু শলাকাটি যদি অত্যন্ত অধিক উত্তপ্ত করা হয় (লাল হওয়া পর্য্যন্ত) তাহা হইলে magnetism একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(১১) রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তাপের সংযোগে অনেক স্থলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। লৌহ ও গন্ধক একত্র চূর্ণ করিয়া তাপ প্রয়োগ করিলে রাসায়নিক মিলন ঘটে এবং সল্‌ফাইড অফ্ আয়রন্ (Sulphide of Iron) নামক একটি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। আবার নিশাদল বা ক্লোরাইড অফ্ এমোনিয়া (Chloride of Ammonia) তাপ প্রয়োগে decomposed হইয়া এমোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydroclorie Acid) এই দুই গ্যাস উৎপন্ন হয়।

তাপ প্রয়োগের যে সকল প্রধান প্রধান ফল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপরে বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত তাপ সংযোগে পদার্থের প্রায় সকল ধর্ম্মেরই অল্প ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

TEMPERATURE.

তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের temperature বৃদ্ধি হয় ইতি পূর্ব্বে এ কথার উল্লেখ হইয়াছে। এই temperature তাপ হইতে বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা একটি উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মনে করা যাউক যে একটি গ্রামে ১০০০ জন পুরুষের বাস, এবং প্রত্যেকের মাসিক আয় ১০৲ টাকা; তাহা হইলে সকলের মোট আয় মাসিক ১০০০০৲ টাকা। এই ১০৲ টাকা আয়ের সহিত একটী পদার্থের tempera-

ture, এবং মোট ১০০০০৲ টাকার সহিত উহার মোট তাপের তুলনা করা যাইতে পারে। ১০০০ জনের ১০৲ টাকা আয় একত্র করিয়া গ্রামের ধন সমষ্টি ১০০০০ টাকা হয়; কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে গ্রামটি অত্যন্ত দরিদ্র কারণ উহার অধিবাসীদের মাত্র ১০৲ টাকা আয় অর্থাৎ গ্রামটি ১০৲ দরের গ্রাম। সেইরূপ যদি একটি পদার্থে ১০০০ অনু থাকে, এবং প্রত্যেক অনুর যদি ১০° temperature হয়, তাহা হইলে পদার্থটির তাপ সমষ্টি ১০০০০ হইলেও, উহা অত্যন্ত শীতল, কারণ উহার temperature ১০° মাত্র। যদি উপরোক্ত গ্রামের ২০ জন লোকের মৃত্যু হয় তাহা হইলে গ্রামের ধন সমষ্টির হ্রাস হইয়া ৯৮০০ টাকা হইবে, কিন্তু গ্রাম খানি ১০৲ টাকা দরের গ্রামই থাকিবে। সেইরূপ যদি উপরোক্ত পদার্থ হইতে ২০টি অনু অপসারিত হয়, তাহা হইলে উহার তাপ সমষ্টির হ্রাস হইয়া ৯৮০০ হইবে, কিন্তু temperature ১০°ই থাকিবে।

আবার যদি আর একটি গ্রামে মাত্র ১০০ জনের বাস থাকে কিন্তু প্রত্যেকের আয় ৯০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে উহার উহার ধনসমষ্টি ৯০০০ টাকা হইল। এক্ষণে মোট ধনের হিসাবে এই গ্রাম প্রথম গ্রামের অপেক্ষা হীন হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই গ্রামটিই অধিক সমৃদ্ধিশালী। কারণ ইহার লোক সংখ্যা অল্প হইলেও প্রত্যেকের আয় অনেক অধিক; অর্থাৎ এ গ্রামটি ৯০৲ দরের গ্রাম। সেইরূপ ১০০টি অনু বিশিষ্ট একটি পদার্থের প্রত্যেক অনুর temperature যদি ৯০° হয়; তবে উহার তাপ সমষ্টি পূর্কোক্ত পদার্থটির অপেক্ষা অল্প হইলেও ইহার temp. অধিক, ইহা অত্যন্ত উষ্ণ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা পদার্থের মোট তাপ এবং temperatureএর মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। দুইটি পদার্থের মধ্যে একটির তাপ অধিক হইলেও অপরটির temperature অনেক অধিক হইতে পারে। একবাটী ফুটন্ত জলের অপেক্ষা এক কলসী শীতল জলে অধিক তাপ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার temperature অনেক কম।

অনেক বৈজ্ঞানিক জলের উপরি ভাগের (Surface) সহিত temperatureএর তুলনা করিয়া থাকেন। ইহার আলোচনা করিলে temperatureএর

অনেকগুলি ধর্ম্ম ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ৪র্থ চিত্রে ক একটি বড় জলের চৌবাচ্ছা খ একটি ছোট চৌবাচ্ছা, এবং গ একটি স্বল্প পরিসর নল।

চিত্র ৪

পরীক্ষা ১। যদি ক, খ ও গ, চ রেখা পর্য্যন্ত জলপূর্ণ করা হয় তবে ক এর অপেক্ষা খ এ অল্প জল আছে, এবং গ এ আরও অল্প আছে। সেইরূপ যদি এই তিনটি পাত্রস্থিত জল কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট temperature (মনে করা যাউক ৫০°) পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয় তবে তিনটার temperature সমান হইলেও মোট তাপের পরিমাণ সমান নহে। যদি ক পাত্রে খ এর দ্বিগুণ গ এর চতুর্গুণ জল থাকে তবে ক পাত্রের জলে খ এর দ্বিগুণ ও গ এর চতুর্গুণ তাপ সঞ্চিত হইয়াছে।
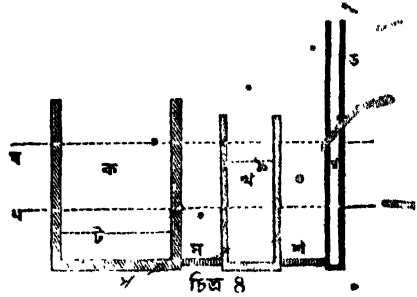
পরীক্ষা ২। কিন্তু যদি উক্ত তিনটি পাত্রে সমান পরিমাণ (মনে করা যাউক ১০ সের) জল ঢালা হয়, তাহা হইলে ক পাত্র ট রেখা পর্য্যন্ত, খ, ঠ রেখা পর্য্যন্ত জলপূর্ণ হইবে কারণ উহাদের আয়তন বিভিন্ন। সেইরূপ যদি ক খ ও গ জলে পরিপূর্ণ করিয়া সমান পরিমাণ (১০০ heat units) তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ক পাত্রস্থিত জল ২°, খ এর জল ১০° এবং গ এর জল ২৫° পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইবে।

পরীক্ষা ৩। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ট, ঠ, ড পর্য্যন্ত জল পূর্ণ করা হইয়াছে। এক্ষণে যদি স ও শ এই দুইটি নলের দ্বারা তিনটি পাত্রের যোগ করিয়া দেওয়া হয় তবে গ পাত্রস্থিত জলের এক অংশ খ এ, এবং খ এর এক ক এ আসিয়া ন এইরূপ একটা রেখা পর্য্যন্ত জল পূর্ণ হইয়া থাকিবে। সেইরূপ যদি তিনটি পাত্রস্থিত জলের বিভিন্ন temperature ২° ১০° ২৫° হয় এবং যদি তিনটি পাত্রের যোগ করিয়া দে… হয় তাহা হইলে তাপও পরিচালিত হইয়া গ হইতে খ এ এবং খ হইতে

ক এ আসিয়া সমস্ত জলের temperature সমান (মনে করা যাউক ৮° হইয়া যাইবে।

এই তৃতীয় পরীক্ষা হইতে আমরা তাপের এই একটি প্রকৃতির পরিচয় পাইতেছি যে, দুইটী পদার্থের মধ্যে যদি একটির temperature অপরের অপেক্ষা অধিক হয়, তবে তাপ, উচ্চ temp. বিশিষ্ট পদার্থ হইতে অল্প temperature বিশিষ্ট পদার্থে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ একটা শীতল পদার্থ একটা উত্তপ্ত সামগ্রীর সংস্পর্শে আসিলে স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাটীতে উষ্ণ জল বা দুগ্ধ ঢালিলে বাটীও তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠে এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। তাপের এই স্থান পরিবর্তনের প্রকৃতি মানবের মহৎ উপকারের কারণ। যেহেতু ইহা না থাকিলে জগতের সমস্ত তাপ দুই একটি স্থানেই সঞ্চিত হইয়া পড়িত অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত শীতল হইত; এবং তাহা হইলে এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ড কেবল প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান নীহারিকা-রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া জীব নিবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া থাকিত!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি এ।

বিবিধ।

শিল্প-বিজ্ঞান সমিতি। বিদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য এ বৎসর "শিল্প-বিজ্ঞান "সমিতি" হইতে ছয় জন ছাত্র মাসিক ৭৫ টাকা এবং অপর ছয় জন ৫০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনেক ছাত্রকে কেবল মাত্র পাথেয় দেওয়া হইবে। যাঁহারা পাথেয় পাইবেন, তাঁহারা যে অন্যান্য ব্যয় সংস্থানে সক্ষম বিদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।

জাতীয় বিদ্যালয়। জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, উক্ত বিদ্যালয়ে একটি ফার্ম্মেসীক্লাশ খুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহার জন্য বিদেশ হইতে উপযুক্ত যন্ত্রাদি আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

——:——